রাজকুমার ভাবে, অভিধান নিরর্থক। শব্দের মানে তারাই ঠিক করে, যে বলে আর যে শোনে। কাজ ও উদ্দেশ্যের বেলাতেও তাই। কি ব্যাপক মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা!

চতুষ্কোণ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বরূপ দর্শন : নান্দীমুখ

অনাবৃত হচ্ছে হিরন্ময় পাত্রের মুখ—হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যা পিহিতং মুখম—আমাদের সামান্য সঞ্চয় নিয়ে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে চলেছি। ধন্য বিংশ শতক! তুমি এমন গল্পকারের মাতৃস্বরূপা। তর্কাতীতভাবে আজ মনে হয় যে এখনো পর্যন্ত প্রকৃত বাংলা গল্প এই লৌকিক তৃতীয় পাণ্ডবের চোখ থেকেই বিশ্বরূপ চুরি করে আনে। বস্তুত যখন আজ তিনি, মানিকবাবু, এক দুর্মর প্রবাদে পরিণত এবং একথা শিরোধার্য হয়ে গেছে যে বঙ্কিমচন্দ্র বাদে ও রবীন্দ্রনাথ সহ সমগ্র বাংলা সাহিত্য তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করে ধন্য তখনও কিন্তু একটি অনিবার্য সন্দেহ এসে হাতছানি দেয় যে মানিকবাবুর অবস্থান বিষয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা কি যথেষ্ট সাকার ও সাবালক? আলোয় আলোকময় হয়ে উঠতে পারে আমাদের ভবিতব্য এতদসত্ত্বেও মানিকবাবুর অন্তর্ধানের কূটাভাষটি বিস্মরণীয় নয়। আমাদের নরম, নাতিশীতোষ্ণ, অনপরাধযুক্ত নন্দনতত্ত্ব চূর্ণ হল; প্রাঙ্গণ ও গৃহলোক বিষয়ে অর্থাৎ সামাজিকতা ও অন্তর্বলয় সম্বন্ধে প্রচলিত ধারনা বিদায় নিল। সমুদ্রমন্থনে প্রাপ্ত রত্নাবলী উপকূলভূমিতে বিকীর্ণ কিন্তু ব্রাত্যের স্পর্শদোষে অতিসরলীকরণের সম্ভাবনা কি দূরীভূত হয়েছে?
আমি জানি উপরোক্ত ধারনা খুব প্রীতিপ্রদ নয়। যাঁরা বিদ্বান তাঁরা উত্তরাধিকার দ্বিধাবিভক্ত করেছেন—ফ্রয়েড ও মার্কসের সেই প্রাচীন কিম্বদন্তী। সেইসব বাণিজ্যসফল ট্রেডার যাঁরা তাঁকে ঈশ্বরপ্রতিম ভেবে অপরাধ মোচনের প্রয়াস পান তাঁরা খুশী হবেন না। অপরদিকে হিন্দুবিধবার নীতিবোধযুক্ত সেইসব কমিউনিস্ট যারা "চতুষ্কোণ" পড়বার পর ভ্রু-কুঞ্চিত করেন, তাঁরাও রুষ্ট হবেন। কিন্তু আমরা যারা সমগ্র, বলা ভালো অবিভাজ্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বুঝতে চেয়েছি তাদের পক্ষে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠা, স্বদেশ ও স্ব-সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে, মর্মান্তিক হলেও স্বাভাবিক। যে কোন লেখকের মতোই মানিকবাবুও চেয়েছিলেন মানুষের রহস্য ভেদ করতে। কিন্তু তাঁর এই তদন্ত এতই গাঢ়, গভীর ও বিপজ্জনক যে স্ব-কালে তাঁকে একা হেঁটে যেতে হয়েছে। মৃত্যুর পরেও তিনি নির্জন, অননুকৃত। বলা যেতে পারে অতিমানুষিক আত্ম-চেতনা, বলা যেতে পারে ইউরোপীয় ঔদ্ধত্য, কিন্তু মানিকবাবু বলেন—"আড়াই বছর বয়স থেকে

আমার দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি।" এই একটি মন্তব্যই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আলাদা করে দেয় রোমান্টিক নমনীয়তায় ভরা বাংলা সাহিত্য থেকে। এই প্রখর আত্ম-পরীক্ষাই তাঁকে চালিত করে সামাজিক সেতুবন্ধনে। বাংলাদেশে যা স্বাভাবিক তেমন কিছু নয়, ফুলমালাডোরে নিসর্গ বিনিময় নয়, প্রিয় রমণীর চুলে শতাব্দীর অন্ধকার দেখা নয়, "শশীর চোখ খুঁজিয়া বেড়ায় মানুষ।" মানুষের প্রাগৈতিহাসিক রহস্য উন্মোচনে তিনি ও তাঁর নায়কেরা নির্মম, বিজ্ঞানমনস্ক; নির্জন (শশী, রাজকুমার, হেরম্ব)। স্বদেশে কে তাঁর স্বজন? এবং বিশ্বসাহিত্যে বা আর কার কথা তুলব? সুতরাং আমরা যারা ব্যবস্থার মধুযামিনী যাপন করতে অনীহা বোধ করছি এবং আমরা যারা পুঁথিপড়া মার্কসবাদীদের বকমবকমে কান না দিয়ে অসংশোধিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই পিতৃত্ব অর্পণ করেছি তাদের আজ নৈতিক দায় আছে কেন, তিনি, জীবনানন্দের সঙ্গে একমাত্র তিনিই, প্রথম নাগরিক, একথা, সংক্ষেপে হলেও, বুঝিয়ে বলবার।

তাকি শুধু এইজন্য যে শ্রেণীর বিজ্ঞপ্তি সমূহে উদাসীন বিভূতিভূষণের মত কোমল পথের পাঁচালিতে স্বপ্নবিহার না করে প্রতিফলিত হয়েছেন ট্যানটালাসসদৃশ আধুনিক মানবপুত্রের পতন ও সাফল্যে? অথবা অন্তিম সামন্ত তারাশঙ্করের ঘটনা আহরণ, চরিত্র প্রজনন ইত্যাদি পার্থিব বিষয়কে অতিক্রমনান্তে ইতিহাস সচেতন: সমকালকে প্রাপ্য রাজস্ব অর্পণে সতত উন্মুখ বলে? নাকি এই ধরণীর যাহা সম্বল তাকে ছুঁয়ে ছেনে ভালবেসে বিদীর্ণ তবু এক নক্ষত্রের দোষে পাপ পুণ্য জন্মের কারণে? সত্য হয়ত এ সমস্ত কিছুই। তবু, হে পাঠক, আরও কিছু থাকে বাকি।

যে ভালবেসেছে কোন দলিত কুসুম সেই শুধু জানে ভাষাব্যবহার। রূপসীর শরীরের মত যা মেদহীন অথচ সমুদ্রের মতো দূরপ্রসারী পুতুলনাচের ইতিকথার সেই অব্যর্থ ও অদ্বিতীয় গঠনভঙ্গীর কথা আমরা পরিহার করছি। "শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?"—এই বাক্য মধ্যে যে বাংলাদেশের আকাশ ও মৃত্তিকার হাহাকার লিপ্ত আছে তাও আমাদের মর্মে প্রবেশ করেছে। তবু ম্যানিকবাবুর প্রবর্তকের ভূমিকা ফ্রয়েডের এই বাস্তবায়নটুকুর জন্যই নয়; চন্দ্রশেখর উপন্যাসের স্বপ্নদৃশ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনী কুসুমের উপক্রমণিকা। কিন্তু রূপধরা অনন্তের সামনে ভঙ্গুর, শিহরিত, লুপ্তপ্রায় শশী যে মুহূর্ত থেকে আবার গাওদিয়ায় চিন্তিত ও বিষন্ন পর্যটন শুরু করে তখনই আমরা সর্বপ্রথম অভিভূত

চিত্তে লক্ষ্য করি মানিকবাবুর reference axis বা আরোপিত অক্ষরেখা কি অপার ও বিস্তৃত। আধুনিক নচিকেতার জন্ম হয়। কি অলৌকিক সমাপতন যে অত্যল্পকাল পরেই জীবনানন্দের সেই আত্মহননকামী যুবকটি এই অমেয় অনন্ত, অসীম মুহূর্তটিকে বিপন্ন বিস্ময়ের মধ্যে চিত্রিত দেখবে! ফরিদপুরের একটি নগণ্য পল্লীতে শশীর সামান্য অবরোহণ বাস্তবিক বাংলা গদ্য শিল্পে বাস্তবতার উচ্চতর পর্যায়ে আরোহণের সূচনা।

আর শুধু সূচনা নয় আধুনিকতার নির্বিকল্প পরিণতিও। পুতুল নাচের ইতিকথার আগে বাংলাসাহিত্যে যে বাস্তবতার প্রচলন ছিল তা সরল রৈখিক ও সামান্যীকৃত বাস্তবতা। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ঘটনা, চরিত্র ও শব্দের নিয়ন্ত্রিত বিন্যাসে আধুনিকতাকে ছোঁওয়ার একটি ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছিলেন শেষের কবিতা, তিনসঙ্গী বা ল্যাবরেটরি জাতীয় লেখায়। তুলনায় অনেক সূক্ষ্ম শরসন্ধান—জগদীশ গুপ্তের নয় অবশ্যই—কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের। এ জাতীয় দৃষ্টান্ত সবই তথাপি নিতান্তই দেশীয় অভিজ্ঞতানির্ভর। তাঁর বক্রবাস্তবতার (টেন্সরের) মাধ্যমে মানিকবাবুই প্রথম অতিরিক্ত মাত্রা অর্থাৎ কাল—বিশ্বসাহিত্যিক সমকালীনতা—যোগ করেন ও সেই সূত্রে আইনস্টাইনীয় ধরনের আপেক্ষিক আধুনিকতা প্রবেশ করে আমাদের সাহিত্যে।

উক্ত রূপধরা অনন্তকেই পদ্মানদীর মাঝিতে হোসেন মিঞা প্রত্যক্ষ করে ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিতে—ইয়া আল্লা নামানো আকাশের তলে কী দীনা এই পৃথিবী! অতঃপর যে সত্য উন্মোচিত হয় তা বৈপরীত্য থেকে জাত—মানিকবাবুর নিজস্ব সত্য; তাতে প্রতিচিত্রণের আকাঙ্ক্ষা প্রায় নেই। বলতে চাই এতদিন পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে বাস্তবতা ছিল পশ্চাদ্ধাবন; কখনোও রোমান্টিক, কখনোও ন্যাচারালিস্টিক ধরনে স্বভাবের অনুবর্তী হওয়া। আর মানিকবাবুর শ্রেষ্ঠ রচনা পাঠের পর, যেমন পুতুল নাচের ইতিকথা বা পদ্মানদীর মাঝি বা চতুষ্কোণ, আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় লেখকের প্রকল্পধর্মী অভিপ্রায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তবতা, প্রকৃত প্রস্তাবে অস্বাভাবিকতার একটি স্বাভাবিক অনুবাদ। আপাতমসৃণ কিন্তু উল্লম্ফনময়, বন্ধুর ও বহুকৌণিক। আমাদের পাঠক লক্ষ্য করে দেখবেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ফরিদপুর জেলায় শশী বা ঢাকা জেলার কুবেরকে রচনা করেন তখন এমনকি গল্পগুচ্ছের পন্থাও অনুসরণ করেন না। রাজকুমারের কলকাতা একটি আন্তর্জাতিক সমাজ বিশেষভাবে কলকাতা নয়। তাঁর ভূমি সমতলীয় নয় বরং বক্রিমাযুক্ত এবং কৃত্রিম। যাকে

আমি এইমাত্র reality of Curvatures বলতে প্ররোচিত হয়েছি, তা, অর্থাৎ আধুনিক নন্দনতত্ত্বের বক্তব্যধর্মীতা আমাদের ভাষায় মানিকবাবুরই সংযোজন। এই অবদান ঐতিহাসিক। এই কৃতজ্ঞতা নিবেদনের ভাষা আমার জানা নেই। যে লেখাটিতে অগভীর পঠনের জন্য অনেকে উচ্ছাসের গন্ধ পান সেই দিবারাত্রির কাব্যে হেড়ম্বর মাংসল নিষ্ঠুরতার উপপাদ্যটি মোটেই অমিত রায়দের জানা ছিল না। নারী, এমনকি আদিমতমাও, শিল্প নয়; কুসুম শিল্প। কেন? যেহেতু তা স্বভাবকে প্রতিহত করে। পরিকল্পিত স্থানাঙ্ক বিন্যাসে বিবসনা সরসী সকাশে পৌঁছে যায় রাজকুমার। আর শশীর হাত ধরে বাংলা শিল্প আন্তর্জাতিক সমকালীনতাকে স্পর্শ করে। শশীই আমাদের শিল্প-সভ্যতার প্রথম বুর্জোয়া প্রতিভূ। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসমাপ্ত থাকায় তার আগে পর্যন্ত আমাদের শিল্পচেতনা খণ্ডিত, ধান্যের সৌরভে আমোদিত ও বিশেষভাবে বাঙালী। মানিকবাবু অসমসাহসে সীমাতিক্রমনের দায়িত্ব নিলেন যা, আমি পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়েই বলছি ঈষৎ পরবর্তীকালে মহা-পৃথিবী সাতটি তারার তিমির রচনা-কালীন জীবনানন্দে সংক্রামিত হয়েছিল। শশীর সমস্যা শুধু হ্যামলেট বা মিশকিনের সঞ্চার পথের অনুবর্তন নয় তা আমাদের যুগের একজন আধুনিক মানুষের সংকট ও আত্মার অবস্থান ঘোষণা। মর্মে প্রোথিত কালজ্ঞানের ফলেই মানিকবাবু হাসুলি বাঁকের উপকথায় যেমন বাঁধের ওপর জান্তব সংঘর্ষ কিংবা জলসাঘরে যেমন জেনারেটরের আওয়াজ ভাসিয়ে দেয় সেতারের মূর্ছনা তেমন কোন বহির্জাগতিক পরিবর্তনের সহজিয়া সাধনায় মজে যান না, তাঁর বিপ্লব অনেক অন্তঃশীলা ও সুদূর বিস্তৃত। শশীর অনির্দিষ্ট চলাচলের মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে আধুনিক মানুষের জীবনানুসন্ধান ও স্নায়ুবিন্যাস। অথচ প্রকৃত ইতিহাসচৈতন্যে জারিত ছিলেন বলেই মানিকবাবু দেখান, শশীর নিষ্কাম বিচ্ছিন্নতা উপলব্ধি করে যায় সামন্ততান্ত্রিক নশ্বরতা কি যে মায়াময়! কোন তুলনামূলক সাহিত্যই পশ্চিম ইউরোপীয় মানসিকতাকে মানিকবাবুর পূর্বগামী হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে না।

বরং বাংলা যদি আন্তর্জাতিক ভাষা হত তবে বলা যেত আঁতোয়ান রোকাতাঁ বা ডাক্তার রিউ বস্তুত শশীর অনুগমন ও উত্তরসূরী। আমাদের সমালোচনা সচরাচর ঔপনিবেশিক হীন-মানস বলেই উল্লেখ করে না যে জাঁ-পল সার্ত্রের বিবমিষা উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৮-এ অর্থাৎ পুতুল নাচের ইতিকথার দু বছর পরে। আলবিয়্যার কাম্যুর আউটসাইডার বয়সের দিক থেকে শশীর

থেকে ছ'বছর ছোট—তার জন্ম ১৯৪২-এ। কাফকা তখনও অনুবাদে স্পৃষ্ট নন যে এই বাঙালী লেখক পড়ে ওঠবার সুযোগ পাবেন। এমনকি ঈশ্বরের পৃথিবীতে যে শান্ত স্তব্ধতা মানিকবাবু আয়ত্ত করেন প্রাগৈতিহাসিকের মতো ছোটগল্পে, চলচ্চিত্রকার বার্গমানকে অনুরূপ কোন অভিজ্ঞতা—God's silence—সম্বল করতে ষাটের দশক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

যদি ঈশ্বর না থেকে থাকেন, নৈরাজ্যই ন্যায়—ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দস্তয়েভস্কি উচ্চারিত এই গায়ত্রীমন্ত্র নিজের নিয়তি হিসেবে মেনে নেন না। গতিশীল ইতিহাসের আত্মীয়তা বরণ করে মুক্তির পাথেয় খোঁজেন মার্কসবাদে। ১৯৪৪ সালের শেষ দিকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সন্ধান অন্য এক মাত্রা পায়। এই মাত্রা প্রথম মানিকবাবুর মৃত্যু বা দ্বিতীয় মানিকবাবুর জন্ম নয়, এক ধরনের দ্বিজত্বপ্রাপ্তি, অবিভাজ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্প্রসারণ ও প্রবহমানতা। ব্রেশট বেকেটের ওয়েটিং ফর গোডোর জন্য একটি প্রকল্প রচনা করেছিলেন; মূল নাটকটির অবিকল মঞ্চায়নের সঙ্গে তাঁর আকাঙ্খা ছিল পশ্চাদপটে মানুষের বৈপ্লবিক প্রগতির প্রোজেকশন। মানিক রচনাবলী সেই যুগল-সম্মিলনে সজ্জিত—আধুনিকেরা যাকে unity of opposites (মাও-সে-তুং) বা unified Sensibility (এলিয়ট) হিসেবে বর্ণনা করে থাকে।

আসলে আমরা যারা চিন্তাগত ভাবে মধ্যবিত্ত তারা অনুমান করতে ভীত হই দ্বিতীয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তথাকথিত প্রথম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প সত্য নন; একান্তভাবেই সম্পূরক সত্য। আমরা ফ্রানৎস কাফকা ও গোর্কিকে আলাদা আলাদা ভাবে চিনতেই অভ্যস্ত; মানিকবাবুর সমন্বিত চেতনা প্রক্রিয়া আমাদের বিন্যস্ত পাঠক্রমকে তছনছ করে দেয়। সংশ্লেষনের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করার বদলে আমরা বরং তুলনায় সুবিধাজনক বিভাজনকেই প্রশ্রয় দেই। হয়ত দোষ আমাদেরও নয়। সমগ্র কুড়ি শতকে এমন রাজসিক বৈচিত্র্যসম্পন্ন লেখক আর কে? যিনি বিপত্নীক লেখেন তিনিই লেখেন ছোট বকুলপুরের যাত্রী। যিনি চতুষ্কোণ লেখেন তিনিই লেখেন চিহ্ন। দুঃশাসনীয় আর টিকটিকি তো একই হাতের রচনা যে হাত শিল্পী লেখে। আর এই বহুধা-বিভক্ত স্রোতরাশিকে যা মোহনার দিকে পরিচালিত করে তা তুলনারহিত এক প্রজ্ঞান। প্রগতিশীল আত্ম-প্রতারণার সেই সুলভ সুড়ঙ্গ—Parade of Surface phenomena—মাও-সে-তুঙ যাকে পরিহাস করেছেন—তাঁকে মলিন করার

দুঃসাহস দেখায় না। ইচ্ছাপূরণ ও জনরুচির ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে ভাগ্যক্রমে, তিনি আমৃত্যু অস্বীকৃত ছিলেন।

ব্যক্তির নিজস্ব সত্য থেকে ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিক সত্যে উত্তীর্ণ হওয়ার অন্তর্বর্তী সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এত অজস্রবার শৃঙ্গজয়ের ইতিবৃত্ত ও আলোক প্রাপ্তি উপহার দিয়েছেন যে, স্থানসংকুলান প্রধান কারণ নয়, আমার মত সামান্য সমালোচকের আরও কিছু উপলব্ধি ও প্রতীক্ষা অত্যন্ত জরুরী হয়ে ওঠে। তিনি রত্নাকর, আপাতত একটি অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন নিবেদন করলাম, এইমাত্র।

রাত্রির অবরোধ : ইংগমার বার্গমান

১.

সোহবিভেৎ তস্মাদেকাকী বিভেতি স হায়মীক্ষাং চক্রে যন্মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায় কস্মাদ্ধ্যভেষ্যদ্ দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি।
(তিনি ভয় পেলেন; সেইজন্য লোকে একাকী থাকতে ভীত হয়। সেই বিরাট চিন্তা করলেন—যেহেতু আমার থেকে ভিন্ন কেউ নেই তখন কার কাছ থেকে ভয় পাচ্ছি? তার ফলে তাঁর ভয় দূর হল। কারণ কার থেকে তিনি ভয় পাবেন? দ্বিতীয় কেউ থাকলেই ভয় হতে পারে।)

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ : প্রথম অধ্যায়—চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

লঘুছন্দ ক্যামেরার নিছক তুচ্ছতা নয়, শুধু রৌদ্র-সজল অনুপুঙ্খ নয়, আরও অনেকেই আছেন উৎসব ছাড়াই যারা চলচ্চিত্রকে নন্দিত করেন। আছেন ক্রুদ্ধ গোদার—সমালোচনার প্রবৃত্তি যার মেদ ও মজ্জায়; আছেন আন্তোনিওনি—নিঃসঙ্গতার জরায়ু থেকে যার উত্থান, আছেন মৃত্যুর মদির ওষ্ঠাধরসহ ককতো; আছেন সামাজিক খ্রীস্টের জনক বুনুএল ও আক্রমণকারী ফেলিনি; কিন্তু যখন উটের গ্রীবার মতো কোন এক নিস্তব্ধতা এসে আমাদের রক্তে প্রবেশ করে; অন্ধকার নামে, বধূ শুয়ে থাকে পাশে, শিশুটিও থাকে, প্রেম থাকে আশা থাকে জ্যোৎস্নায়, তবু খসে পড়ে সামাজিক প্রচ্ছদ, আমাদের মুখমণ্ডলে গাঢ় হয় রেখা—আত্মোপলব্ধির সেই বিরল মুহূর্তে আমাদের সঙ্গ দেন বার্গমান; একমাত্র ইংগমার বার্গমান—প্রৌঢ় ও নাস্তিমানের সেই কবি, পার্থিব শূন্যতার সেই নির্বিকল্প স্থপতি।

যেমন কবিতায় বোদলেয়ার, গদ্যে দস্তয়েভস্কি, পটে গোইয়া অথবা নাটকে তাঁরই স্বদেশবাসী পূর্বসূরী অগাস্ট স্ট্রীণ্ডবার্গ তেমনভাবেই চলচ্চিত্রে বার্গমান চৈতন্যের দ্বারা আক্রান্ত; উক্ত মহাশিল্পীদের মতই তিনি অস্তিমশরীরিনী এই সভ্যতার বিবেকের ভার বহন করে চলেন। কারামাজভ পরিবার বা পাপের ফুল বা কৃষ্ণচিত্রাবলীর প্রণেতাদের মতই তিনি আমাদের পীড়িত আত্মার অন্তরতম স্থলে স্পর্শ করতে পারেন 'হিমরশ্মি' বা 'স্তব্ধতা'র মতন ছবিতে কিন্তু কাউকেই শোধন করতে পারেন না। তিনি ত্রাতা নন, তিনি সত্যার্থী। প্রকৃত

প্রস্তাবে গোইয়া বোদলেয়ার দস্তয়েভস্কি তাঁদের স্ব স্ব মাধ্যমে যে বিপ্লবের অনন্বিতা চলচ্ছবিতে বার্গমান অনুরূপ সাহসেই সত্যের নগ্নাবস্থা নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন রমণীয়তা বিসর্জন দিয়ে। প্রতিচিত্রণের আকাঙ্খা, সাংবাদিকতা ও লোকশিক্ষার প্রলোভন জয় করে তাঁর মধ্য দিয়েই চলচ্চিত্র প্রথম গূঢ়তম অর্থে আধ্যাত্মিক হয়ে উঠলো। এও আশ্চর্য যে ইংগমার তাঁর প্রিয় শিল্পীদের তালিকায় কদাপি দস্তয়েভস্কির নাম যুক্ত করেন নি তথাপি আমি নিশ্চিত যে আমার পাঠক ক্রমশ বুঝতে পারবেন উইন্টার লাইটে পুরোহিত টমাসের যন্ত্রণার সারাৎসার ততটা স্ট্রীণ্ডবার্গ বা কিয়েৰ্কেগার্দে নয় যতটা সংহত হয়ে রয়েছে মধ্যম কারামাজভ ইভান কথিত গ্র্যাণ্ড ইনকুইজিটর পর্বে। আসলে 'চলচ্চিত্রকার'—এই অভিধাটি বার্গমানের পক্ষে সংকীর্ণ, বড়ো বেশী সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। তাঁর সৃজন কর্মের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র মাধ্যমজনিত সীমাতিক্রম করে হয়ে উঠেছে আধুনিক চেতনা-প্রবাহের অংশবিশেষ। লুথারীয় তপশ্চর্যাকঠোর সুইডিস যাজক পরিবারের এই সন্তানটির দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও রক্ত পরীক্ষার মধ্য থেকে আমরা তাঁকে জীবনযাপনের পক্ষে অপরিহার্য সঙ্গী ও দিশারী হিসাবে বরণ করি। তাঁর প্রসঙ্গে সবিনয়ে দাবি করব চলচ্চিত্রের পৃথিবীতে একমাত্র তাঁরই উল্লেখে, আমাদের মনে পড়ে ১৯৫৭ সালে উচ্চারিত আলব্যিয়ার কাম্যুর সেই অসামান্য বিবৃতি : The artist lives in such a state of ambiguity incapable of denying reality and yet eternally bound to question it in its eternally unfinished aspects.

এইজন্যেই বার্গমানবিচার বিশেষভাবে আমাদের সংস্কারমুক্ত অনুধ্যান আশা করে। আমি এই মন্তব্য করছি দুজন দায়িত্ববান সমালোচকের অংশকে পূর্ণ হিসাবে দর্শানোর প্রচেষ্টায় অসফলতা লক্ষ্য করে। প্রথমজন জ্যাঁ-লুক গোদার, দ্বিতীয়জন জিয়র্ণ ডনার। ১৯৫৮র জুলাই থেকে আগস্ট গোদার তাঁর দুটি নিবন্ধে ও বার্লিন চলচ্চিত্রোৎসব থেকে পাঠানো একটি টেলিগ্রামে, যাবতীয় স্তুতি ও উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও, প্রেমের বিষণ্ণলোকী আলো ও বার্গমানের মুহূর্ত উদ্ভাসের স্তর পেরিয়ে গভীরে প্রবেশ করতে পারেন নি। বুনো স্ট্রবেরির স্বর্ণভল্লুক প্রাপ্তিসংক্রান্ত তারবার্তায় অবশ্য হাইডেগারের উল্লেখ আছে—সময়ের ব্যবহারই বোধহয় গোদারকে বিইং অ্যাণ্ড টাইমের কথা মনে পড়ায়। গোদার ত্রুফোর ছবি দেখলেও বোঝা যায় নৈতিক বিমর্ষতা ও মনিকার ক্যামেরার প্রতি দীর্ঘ দৃষ্টিপাত ছাড়া আর কিছুই শেখেন নি তাঁরা বার্গমানের গ্রীষ্মাবকাশ থেকে।

তথ্য হিসেবে জানানো যেতে পারে বার্গম্যানোরামায় গোদারের বক্তব্যে বার্গমান নিজেও অসন্তুষ্ট—I find Godard's way of putting things most bewitching. It's precisely what he does himself, what he has fallen victim to! He's writing about himself. আর জিয়র্ন ডনার তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থটির সারবত্তা হরণ করেন এই সিদ্ধান্তের সূত্রে যে বার্গমান মূলত আধুনিক সমস্যার দ্বারা জারিত নন। আসলে এঁরা, এই দুজন, বা সদৃশ পন্থায় প্ররোচিত অন্য অন্য গবেষক বুঝতে চান নি বা এড়িয়ে গেছেন যে বার্গমান অধিকতর আধুনিক ভাবে দর্শনেরই সমুদ্রে অভিযাত্রী; এবং নাবিকেরও যেহেতু নৌকা লাগে তিনিও ব্যবহার করেছেন চলচ্চিত্র নামের শিল্প মাধ্যম তবে সেক্ষেত্রে উপেক্ষা করেন নি পরিচালনার প্রয়োগ নৈপুণ্য যা হয়ত দুর বাংলায় অনেক দিক থেকেই সমমনস্ক ঋত্বিক কুমার ঘটকের দুর্বলতা ও ভ্রম।

আধুনিকতার নানারকম লক্ষণ আছে এবং তার একটির প্রতি বার্গমানের প্রিয় লেখক কাম্যু সিসিফাসের কিম্বদন্তীতে এইভাবে তর্জনী নির্দেশ করেন যে ক্লাসিক্যাল মনোভাব প্রধানত অধিবিদ্যা নিয়েই ভাবিত; অন্যদিকে আধুনিকতা নৈতিকতার সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। প্রসঙ্গের প্রয়োজনে আমরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করি—চ্যাপলিন পত্রিকার পক্ষে শ্রীযুক্ত জোনাস সিমা যখন ইউজিন ওনিলের বিখ্যাত মন্তব্য যে সমুদয় নাট্যক্রিয়া ব্যর্থ যদি তা না মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের অন্বয় সন্ধানে নিযুক্ত থাকে তাঁর বিবেচনার্থে উপস্থিত করেন—উৎফুল্ল বার্গমান উপরোক্ত মনোপ্রবণতার দ্বারা আশ্চর্য অনুরণিত হন: Yes and I've often quoted him; and been thoroughly misunderstood. Today we say all art is political. But I'd say all art has to do with ethics which after all really comes to the same thing. It's a matter of attitudes. That's what O' Neill meant.

একথা সত্য যে অস্তিত্বের অর্থ ও জীবনের মৌল প্রশ্নসমূহ অনুধাবনের সময় ইংগমার বার্গমান স্ব-কাল ও শাহরিক পরিপ্রেক্ষিতকে প্রায়ই প্রাথমিক গুরুত্বের মনে করেন না বরং বেছে নেন একটি আপাতদূরত্ব কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাঁর মনে সংক্রামিত হয়নি ইতিহাস চেতনা। স্বীকার্য গোদার বা আন্তোনিওনির সৃষ্টিতে সময়ের চিহ্ন সুপরিস্ফুটিত, বার্গমানে নামহীন ও রহস্যময়। আবার এই ব্যবধানটুকু রাখেন বলেই হয়ত বার্গমানের চিত্রমালা যেখানে দার্শনিক অভিব্যক্তির সমান্তর শ্রেণী—গোদার সেখানে অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন, আন্তোনিওনি

মারাত্মক নৈশাভিযান। অর্থাৎ শেষোক্ত দুজন বার্গমানের তুলনায়, স্টিফেন স্পেণ্ডার সমীপে ঋণ স্বীকার করে বলা যায় contemporaries rather than moderns.

বার্গমান সম্বন্ধে যেসব কথা সচরাচর প্রচারিত তা সাধারণত বহিরঙ্গের প্রচার। যা রটে তা সত্য নয়; মার্কসবাদীরা যে মনে করেন তিনি খ্রীস্টীয় উপাসনামণ্ডলীর সমর্পিতপ্রাণ সদস্য—তা নয়। অপরদিকে সেই বুর্জোয়া ব্যাখ্যা যে যুদ্ধোত্তর হিমসংঘর্ষে আতঙ্কিত পৃথিবীতে তিনি বহন করে আনেন প্রেম ও শান্তির সুসমাচার—তাও সমপরিমাণে বিকৃত। আমাদের অতএব প্রমাণ করতে যে সংশ্লিষ্ট শিল্পী স্বদেশ সুইডেনের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির একটি যুক্তিপরায়ণ ফলাফল ও তাঁর কৃতকর্মে মুদ্রিত আছে সেই অলৌকিক শুদ্ধতা যা স্থায়ী শিল্পের চিরকালীন অভিজ্ঞান।

উত্তর ইউরোপের, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া অঞ্চল হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ, সুইডেনে একটি ধর্মভীরু পরিবারে ১৯১৮ সালের ১৪ই জুলাই ইংগমার বার্গমানের জন্ম। ইতিহাসের এমনই কৌতুক যে ঠিক এই দিনে বাস্তিল দুর্গের পতনের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া উত্থানের সুনিশ্চিত ঘোষণা হয়েছিল আর তার একশো উনত্রিশ বছর পর যিনি ভূমিষ্ঠ হলেন তিনি অনতিকাল পরে আমাদের বিচারার্থে উপস্থিত করবেন বুর্জোয়াতন্ত্রের পতন, ক্ষয়রোগ ও মৌনতার পরিত্রাণহীন অভিশাপ। উনিশ শতকের পর থেকেই সুইডেনের সমাজ ও রাজনীতি শান্ত। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেল। ১৯১৭ সালে অনাবৃষ্টিজনিত কারণে শস্য আশানুরূপ হয়নি; দারিদ্র্য শব্দটি তখনোও পর্যন্ত দেশে ও বার্গমান পরিবারে কিছুটা বাস্তবতার অন্তর্গত। সদ্য সমাপ্ত রুশ বিপ্লবের ফুলকি ছিটকে এসে পড়েছে ফলে দেশজুড়ে জঙ্গী বামপন্থীরা সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। অন্যদিকে রাজধানী স্টকহোমে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলছে চ্যাপলিনের পনশপ ও গ্রিফিথের বার্থ অফ এ নেশনের প্রদর্শনী। বার্গমানের বয়ঃসন্ধি এই ঈষদুষ্ণ পরিস্থিতিতে ছেদ টানলো। সুইডিশ অর্থনীতিতে স্থিতাবস্থা এলো। ১৯৩২ সালে অদ্যাবধি যারা শাসক সেই সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা সামাজিক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিসহ ক্ষমতাসীন হলেন। এরপর থেকেই সুইডিশ সমাজে রোপিত হল এক অপরিবর্তনশীলতার বীজ—অনড় রাজনৈতিক কাঠামো; বিত্তস্ফীতি; ঘরে ঘরে সমৃদ্ধি; বিরামহীন ইন্দ্রিয় সম্ভোগ। স্বস্তিকাচিহ্ন ও নতুনতর যুদ্ধের নান্দিরোল সেখানে হানা দেয় না; সভ্যতার যে কোন সংকটেই তা নিরপেক্ষ

থাকে। সুতরাং সুইডিশ সমাজে ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় ছিল কোন বার্গমানের আবির্ভাব, কোন আধুনিক নচিকেতার আত্মজ্ঞান যে চেতনার অন্তর্যামী আলোয় জড়ের সন্ততি তাঁর সমাজকে জীবন ও মৃত্যুর মৌল ভিত্তি সম্বন্ধে পুনরুৎসুক করে তুলে সময়ের ভয়ংকর ভার থেকে মুক্তি দেবে। কি অসামান্যভাবেই না সেভেনথ সীলে জোনাস উপলব্ধি করে: We were too well off, we were too satisfied, and the Lord wanted to chastise our contented pride. Therefore he came and spread his celestial venom and poisoned the knight. আজ আমাদের মেনে নেওয়া খুব সহজ হয়ে গেছে যে ক্রুসেড ও প্লেগ, বিপ্লব ও যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নাইট আন্তোনিয়াস ব্লক ও চলচ্চিত্রকার ইংগমার বার্গমান অভিন্ন হৃদয়। সংশ্লিষ্ট ছবিতে নাইটের সঙ্গী স্কোয়ারের চরিত্রাভিনেতা গানার বিয়র্নস্ট্রাণ্ডকে তিনি জানিয়েও ছিলেন যে কুড়িশতকীয় পরমাণু বোমার অনুষঙ্গ বহন করে মধ্যযুগীয় প্লেগ।

এখানে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত যে চলতি শতকের চল্লিশ দশক আমাদের আলোচ্য স্রষ্টার গঠনকাল ; পঞ্চাশ দশক বিকাশপর্ব আর ষাটের দশক পরিপূর্ণতা। আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অর্থাৎ বৃহত্তম মানবিক অপরাধের প্রেক্ষাপটে সুইডেনের সুবিধাবাদী নিরপেক্ষ অবস্থান, দায়িত্বহীনতার বিলাস চল্লিশ দশকে সাধারণভাবে সুইডিশ শিল্প-সংস্কৃতিকে ক্রোধ সন্দেহ ও হতাশার দিকে ঠেলে দেয়। নির্মাণ করে আত্মদ্বেষ ও পাপবোধ। এই নৈতিক মর্ষকামের চূড়ান্ত পরিণতি নাট্যকার স্টিগ ড্যাগারম্যানের আত্মহত্যা। সমগ্র সুইডেনের বিবেকে তখন কাফকা-জ্বর: মানুষ বলতে মনে হল অতীত ভবিষ্যৎহীন প্রক্ষীপ্ত দুর্ঘটনা ; একাকীত্বে প্রহর যাপন। উত্তরবিংশতি, ক্রুদ্ধ, ঈষদোন্মাদ, বার্গমান এখন কি করবেন? আকাশ পানে হাত বাড়াবেন কাহার তরে?

কিন্তু ঈশ্বর নীরব ও অনিকেত। খ্রীষ্ট আর পুনরুত্থিত হবেন না। সন্দেহ নেই ষোড়শ শতাব্দীর রিফরমেশনের পর থেকেই সুইডেন প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের দ্বারা অধিকৃত হয়েছে। তখন থেকেই বার্গমান পরিবার যাজক সমৃদ্ধ। এও তর্কাতীত যে উনিশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপীয় সামাজিক ঘূর্ণিবায়ু নর্ডিক ঐতিহ্যের ধর্মীয় বাতাবরণ ছিন্ন করতে পারেনি—উদাহরণ কিয়ের্কেগার্দের বিলাপ ইবসেনের ব্র্যাণ্ড নাটক ইত্যাদি, তবু শৈশবে ইংগমার গৃহে দেখেছিলেন পিতা এরিক বার্গমানের ধর্মীয় অনুশীলন পদ্ধতির নিরুত্তাপ ধারাবাহিকতা ও শাস্ত্রানু-

মোদিত শাস্তিদানের সমারোহ এবং দেশে আলঙ্কারিক প্রথাসর্বস্বতা। তীব্র নিগ্রহের উপাদান ভিন্ন ক্রিশ্চিয়ানিটি প্রতিবেশীদের রক্তে অন্য কিছু প্রভাব ফেলে নি। If I've objected strongly to christianity it has been because christianity is deeply branded by a very virulent humiliation motif. একে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ভাবধারায় যিশু যতখানি রক্ত-মাংসের শহীদ তার চেয়ে অনেক বেশী ভাবগম্ভীর পরমপিতা, ক্যাথলিসিজমের তুলনায় লুথারতন্ত্র বহুগুণে তপোক্লিষ্ট, তদুপরি উক্ত অ্যাফ্লুয়েণ্ট সমাজে হয়ত এই-ই স্বাভাবিক—ঈশ্বর এক আরামপ্রদ অবসর বিনোদন। ১৯৭৫ সালে নিউইয়র্ক টাইমসকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে বার্গমান নিজেই বলেছিলেন ধর্মীয় উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ সূক্ষ্মভাবে বিস্মৃত হয়েছে ঈশ্বরীয় প্রেম কিন্তু অবচেতনায় সঙ্গোপনে স্মরণ রেখেছে বিধিসমূহ। পরিস্থিতি এমনই নির্মম যে শ্রীযুক্ত রোণাল্ড হাণ্টফোর্ড তার দি নিউ টোটালিটারিয়ানস গ্রন্থে লক্ষ্য করেছেন যে সুইডেন—One of the rare countries in which men are often antireligious but rarely anticlerical

কোথায় স্বস্ত্যয়নমন্ত্র? আকাশ অনীশ্বর। মানুষ একাকী। শিল্পী বার্গমান পরিবৃত হলেন সেই নামহীন ত্রাসে যার প্রভাবে বোদলেয়ারের একদা নিজেকে অনুভূতিহীন শিলাখণ্ড মনে হয়েছিল। এবার আমরা আর উপনিষদের স্মরণ নেব না, আমাদের মনে পড়বে ১৮৪৪ সালের আর্থ-দার্শনিক খসড়া ও ছিন্ন শ্রমের সেই মর্মান্তিক প্রশ্নসমূহ: If the product of labour is alien to me, if it confronts me as an alien power, to whom, then, does it belong? If my own activity does not belong to me, if it is an alien coerced activity, to whom, then, does it belong? To a being other than me. Who is this being?

আপাত এই ধাঁধাটির সমাধান মার্কসের আয়ত্তে এসেছিল। প্রথমাবধিই মার্কস জানতেন বুর্জোয়া সভ্যতায় শিল্পীর জন্য যে বিপন্নতা অপেক্ষা করে রয়েছে তা মুদ্রারাক্ষসের ব্যভিচার: পণ্য পৌত্তলিকতা ও বিচ্ছিন্নতা। একটি সম্পূর্ণ অমানবিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিণামে মানুষ আত্মচ্যুত, বিভক্ত, নিজের কাছেই বন্দী। জনসংখ্যা অত্যল্প হওয়ায় স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় বিচ্ছিন্নতা ও যোগাযোগ সমস্যা শুধু ভৌত স্তরে নয়, আমরা ভুলে যাচ্ছি না ধনতান্ত্রিক সমাজতত্ত্বে সুইডেন প্রায় আদর্শ কল্যাণমূলক রাষ্ট্র; তার মাথাপিছু আয় ও অ্যাফ্লুয়েন্সের

তাঁভায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়াকে রীতিমত গরীব দেখায়। তাঁর সেই নিহত উজ্জ্বল ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোন সাধনার ফল আহরণের প্রয়াসে অথবা বিমূর্ত সামাজিক উপপাদ্যটির সমাধানে বার্গমান অবশ্যই মার্কসীয় পন্থা গ্রহণ করেন নি কিন্তু সামার ইন্টারল্যুড-এর মানুষী প্রেম থেকে সেভেনথ সীল-এর ঈশ্বর প্রীতির অভিযানে ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীর স্পর্শ ও আকাঙ্খার দ্বারা অভিজ্ঞ হতে হতে অজস্র অশ্রু পরীক্ষায় ইংগমার বার্গমান বুঝতে পারেন এই দেশকাল পটভূমি বেঁচে থাকার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে জনৈকা মৃত্যু পথযাত্রিনীর দ্বারা প্রেরিত কতিপয় বিদেশী শব্দাবলীর অনচ্ছ মাধ্যমে। এখানে একদা এক সুপ্রভাতে শ্রীযুক্ত গ্রেগর সামসা কীটে রূপান্তরিত হয় এবং ম্লান প্রদোষে আত্মা কর্দমাক্ত কাম: শ্রোণী-জঙ্ঘা-মাংস শুধু মাছির আহার। ভাষা, শেষ সেতুবন্ধন, বিপর্যস্ত। বার্গমান—নিরালম্ব তবু সত্যসন্ধ তাঁর যন্ত্রণার কাছে অন্তত বিশ্বস্ত রইলেন—যেন এক নবীন কিয়ের্কেগার্দ: He wills to be himself, himself with his torment, in order with his torment to protest against the whole of existence. সেভেনথ সীলে জোনাস মৃত্যুর চূড়ান্ত জয়ের মুহূর্তে শেষবারের মত উচ্চারণ করে—আমি নীরব হব কিন্তু সপ্রতিবাদে। অতঃপর আখ্যানারম্ভ।

২.

Yes, I'm aggressive by nature. And I often find it hard to repress my aggressiveness. The film as a medium is well-suited to destructive acts, acts of violence. It is one of the Cinema's perfectly legitimate functions: to ritualize violence.

—ইংগমার বার্গমান

একদা একজন দান্তে বা একজন শেক্সপীয়ারের কাছে জীবন প্রণত হওয়ার অবকাশ পেত। আজ তাদের কোন ভূমিকা নেই। কারেন্সি সভ্যতার এই শিখরে কবিতা স্নিগ্ধ অতীত চারণের অতিরিক্ত কিছু নয়। মানবপুত্র মাত্রই উপকথাখ্যাত মিডাস। এমন যে সমাজ সেখানে শিল্প আজ এক বিগতযৌবনা রক্ষিতা যে একদা অনেক দীপমালা অনেক ফুল্লকুসুম দেখেছে। স্থানীয় ট্র্যাজেডির এত অবিরত সমারোহ—আজ তার নাটকের দরকার নেই। গানের প্রয়োজন ফুরিয়েছে—যে শব্দের সন্ত্রাস নিয়ে সে বেঁচে থাকে তা সহ্যের অতীত।

দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তিপ্রাপ্ত অপরাধী যে শাদা স্বাধীনতাতে ঝলসে ওঠে সর্বত্র সেই রৌদ্রময় দুঃস্বপ্ন : বার্গমানেরই ভাষায় যা পঙ্গুকারী স্বাধীনতা। যা কিছু চাক্ষুস তাই অপ্রাকৃত, ভয়প্রদ, উদ্ভট বা হাস্যকর। শিল্প-রচনার মোহ আবরণ ছিন্ন করে বার্গমান চিন্তাশ্রয়ী অভিজ্ঞতার জগতে প্রবেশ করেন। পারমানবিক ছত্রছায়ার আতঙ্ক থেকে যখন সৌন্দর্য কবিতার অনুবর্তী তখন তার নাম 'হিরোশিমা মনআমুর' যখন দর্শনের অনুবর্তী তখন 'সেভেনথ সীল'। অধিকন্তু আমাদের নজর এড়ায় না নন্দনতাত্ত্বিক উৎকর্ষ হিসেবে আবিশ্বে সম্মানিত রণোয়াকৃত লা রেগলে দ জু'র প্রতি আমাদের আলোচ্য শিল্পী কি গভীর বিরাগ পোষণ করেন। সুতরাং যে জগৎ বার্গমান নির্মাণ করেন তা একমাত্র মেধার দ্বারাই অধিগম্য ; তাঁর চলচ্চিত্রার্চনায় সকল উপচারের মধ্যে বক্তব্যই গায়ত্রী। কিন্তু এই শৃঙ্গজয়েরও একটি ইতিবৃত্ত ও স্তরবিন্যাস আছে। আমরা এবার সেদিকে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করব।

ইংগমার বার্গমানের ছোটবেলা ছিল একা একা, অনতিরঞ্জিত আদরের, শিল্পী হিসাবে গড়ে ওঠবার পক্ষে আদর্শ। বাবা এরিক বার্গমান ছিলেন পূজারী আর সেই পূজা যতটা বিধানশাসিত ততটা অন্তরলালিত নয়। মা কারিন ব্যক্তিত্বময়ী ; এমন একটি পরিবারের দুহিতা যা সুইডিস সামন্ততন্ত্রকে প্রতিস্থাপিত করে। বিবাহিত জীবনে একবার অন্যাসক্তি কারিনকে আরও তপ্তস্নায়ু করে তোলে। জনক ও জননীর অনুচ্চরোল সংঘর্ষ ইংগমারের বাল্যকে অন্তর্মুখী হতে উপদেশ দেয়। পেটরোগা, বাকঅপটু, সঙ্গীহীন এই শিশু একদিন আপশালায় মাতামহীর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে অদূরাগত ওয়ালজের পদপাত ও পিয়ানো ঝংকার থেকে ধ্বনির চারুত্ব আবিষ্কার করল। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ : চার্চের ঘণ্টাধ্বনি, সৌরকর, ওয়ালজের ছন্দে কক্ষের ভেনিসীয় পটটি যেন কথা কয়ে উঠল। বাড়ির কাছে ছিল চ্যাপেল। তার উদ্যানরক্ষীর সঙ্গে বহুবার নিকটস্থ মর্গে রক্ষিত শবদেহ দেখবার অদ্ভুত আগ্রহ ছিল। মৃত্যুর এই অতিপ্রত্যক্ষ নিথর রূপ—আমরা জানি—ভবিষ্যৎ বার্গমানকে সাহায্য করবে।

অবশ্য কিছুই যাবে না ফেলা। পিতা তাঁর রক্তে ধর্মীয় স্রোত প্রবাহিত করেছেন, ধ্রুপদী সংগীত তাঁকে দিয়েছে আত্মার স্বরলিপি। জোহান সেবাস্তিয়ান বাখের অনুকরণে তাঁর হ্রস্ব স্বাক্ষর হল S.D.G. (ঈশ্বরই একমাত্র মহিমাময়)। চলচ্চিত্রায়িত তাঁর নারীদের দ্বিধা ও দৃঢ়তায় অনপনেয় প্রভাব ফেলে যান মা কারিন বার্গমান। কালক্রমে পরমপিতার সমীপে যে অবিনশ্বর স্বগতোক্তি

রাখবেন গৃহে পিতার বিবেচনার্থে কৃতকর্মের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের আন্তরিক প্রচেষ্টাসমূহতেই হয়ত তার প্রথম সোপান। বয়স যখন বারোর কোঠায় পৌছল তখন থেকেই বস্তুত বার্গমানের শিল্পীজীবনের সূত্রপাত। আমরা লক্ষ্য করছি পুতুলনৃত্যের পরিকল্পনা ও ম্যাজিক লণ্ঠন প্রক্ষেপন তাঁর নিয়মিত করণীয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নাটক ও চলচ্ছবির প্রতি প্রণয় এতই গভীর হয়েছে যে একবার সিনেমা দেখার উত্তেজনায় অন্তত তিনদিন জ্বরে শয্যাশায়ী হতে হল। পিতার সৌজন্যে সিনেমা শহর রোস্গুাতেও ভ্রমণ সম্ভব হল। আর সকৌতুকে জানতে পারি যে বাসভবনের নিকটস্থ প্রেক্ষাগৃহের প্রোজেকশনিস্ট পদ ইতিমধ্যে বার্গমানের উচ্চাশার লক্ষ্যবস্তু। সংগীতে আপাতত ভাগনার তাঁর প্রিয়; বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে তালিকায় যুক্ত হবেন বাখ, হাণ্ডেল, মোৎসার্ট, বিটোফেন, ব্রাহ্‌মস ও স্ট্র্যাভিনসকি। সাহিত্য তেমন প্রিয় নয় কিন্তু কোন বালিকার আরক্ত ওষ্ঠের চাইতে স্বাদু মনে হচ্ছে থ্রি পেনি অপেরা যদিও তাঁর প্রকৃত আলোকপ্রাপ্তি অর্থাৎ স্ট্রীণ্ডবার্গ সান্নিধ্য তখনও সম্ভব হয় নি। তার জন্য আরও বছর পাঁচেক অপেক্ষা করতে হবে। কি যে দিব্যোন্মাদনা বহন করে আনল ড্রিম প্লে! কৈশোরের নিষ্পাপ উপত্যকা থেকে বার্গমান নির্বাসিত হলেন যন্ত্রণাগাঢ় অন্তর্জগতে। স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষা অসমাপ্ত রয়ে গেল; সুইডেনের সৌভাগ্য যে একদিন পিতামাতার সঙ্গে তপ্ত কলহের পরিণামে ঘর ছাড়লেন বার্গমান; ছিন্নবাধা পলাতক তাঁর যৌবনের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়াল মঞ্চমায়া। আমরা নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক বার্গমানকে নিয়ে এ প্রসঙ্গে ভাবিত নই। শুধু জেনে রাখা জরুরী যে নাটক আজীবন তাঁর অনুগতা সহধর্মিনীর মত থাকবে ও নিজের চাইতে স্ট্রীণ্ডবার্গ, ওনিল, কাম্যুর রচনা তাঁকে অধিকতর মঞ্চসফলতা দেবে আর মঞ্চই হয়ে উঠবে চলচ্চিত্রের জন্য প্রয়োজনীয় অভিনেতা অভিনেত্রী সরবরাহের উৎস।

এ রকম একটি গুজব আছে যে রাজনীতি বার্গমানকে কখনো টানে নি। গুজব সাধারণত ভিত্তিহীন। এক্ষেত্রেও তাই। আমি একটি ছোট উদাহরণ দেব। সংস্কৃতি বিনিময় কর্মসূচী অনুযায়ী ১৯৩৪ সালে বার্গমান প্রথম জার্মানি যান। হিটলার তখন মধ্যগগনে। স্বভাবতই নাৎসী প্রচার এই ষোড়শ বর্ষীয় যুবাকে অংশত প্রভাবিত করে তবে সেই প্রভাব তাঁকে নিরস্ত করতে পারে নি ভাইমারস্থ জনৈকা ইহুদি বালিকার প্রণয়প্রার্থী হতে। পরবর্তী গ্রীষ্মে দ্বিতীয় ভ্রমণে বার্গমান দেখলেন উক্ত অঞ্চলে এক অস্বাভাবিক নীরবতা; আর্য অহঙ্কারের

দাম দিতে পুরো পরিবারটি "উধাও" হয়ে গেছে। বাল্যতে সেই প্রথম আঘাত অবচেতনায় এই ক্ষত বহুদিন জেগে থাকবে। জার্মান ফৌজের নরওয়ে গ্রাসের পর থেকে যুদ্ধকালীন সময়ে (১৯৪০-৪৪) "নিরপেক্ষ" সুইডেনে বারকয়েক ম্যাকবেথের মঞ্চায়ন ও ডানকানের ভূমিকায় অবতরণ প্রমাণ করবে তাঁর নাৎসী বিরোধী আবেগ এবং ১৯৪৪ সালে জীবনের প্রথম বাস্তবায়িত চিত্রনাট্য টরমেণ্ট বা ফ্রেনজির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে মহাদেশময় ট্র্যাজেডির পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশীয় নির্লিপ্তি তাঁকে কি গভীর হাহাকারে পৌঁছে দেয়। এই হাহাকারই আতঙ্ক ও যন্ত্রণায় প্রবীণ হবে সেভেনথ সীল কিংবা সাইলেন্স অথবা পার্সোনায়। আর এই যুদ্ধই ইংগমার বার্গমানের জীবনে দ্রুত একের পর এক অধ্যায় যুক্ত করে গেল।

১৯৪০— ম্যাকবেথের প্রথম মঞ্চায়ন।

১৯৪১—চলচ্চিত্রে আত্মনিয়োগের ভাবনার প্রথম সূত্রপাত।

১৯৪২—স্বরচিত নাটকের প্রথম মঞ্চরূপ ও সেই সূত্রে প্রযোজনা সংস্থা সেভেনস্কি ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে চিত্রনাট্যকার হিসাবে যোগদান।

১৯৪৩—বর্ষব্যাপী রোমান্সের পরিণতিতে নর্তকী শ্রীমতী এলসা ফিসারের সঙ্গে প্রথম বিবাহ।

১৯৪৪—প্রথম সফল চিত্রনাট্য টরমেণ্ট।

১৯৪৫—স্ব-কৃত প্রথম চলচ্ছবি ক্রাইসিসের শুটিং ও সমাপ্তি।

বার্গমানের অগ্রস্থতির চিত্রলেখটি—সৌন্দর্য রচনার থেকে সত্যানুসন্ধানকে গুরুত্ব প্রদান—তুলনামূলকভাবে মন্থর। বাণিজ্যিক অর্থে অসফল ছবি মাত্রই শৈল্পীক অর্থে উত্তীর্ণ নয়। ক্রাইসিসও তাই। চলচ্চিত্রের মদির কটাক্ষে উন্মাদ, অধৈর্য, সম্ভব হলে দূরভাষপঞ্জীটিকেও সেলুলয়েডায়িত করেন—এরকম পরিস্থিতিতে ছবিটির নির্মাণ। অবিশ্বাস্য মনে হলেও জনমনোরঞ্জন ছাড়া তার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমাদের এবং আমাদের আগে চলচ্চিত্রটির জনয়িতার পক্ষে আজ তার অনায়াস বিস্মরণ সুসম্পন্ন। প্রকৃত প্রস্তাবে চল্লিশ দশকের শেষ পর্যন্ত বার্গমান স্ব-প্রতিকৃতি খুঁজে পান নি যদিও শিপ টু ইণ্ডিয়ার (১৯৪৭) জন্য তাঁর খ্যাতি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করে স্বয়ং আঁদ্রে বাজার দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

ভাগ্যক্রমে কুয়াশা কেটে যেতে দেরি হয় নি। পঞ্চাশের দশকের একেবারে শুরু থেকেই বার্গমান দীপ্তিমান হয়ে উঠলেন তরুণ অর্কের মতো। গ্রীষ্মক্রীড়ার

মধ্যে ঝলমল করে ওঠা এক সমুদ্রতীরস্থ তন্বী : মুগ্ধ আমাদের শরণ নিতে হল শেক্সপীয়ারীয় সনেটের—Shall I compare thee to a summer's day— তোমার উপমা আমি দেব নাকি বসন্তের দিনে। আমরা বার্গমানের প্রথম সার্থক সৃষ্টি সামার ইণ্টারল্যুড (১৯৫০)-এর জগতে প্রবেশ করছি। এ এক আশ্চর্য গীতিকবিতা যার পরতে পরতে নর্ডিক ঐতিহ্যানুশ্রুতিতে প্রকৃতির শরীরী রূপ যা যৌবনকুঞ্জটিকে একবার রক্তিম করে তুলে পরে আবার বিধুর হয়ে যায়। This was my first film in which I felt I was functioning independently, with a style of my own, making a film all my own, with a particular appearence of its own, which no one could ape—আমরা সানন্দে স্বীকার করব বার্গমান এই প্রথম থিয়েট্রিক্যাল আবহাওয়ামুক্ত হয়ে চলচ্চিত্রীয় জলবায়ুতে স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নিলেন। উপরন্তু যদি গভীরতর সমীক্ষার আয়োজন করি তবে দেখব এই ছবি স্বয়ং স্রষ্টার পক্ষেও এক আত্মনিরীক্ষা যা তাঁকে জীবনযাপনের স্বপক্ষে ইতিবাচক বিবৃতি দিতে প্ররোচনা দেয়। আমাদের ভুলে যাওয়া অসম্ভব যে সংশ্লিষ্ট চিত্রের রোমান্টিকতা এই অর্থে আধুনিক যে তা যতটা সমন্বয়বিধায়ক (accomodative) ততটা সমাধান (solution) নয়। সামার ইণ্টারল্যুড, উত্তরকালের পার্সোনার মত, তাঁকে বাঁচায় কেননা জীবনীকারের সৌজন্যে জানতে পারি অভ্যন্তরীণ বহু রক্তপাতের পরেই বার্গমান অন্তত অস্থায়ীভাবেও নোঙর ফেলেন এই অন্তরীপে।

যাকে বলে অভিনবত্ব, তার কোন চিহ্নই কিন্তু নেই সামার ইণ্টারল্যুডে। বিষণ্ণ রোমান্টিকতা, ফাল্গুনের এই বিদায়গাথা আমাদের বহু পরিচিত। প্রকরণগত দিক থেকেও ক্ষুদ্রপ্রাণ পরিচালকেরা যা সভয়ে পরিহার করেন এমন বহু ক্লিশেকে মহীয়ান করে তুলেছেন বার্গমান। দর্পণে প্রতিবিম্বিত মারি ও পরবর্তী ফ্ল্যাশব্যাকটি দেখে কি চলচ্ছবির কোন মল্লীনাথেরও মনে হবে যে এই রীতিটি তিরিশের দশকের উত্তরপর্বে অতিব্যবহারে জীর্ণ ও অরসন ওয়েলসের চোখে পুওর ট্রিকস মাত্র ? বস্তুত বার্গমানের ফ্ল্যাশব্যাক বারেবারে আমাদের স্মরণ করায় যে মহৎ স্রষ্টার কাছে তা পুনর্জিত অতীত নয় বরং সম্প্রসারিত বর্তমান (অথচ এই বার্গমানই ভবিষ্যতে পার্সোনায় নার্স আলমার যৌন উন্মত্ততার বিবরণে আত্মসম্বরণ করবেন, ফ্ল্যাশব্যাকের বদলে জেগে উঠবে বিবি অ্যাণ্ডারসনের অন্তহীন কামনামদির কণ্ঠস্বর)। আর নিতান্ত সাধারণও যে

প্রতিভার পরশকাঠির ছোঁয়ায় মুহূর্তে অসাধারণে রূপান্তরিত হতে পারে তার প্রমাণ এই ছবির ক্লোজ-আপ। হে পাঠক, অনুগ্রহ করে স্মরণ করুন সেই অংশটি যেখানে মারি বলে—I feel like a painted puppet on a string, if I cry, the paint runs. Let me mourn my youth in peace. সারাজীবন ধরেই বার্গমান ক্লোজ-আপে বেছে নিয়েছেন মানুষের দেহের মধ্যে যা সবচেয়ে আধ্যাত্মিক সেই অঞ্চলটি অর্থাৎ মুখমণ্ডল। সারা জীবন ধরেই তিনি অক্লান্তভাবে অবলোকন করেছেন মানুষের মুখ নানাবেশে, নানাভঙ্গীতে, নানাভাবে। অনেক পরে তাঁর অভিনেত্রী লিভ উলমান আমাদের জানালেন—When the camera is as close as Ingmar's sometimes gets; it doesn't only show a face but also what kind of life this face has seen.

সামার ইন্টারল্যুডের মধ্য দিয়েই মুখের প্রতি—যা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে নিজস্ব হলেও আসলে অচেনা—তাঁর এই বিশেষ আগ্রহের সূচনা। লং শটে মিজোগুচি যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী আমি বলব ক্লোজ-আপে বার্গমান তেমনই সম্রাট। আরও বলার যে প্রতীচ্য চিত্রকলায় মুখাকৃতির প্রতি বিশেষ মনোযোগের যে প্রবণতা ও কারনের জন্ম হয়েছিল স্বয়ং রেমব্রানটের তুলিতে, মাধ্যমের তারতম্যে তাই সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয় বার্গমানে। রেমব্রানটের মুখাকৃতির মতই বার্গমানের ক্লোজ-আপও অন্তরতম মানুষের দ্রষ্টা। অধিকাংশ মানুষ আমরা মুখোশের আড়ালে থাকি। একজন বার্গমান আবরণ উন্মোচন করলে আমাদের মৌল নিঃসঙ্গতা ভাস্বর হয়ে ওঠে। আত্মিক জীবন, সত্তার আলেখ্য অঙ্কন যেহেতু প্রধান উপজীব্য বার্গমানের প্রতিটি ছবিতেই ক্লোজ-আপ স্বতন্ত্র মনোযোগ দাবি করে।

পূর্বাভাষ হিসাবে নিষ্পত্র বৃক্ষ, মৃত্যু-প্রতীক রূপে মারির প্রথম প্রণয়ী হেনরিকের দিদিমা ও মৃত্যুর দৃশ্যে মেঘ ও সূর্যের দুর্দান্ত শট, তুলনারহিত এক কর্কশতা—আমরা এসব প্রসঙ্গের উল্লেখ মাত্র করে এবার বরং মনোযোগ দেব বার্গমানের নারী সমীক্ষায় কেননা চল্লিশ দশক পর্যন্ত বার্গমান মোটামুটিভাবে পুরুষ চরিত্রের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, এই ছবি থেকে নারীও তাঁর তদন্তকার্যে কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিল। আর আমাদের চোখে পড়বে যে বার্গমানের দার্শনিকতার দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্য হিসাবে তাঁর নারীরা অনেক বেশি সফল যেহেতু নারী পুরুষের তুলনায় সাধারণত পার্থিবঃ রক্তমাংসের একমাত্রিকতা যুক্ত। 'সামার উইথ

মণিকা' থেকে Cries and whispers পর্যন্ত বার্গমান তাঁর অম্বিষ্ট অদৃশ্য কিন্তু আলোকিত সত্যের বিপরীত মেরুতে স্থাপন করেছেন তমসাচ্ছন্ন মাংসের কারাগার। আর এই পরীক্ষাকার্যে পুরুষের তুলনায় নারী তাঁকে অধিকতর সহায়তা দিয়েছে। এই রহস্যটুকু হৃদয়ঙ্গম না করতে পারলে আমরা সেই ভ্রমে আক্রান্ত হব যেখান থেকে একদা ক্রুকোর মনে হওয়া যে তাঁর সুইডিশ সহকর্মীর পুরুষ চরিত্ররা যখন প্রথার অনুবর্তন নারীরা তখন অনেক সূক্ষ্ম ও স্বয়ংসম্পূর্ণা, ও উল্টোদিক থেকে শ্রীমতী জোয়ান মেলেনের মত সমালোচনাপটিয়সীর সিদ্ধান্ত যে নারীত্ব বিষয়ে বার্গমানের ধারনা এমনকি প্রগতির পরিপন্থী ও পৌরুষের অহংতুষ্ট। আসলে নারীচরিত্র গঠনে বার্গমান একটি নম্র স্তবগান ধ্বনিত করেন স্ত্রীগুবার্গের প্রতি। শ্রীমতী জুলি প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন—Strindberg's way of experiencing women is ambivalent. While he's an obsessive worshipper of women, he also persecutes them. এই বক্তব্যের উজ্জ্বল সমর্থন মেলে 'সামার ইণ্টারল্যুড' (১৯৫০) ও 'সামার উইথ মণিকা' (১৯৫২)—প্রায় একই পর্যায়ের দুটি সৃষ্টিকর্ম থেকে। মারি যেখানে গম্ভীর, বিষণ্ণ ও হৃদয়বতী, মণিকা সেখানে প্রোজ্জ্বল ক্লেদ, ইন্দ্রিয়বিলাসিনী ও মনোহীনা। প্রথম ছবিটিতে কোমল ও রমণীয় দিন এসে মেশে ধূসর প্রদোষে, দ্বিতীয় ছবিটিতে প্রথম থেকেই সুখের হাত ধরে থাকে বিমর্ষতা। আপাতনিন্দিত মণিকাই অথচ আধুনিকদের পক্ষে অধিকতর বরণীয়া। এইজন্যে নয় যে সে বোদলেয়ারের মহিলাদের মতই বিপজ্জনক বরং এই কারণে যে সমগ্র নবতরঙ্গ পূজিত তার দীর্ঘ দৃষ্টিপাতে যখন সে স্বর্গের বদলে নরককে আমন্ত্রণ জানাল তখন এবং প্রথম তখনই সে নৈতিকতার প্রশ্নে বার্গমানকে দস্তয়েভস্কির জগতে প্রবেশাধিকার দিল : good and evil are one. Evil is merely the wrong choice at the moment of truth. এই আরোহণের কাছে হাস্যমুখর মণিকার নিষ্ক্রমণ ও স্বপ্নভঙ্গের পর শ্রান্ত প্রত্যাগমন : স্টকহোমের জাগরণ ও নিদ্রা বিষয়ক যাবতীয় গৌরচন্দ্রিকা নেহাৎ চিত্রসাংবাদিকতার মত তুচ্ছ মনে হয়।
সডাস্ট অ্যাণ্ড টিনসেল (১৯৫৩) থেকে ছবিতে আবেগ ও বুদ্ধির দ্বন্দ্ব এবং রূপক হিসেবে পর্যটনের উপাদানও সংযোজিত হল। তবু এখনো পর্যন্ত আমরা তাঁর প্রতিভার সঙ্গে সেই প্রদেশে বিহার করিনি যা তাঁর পক্ষে শুধু নিজস্ব নয়, একক ও সার্বভৌম। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তাঁর ছবি যদিও নির্মাণের স্মরণীয়তার জন্যে বিখ্যাত তবু তা মহাকালের উৎসঙ্গে লুটিয়ে নেই।

ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর প্রসিদ্ধ সংঘর্ষ তখনো শুরু হয়নি। জার্নি ইনটু অটামেই (১৯৫৫) যৌবনাবসান, আর বার্গমান তখনই মানব সভ্যতার সম্পদ হয়ে ওঠেন সেভেনথ সীল (১৯৫৬) ও উত্তর কালপর্বে যখন তিনি আমাদের অস্তিত্বের পট জুড়ে যে বহু মিশ্রনিনাদ ধ্বনিত হচ্ছে—মৃত্যু ও মনস্তাপে যা পাণ্ডুবর্ণ—তাকে নিবেদন করেন কোন অনন্ত, কোন পরম, কোন অমেয় সমীপে। যেহেতু এই ঈশ্বর 'ভার্জিন স্প্রিং' ব্যতীত কুদর্শন, নীরব এবং উইণ্টার লাইটের পর থেকে মৃত, জ্ঞানমার্গের সাধনায় বার্গমান, বুদ্ধপ্রতিম, হয়ে ওঠেন ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা বিকল্প ঈশ্বর।

"এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?"—স্ব-কৃত প্রশ্নের উত্তরে বাঙালী লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জীবনসায়াহ্নে উত্তর পান—ঈশ্বরানুবর্তিতা। অনুরূপ আর্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে ইংগমার বার্গমান আরও সাম্প্রতিক সভ্যতার জীব বলেই গভীরতর সংকটের সাক্ষী হন। Prison (১৯৪৯)-এ তিনি হিরোশিমা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন, ঈশ্বরের সম্বন্ধে কতিপয় গৌণ মন্তব্যও সম্ভব হয়েছিলো ইতিমধ্যে কিন্তু বহির্মুখী চৈতন্যরাশিকে সাময়িকতার সংস্কারমুক্ত সংহতি দিয়ে সময়ব্রহ্মের শুদ্ধস্বরূপের দিকে প্রবাহিত করার প্রথম দৃষ্টান্ত সেভেনথ সীল। ধর্ম-যুদ্ধের স্বপ্ন ফিকে হয়ে এলে আসে মহামারী। রিক্ত অন্তরে মানুষের শ্রম ও সাধনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে নাইট আন্তোনিয়াস ব্লক ঃ তাঁর জলেনি আলো অন্ধকারে। আর এই অন্ধকারেই সে অসহায়, ঊর্ধ্বমুখ, সহজীবীদের মূঢ় নির্বুদ্ধিতায় সব দীপ বারে বারে নিভে গেলে তবুও এক আসন পেতে রাখে। এক নিঃসঙ্গ অবিশ্বাসী মৃত্যুর দ্বারা বিজিত হওয়ার অন্তর্বর্তী সময়ে যে বুঝে নিতে চায় ঈশ্বর অনুভূতিগ্রাহ্য কিনা? যারা ভক্তিমান হতে চাইল কিন্তু আস্থার ভূমি খুঁজে পেল না অথবা যারা বিশ্বাস করতে চায়ও না পারেও না তাদের পরিণাম কি? সিনেমায় মৃত্যু যখন প্রথম প্রবেশ করে বার্গমান সাউণ্ড ট্র্যাক স্তব্ধ করে দেন। মৃত্যু এসব প্রশ্ন গোপনে শোনে কিন্তু নিরুত্তর থাকে। অর্থাৎ দেকার্তের মত আমাদের শিল্পীও মনে করেন নিয়মাবদ্ধ সংশয়ই শেষ পারানির কড়ি। The void is a mirror. I see myself feel fear and loathing—ব্লক বলে। কিসের জন্য অপেক্ষা করছ? লুক্কায়িত মৃত্যুর জিজ্ঞাসার উত্তরে একটি অমোঘ একঘ্নী বাণ সে তূণীর মুক্ত করে—জ্ঞান। লক্ষ্য করার যে এই স্বীকারোক্তি আত্মউন্মোচন কিন্তু মোক্ষ-প্রাপ্তি নয়। বরং কারারুদ্ধ বন্দীর মতো নাইটের বাচনভঙ্গী, মৃত্যু নীরব প্রহরীর

ভূমিকায়। এইখানেই বার্গমানের আধুনিক শিল্পীস্বভাব যে প্রশ্নার্ত নাইটের ভ্রমণ সমাপ্ত হয় না কোন সুনিশ্চিত উত্তর পেয়ে। যন্ত্রণাভোগের পরেও অপেক্ষা করে থাকে তিমিরের উপত্যকা ও মৃত্যুর নৃত্য। দাবার ছক উল্টে যায়, তার নিরবয়বী অস্তিত্ববাদ তত্ত্বের বদলে কর্মের নির্দিষ্ট একটি কার্যক্রম খুঁজে পায় ঈশ্বরীয় দম্পতির নিরাপত্তা বিধানে। আমাদের মনে পড়ে যায় মৌহূর্তিক আলোকরেখা—সন্ধ্যালগ্ন, দুগ্ধ ও স্ট্রবেরি, নাইটের অঞ্জলিবদ্ধ করতল ও মিয়ার অপলক মুখশ্রীর শান্তি এক ঝলক। গৃহে প্রত্যাগমনের পরেও নাইটের ক্লিষ্ট মুখচ্ছবির বদল হয় না। "লাস্ট সাপার" দৃশ্যে শুধু অনাথিনী মূক বালিকাটি প্রথম ও শেষবারের মত বাক্য উচ্চারণ করে—It's finished. ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের প্রতিধ্বনিতে একমাত্র সে-ই মৃত্যুকে স্বাগত জানানোর যোগ্যতা অর্জন করে।

ইউরোপীয় ধ্রুপদী ঐতিহ্যে তীর্থ যাত্রার ভূমিকাটিকে মনে রেখেই আমি বলব বার্গমানের ছবিতে তীর্থের চাইতে যাত্রার ভূমিকা মুখ্য; সমাধানের চাইতে সংকট। পরিক্রমার শেষে কোন ঈশ্বরঘন আশ্রয় নাইট ও দর্শককে বিশ্রাম দেয় না। অন্ধকারের স্তর পেরিয়ে আরও অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার আগে পথে চলে যেতে যেতে কোথায় কোন্‌খানে শুধু একটি দিব্য তরুণী আমাদের যন্ত্রণাকে অর্থ দেয়। আবারও স্মৃতিতে আসে সেই ঘনায়মান প্রদোষ: সহসা দারুণ দুখতাপে / সকল ভুবন যবে কাঁপে, / সকল পথের ঘোচে চিহ্ন, / সকল বাঁধন যবে ছিন্ন, / মৃত্যু আঘাত লাগে প্রাণে—/ তোমার পরশ আসে কখন কে জানে। /—বার্গমান তবে কি অন্তিম মূল্য পেতে চান প্রেমে?

প্রেম নয়; প্রীতি। যে প্রীতি কমলাকান্তের ভাষায়, সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। এই ছবির যদি কোন বাণী থেকে থাকে তবে তা বিবৃত করে স্কোয়ার জোনাস—গম্ভীর ও প্রশ্নপরায়ণ নাইটের তিক্ত ও অবিশ্বাসী আপাত বিরোধাভাষ: If everything is imperfect in this imperfect world love is most perfect in its perfect imperfection. যদিও প্রাথমিক ভাবে বেশ্যার উরুসন্ধি তার প্রভাতসঙ্গীত তবু সে, একমাত্র সে-ই ডাইনি সন্দেহে যাকে পোড়ান হবে সেই হতভাগিনীর চোখের মধ্য থেকে আবিষ্কার করে শূন্যতা ও আতঙ্ক সঞ্চারিত করে আমাদের মধ্যে। ইহলৌকিক অর্থে আপাত নাস্তিক সে-ই চাষী কন্যাটির উদ্ধারকার্যে রত হয়ে ত্রাতা। মৃত্যুর বিরুদ্ধেও সে অন্তিম প্রতিবাদ। নাইট যদি সকলের জন্য দুঃখবোধ করার দায়িত্বে স্বয়ং নিযুক্ত থাকে

সঙ্গী তবে অন্তত কর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করে। প্রকৃত প্রস্তাবে নাইট ও স্কোয়ার অবিচ্ছেদ্য ও সম্পূরক।

মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সুখ্যাত পক্ষীদ্বয়ের মতো একটি অখণ্ড উপলব্ধিকে বিশ্লিষ্ট বা বিভক্ত করে বর্ণনা করবার প্রয়াস—তত্ত্বে ও কর্মে, আত্মায় ও শরীরে, জীবন ও মৃত্যুতে, বিশ্বাস ও সংশয়ে, মেধা ও অনুভূতিতে, মৌনতা ও বাগবিভূতিতে—বার্গমানের সৃজনক্রিয়ার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। যথাসময়ে সাইলেন্সের এস্টার ও আন্না, পার্সোনার আলমা ও এলিজাবেথ, উইণ্টার লাইটে টমাস ও মার্তার মধ্যেও একই কৌশল পরিলক্ষিত হবে। তবু আমার বিবেচনায় সেভেন্‌থ সীলের গুরুত্ব অন্যত্র। এই প্রথম বার্গমান নিছক শিল্পরচনার পরিমিত আকাঙ্খা বর্জন করে দার্শনিক বক্তব্য রাখার দুঃসাহস দেখালেন। আমরা ভুলে যাবনা রবিন উডের মত সমালোচকরা স্কিম্যাটিক অভিযোগে সংশ্লিষ্ট ছবিটির প্রতি বিরূপ ; সন্দেহ নেই অংশ বিশেষে এর থিয়েট্রিক্যাল আবহাওয়া বিরক্তিকর ; পবিত্র পরিবারটির পরিত্রাণপর্ব তো হাস্যকর। কিন্তু অধিকতর মনোযোগের দ্বারা যা স্মর্তব্য তা হল একজন প্রকৃত আধুনিকের মতই বার্গমান যা কিছু দৃশ্য তা থেকে চিন্তনীয়কে বেশী মূল্য দিয়েছেন। বস্তুতঃ এই ছবিতে বার্গমানের বক্তব্য প্রেম এতদুর প্রসারিত যে তিনি স্বচ্ছন্দে বিস্মৃত হয়েছেন ঐতিহাসিক বাস্তবতা : ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুইডেনে উইচ্‌ বার্নিং ছিল না, যেমনভাবে তাঁর প্রিয় নাটক থ্রি পেনি অপেরায় ব্রেশট বিস্মৃত হয়েছেন লণ্ডন শহরের ভৌগোলিক বাস্তবতা, যেমনভাবে সুবর্ণরেখার ঋত্বিক ঘটক বিস্মৃত হন স্বাভাবিকতার বাস্তবতা। অর্থাৎ সেভেন্‌থ সীল থেকে বার্গমান বাস্তবতাকে প্রশ্ন ও পরীক্ষা এবং সেই অর্থে পুনসৃজন করতে শুরু করলেন ও হয়ে উঠলেন আধুনিক শিল্পচিন্তার এক বাস্তব প্রতীক। আর সেজন্যই কাইয়ে দলের অন্যতম সদস্য এরিক রোমারের সঙ্গে সবিনয়ে মেনে নেব—Seldom has the film managed to aim so high and so completely realize its ambitions.

পরবর্তী ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ (১৯৫৭)এ চব্বিশ ঘণ্টার তীর্থযাত্রা ধর্মীয় মধ্য-যুগের বদলে নিরীশ্বর সাম্প্রতিকে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লগ্নে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি গ্রহণের প্রাক্কালে আইজাক বর্গ উপলব্ধি করলেন হৃদয় যখন শুকায়ে যায় তখন করুণাধারায় কাউকে আহ্বান করার যোগ্যতা পর্যন্ত তার নেই। জড়ের সাম্রাজ্যে স্বামী, প্রেমিক, পিতা এমন কি বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি এক নির্জন বাসিন্দা। সমস্ত পরীক্ষা তাঁকে পরাস্ত

করে। তিনি জানতে চান—What is the penalty? উত্তর পান—The usual one, I suppose, loneliness. আত্মসর্বস্বতায় যে দেশকাল পট-ভূমিতে অনুভূতি অসাড় হয়ে গেছে, আত্মা যেখানে হিমীভূত সেখানে বৃদ্ধ বর্গের আত্মজ্ঞান অর্জন কোন প্রজ্ঞানের প্রকাশ নয় বরং বাধ্যতামূলক পরিস্থিতির অনৈচ্ছিক লব্ধি। যদিও শিখরে আরোহণের মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়েছে নরক মন্থন তবুও বুনো স্ট্রবেরি কোন মহিমান্বিত ট্র্যাজেডি নয়, সত্যের ধারাবাহিক উন্মোচনে অভিশপ্ত মানবপুত্র অধ্যাপক আইজাক বর্গ যতটা হতবুদ্ধি ততটা সন্ত্রাস্ত নন।

আত্মার পুনরুত্থান সংক্রান্ত আধুনিক রূপকটির ভাষ্য প্রণয়নে বার্গমান সমগ্র বাস্তবতাকেই স্বপ্নের স্তরে উন্নীত করেছেন। সেই রহস্যময় অশ্বশকট ও কাঁটাহীন ঘড়িটিকে দেখেই আমরা বুঝতে পারি সময় অতঃপর আর সর্গবদ্ধ থাকবে না। বর্গের যাবতীয় দুঃস্বপ্নই বস্তুত একটি দীর্ঘ স্বপ্নের অন্তর্গত যার বিকল্প হচ্ছে জীবন ও জাগরণ। Oh! you may run and run, but your memories are in the baggage-car and with them remorse and repentance—স্ট্রীণ্ডবার্গ-চর্চা যদি বুনো স্ট্রবেরির পশ্চাদভূমি হয়ে থাকে তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই; বার্গমান শ্রীমতী জুলির দ্বারা আজীবন মুগ্ধ। কিন্তু অধ্যাপক বর্গ আসলে সুইডিশ ছায়াছবির পিতৃপুরুষ ভিক্টর সিওস্ট্রমের প্রতি একটি প্রাতিস্বিক অর্ঘ্যবিশেষ।

একই বছরে বার্গমান উপহার দিলেন ব্রিঙ্ক অফ লাইফ সেখানে প্রথম দ্ব্যর্থহীন-ভাবে বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল ভিস্যুয়ালের তুলনায়। আর পরের বছরটি (১৯৫৮) চিহ্নিত হল দি ফেস-এর নির্মাণকাল হিসাবে। সডাস্ট অ্যাণ্ড টিনসেলের পরিমার্জিত ও সংশোধিত সংস্করণ 'ফেস' সম্পর্কে বার্গমানের মমতা ও উচ্চাকাঙ্খা আমরা নানা সূত্রে অবগত হই। এই মুখমণ্ডল যে স্রষ্টার নিজস্ব তা বোঝার জন্য অবশ্য তেমন অভিনিবেশের প্রয়োজন নেই কিন্তু অত্যন্ত আত্ম-জৈবনিকতায় সংরক্ত বলেই হয়ত ঈপ্সীত সার্বজনীন রূপ পায় না, হয়ে ওঠে জীবনের একটি বিশেষ অবস্থানে শৈল্পিক বন্ধ্যাত্ব বিষয়ে বার্গমানের আতঙ্কের একটি তিমিরলিপ্ত অভিব্যক্তি।

One walks step by step into the darkness, the motion itself is the only truth—এই হাহাকার প্রমাণ করে মালমো নাট্যমঞ্চের অধিকর্তা হিসেবে ছ'বছরে (১৯৫২-৫৮) ইংগমার বার্গমান কি অপার ক্লান্তিতে

আচ্ছন্ন। দিনের পর দিন তাঁকে বিনোদনের আয়োজন করে যেতে হয়েছে প্রতিটি অনুপুঙ্খ সহ। বিরতিহীন সেই পেশাদারীত্ব কেননা ব্যর্থতা বা বিশ্রামের অর্থ দর্শকের দ্বারা অবমাননা অথবা প্রত্যাখ্যান। প্রেক্ষাগৃহের মুখর করতালিতে তিনি বুঝতে পারছেন—truth is made to order : the most skillful liar creates the most useful truth. তবু ব্যবহার্য দক্ষতাই কি শিল্পীর একমাত্র লক্ষ্য? মস্তিষ্ক নিয়ত সচল রাখার স্বেচ্ছা-নির্বাচিত শাস্তি কি তবে শিল্পীর রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে তাকে পরিণত করবে তুচ্ছ সম্মোহকে? তপস্যার শুদ্ধতা কি প্রতিস্থাপিত হবে পালনীয় নিত্যকর্মপদ্ধতির দ্বারা? বার্গমান অতএব আত্মপরীক্ষার ব্যবস্থা করেন; জাদুকর ভগলারের মুখমণ্ডলে প্রতিবিম্বিত হয় সত্য ও ছলনার দ্বৈরথ।

একদা এক সাক্ষাৎকারে বার্গমান জানান—দর্শক যেখানে অভিভূত হতে ইচ্ছুক সেখানে তিনি একজন জাদুকর অন্যথা প্রতারক মাত্র। আলবার্ট ইমানুয়েল ভগলার এমনই একজন ব্যক্তিত্ব। সে মূক (অবশ্য এই মৌনতা একই পদবীর মাধ্যমে অনেক সার্থক মুখোশ হিসেবে ব্যবহৃত হবে প্রায় আট বছর বাদে পার্সোনাতে) কেননা তার শিল্পই তার হয়ে কথা বলবে। আর এই শিল্প যে নির্দোষ ক্রীড়াকৌতুক; দর্পণ, প্রক্ষেপক ও কতিপয় যন্ত্রের সহায়তায় আয়োজিত বিনোদন সেকথা জানায় তার স্ত্রী। অসহায় ভগলার উপলব্ধি করে যদি বা দর্শকের ক্ষণিকের ভক্তি ও সমর্পণ তার করায়ত্ত তবু যে শুষ্ক যুক্তিবাদীদের সে ঘৃণা করে সে নিজেও তাদের মতই নশ্বর ও একদিন সেই হীনপ্রাণ অনুসন্ধিৎসুরাই তার অলৌকিক মহিমাকে ছদ্মবেশী শঠতার স্তরে অবনমিত করবে। তাহলে অসমাপ্ত থেকে যাক দিবসের ধিক্কারের ইতিহাস, তবু পুনরাবৃত্ত হোক রজনীর মোহ আবরণ।

অন্তত সাময়িকভাবে বার্গমানের মানসিকতায় আর সত্যের নিত্যপরিবর্তমান, বহুস্তরসমন্বিত অনিয়তাকার রূপের সঙ্গে সহবাস সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি মনেও করতে শুরু করেছিলেন যে মধ্যযুগের পর শিল্প যে মুহূর্তে অর্চনার থেকে পৃথকীকৃত হল, সে মুহূর্ত থেকেই লুপ্ত হল শিল্প সৃজনের মৌল উদ্যম। সুতরাং ফিরে এলেন প্রথাসিদ্ধ খ্রীস্টীয় জগতে; সম্পন্ন হল ভার্জিন স্প্রিং (১৯৫৯)। তবে যেহেতু বার্গমান মহৎ শিল্পী, সত্যের সঙ্গে দাম্পত্য রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, বেশীদিন শাস্ত্রের দ্বারা অনুশাসিত হওয়া তার নিয়তিতে ছিল না। ক্ষণস্থায়ী এই অভিজ্ঞতাকে শিল্পী নিজেই পরে বন্দীত্ব বলে বর্ণনা করেছেন। তথ্যের

স্বার্থে বলা যেতে পারে আবিশ্বে অভিনন্দিত ঝর্ণাকুমারীর প্রতি বার্গমান খুব প্রীতিপ্রবণ নন কেননা তিনি অনুভব করেন মৌলিকতার অভাব ও কুরুসোওয়ার অনুকৃতি।

আমার উদ্দেশ্য নয় ভার্জিন স্প্রিং-এর ত্রুটি নির্ণয়। কিন্তু আমি বলতে বাধ্য যে ছবিটি বার্গমান প্রতিভার সম্যক পরিচয় নয়। ত্রয়োদশ শতকের একটি লোককথার নিখুঁত ও বাস্তবসম্মত বিবরণ পাব বলে নিশ্চয়ই আমরা বার্গমানের সান্নিধ্য ইচ্ছা করিনি। তিনি যে চলচ্চিত্র মাধ্যমটির ওপরে অনায়াস প্রভুত্ব করেন—তাও তো আমাদের জানা হয়ে গেছে। আমি ভুলে যাচ্ছি না এই ছবির ফ্রয়েডীয় সমীক্ষা, চিত্রানুগ অনুক্রম, নিঃসঙ্গ বার্চগাছের সেই বিরলতুলনা সৌন্দর্য, এমনকি পেগানবাদের সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানিটির দ্বন্দ্ব—যথাক্রমে ইঙ্গেরি ও ও কারিন—বর্ণনায় তাঁর নির্মম নিরপেক্ষতা যে তথাকথিতভাবে পাপিষ্ঠা ইঙ্গেরির অন্তত অনুশোচনায় শুদ্ধির সুযোগ আছে কিন্তু পুণ্যবতী কারিনের সালঙ্কারা অভিযান আসলে এক নির্বোধ অহঙ্কার যার জন্য অপেক্ষা করে আছে ধ্বংস ও বিপর্যয়। অর্থাৎ বার্গমান এখানেও সম্ভব করেন আপাতর বদলে প্রকৃতর উন্মেষ এবং হয়ত বার্গমানের পক্ষেই সম্ভব রক্তমাখা হাতে ঈশ্বরকে অভিযুক্ত করা—I don't understand you God...। অনুরূপ মনোভাব থেকেই 'কয়েদখানা' গল্পে শ্রীযুক্ত কমলকুমার মজুমদার লেখেন "ইয়াসিন ঠেঁটি পরিহিত খিলানের ঠিক মাঝবরাবর দাঁড়িয়ে হাত তাঁর গ্রন্থের মত খোলা, কার কাছে যেন বা ক্ষমা চাইছে। যেন বলছে মানুষের বিশ্বাস হোক তিনি আছেন। ফলে মানুষের সঙ্গে ইতিহাসের ব্যবধান প্রান্তর প্রান্তর হোক।" এবং ইতিহাস চেতনার এই অভাবই শেষপর্যন্ত আমার মনে হয় আত্মানুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়াবার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় ভার্জিন স্প্রিং-এর ক্ষেত্রে।

যদি উপরোক্ত চিত্রটি বাণিজ্যিক সফলতা না পায় তার ক্ষতিপূরণ করতে প্রযোজকের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী তৈরী হল ডেভিল্‌স আই (১৯৬০)। মালমো পর্বের সমাপ্তি, ব্যক্তিগত জীবনে নানা পুনর্বিন্যাস, রুগ্ন উদর, আলোকচিত্রী ফিসারের সঙ্গে মনোমালিন্য, অপ্রিয় চুক্তির ফলাফলে প্রার্থিত অভিনেতাদের অভাব ইত্যাদি নানা কারণে এই ছবিটিকে আমরা আলোচ্য পরিচালকের একটি গৌণ প্রয়াস মনে করতে পারি। চিত্রনাট্যটি অবশ্য অতিশয় ধারালো ও বুদ্ধিদীপ্ত। বিষয় ডনজুয়ানের কিংবদন্তীটির নবরূপায়ণ ও অনুভূতিগত স্থবিরতা।

সাধারণত বার্গমান, তাঁর প্রাচ্যদেশীয় সহকর্মী ঋত্বিক ঘটকের মতই, হাস্যরস বিতরণে ব্যর্থ অথবা পরাঙ্মুখ ; এই ছবিটি সে প্রসঙ্গে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।
সম্ভবত ক্ষণস্থায়ী এই শিথিলতা বার্গমানকে সুযোগ দিয়েছিল নিবিড়তর অন্তরীক্ষণে। ষাটের দশকের প্রথম তিনটি বছর চিহ্নিত হয়ে থাকল বিখ্যাত সেই ত্রয়ীর—থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি, উইণ্টার লাইট ও সাইলেন্স—জন্মক্ষণরূপে। আবার বার্গমানীয় জগতে প্রবেশ করব আমরা ; আমাদের পানীয় হবে চৈতন্যের পরিশ্রুত দ্রবণ ; লক্ষ্য করব শিল্পের তিনটি বিচারকক্ষ যেখান থেকে সম্ভব হয়েছে সমগ্র সভ্যতার পাপাচরণের রায়দান। যদি এমন কোন দুর্যোগ ঘটত যে নষ্ট হয়েছে বার্গমানের চিত্রাবলী কিন্তু রক্ষা পেয়েছে এই ত্রয়ী—তার ভূমিকা ও উপসংহার হিসেবে সেভেনথ সীল আর পার্সোনাও—তবেও ভাবীকাল সসম্ভ্রম প্রণাম জানাত সুইডেনের এই জাতীয় সংস্থাকে। কিরিলভের পিস্তলধ্বনি রুশ সীমান্ত অতিক্রম করার পরই আমরা জেনেছিলাম যদি ঈশ্বর না থেকে থাকেন তবে নৈরাজ্যই ন্যায়। চলচ্ছবির জগতে ঈশ্বরপুত্র বার্গমান প্রথম এই নৈরাজ্যের প্রতিমায় চক্ষুদান করলেন। ঈশ্বর পরিত্যক্ত মানুষের এ এক আশ্চর্য "কোমা" স্তর। ফ্ল্যর দু মাল ফুটে উঠেছে ; বার্গমান এতদিনে সিদ্ধিলাভ করেছেন : ঈশ্বরবিহীন মানব কি জড়ের পরাক্রম মেনে নেবে, না সন্ধান করবে মহত্তর ন্যায়ের? জীবাণুর থেকে আজ কৃষক মানুষ যদি না হেতুহীন সম্প্রসারণে জেগে থাকে তবে দুঃখ রোগ মত্ততা ও নেতির সাহচর্যে ভগ্নসেতু আমাদের উত্তর পেতে হবে অস্তিত্বের আদৌ কোন তাৎপর্য আছে কিনা। বিজ্ঞসমালোচকদের মত আমি এই সূত্রে নিঃসঙ্গতা ও যোগাযোগহীনতার অন্য অধীশ্বর আন্তোনিওনি এবং তাঁর ত্রয়ীর সাদৃশ্য বিশদ করব না। আন্তোনিওনি শিল্পী—তিনি আমাদের ভয়কে বিকশিত করেন। বার্গমান দার্শনিক—তিনি আমাদের ভয়ের উৎস ব্যাখ্যা করেন। বিরহের মূর্ছনায় বার্গমানের আঁধার আমাদের কাছে হয়ে ওঠে আলোর অধিক।

স্ট্রীণ্ডবার্গের পাঠশালায় ইংগমার যা কিছু আয়ত্ত করেছিলেন—দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব ; তমসা ; চরিত্রের খণ্ডীকরণ ; নারী ; অলঙ্কার বর্জন—এবার তাঁর পূর্ণাহুতি দিলেন। থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি (১৯৬১)—ঈশ্বর কুৎসিতে রূপান্তরিত ; উইণ্টার লাইট (১৯৬২)—ঈশ্বরের মুখোশ ছিন্ন হল ; সাইলেন্স (১৯৬৩)—ঈশ্বরের স্তব্ধতা : এ এক ক্রমান্বয়িক বিজারণ যার সূত্রে আমরা দেখলাম নতুন এই পর্যায়ে বার্গমান দর্শকের মনোভাব নিয়ে আর চিন্তিত নন, মোচন করেছেন

সব আড়ম্বর। এখন থেকে শুধুই নির্ভীক বিবৃতি : কোলাহল তো বারণ হল, এবার কথা কানে কানে। স্ট্রীণ্ডবার্গ যেভাবে নাটককে সংগীতের সমীপবর্তী করতে চেয়েছিলেন; বার্গমান সেভাবেই অবশেষে চেম্বার সিনেমার পত্তন করলেন হিমরশ্মি ছবিতে।

অতিরিক্ত বাস্তবতা মানবজাতির পক্ষে অসহনীয়—কথাটা বলেছিলেন কবি টি. এস. এলিয়ট। থ্রু এ গ্লাস ডার্কলিতে বার্গমান আমাদের আত্মতৃপ্তি চূর্ণ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অবতারণা করেন এই অতিরিক্ত বাস্তবতার। সমুদ্রযাত্রায় ডেভিড মার্টিন স্বীকারোক্তিমালায়, যা মূলত ক্যাথলিক কনফেশনের নর্ডিক বিকল্প, উচ্চারিত হয়—we draw a magic circle and shut out everything that doesn't agree with our games. তবুও একদিন কিশোর মিনুসের সামনে বিস্ফোরিত হয় বাস্তবতার নগ্নাবস্থা। যে কোন কিছুই ঘটতে পারে—স্বপ্নোত্থিতের মতন অসহায় সে বোঝে সত্যের রুদ্ররূপ ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে না। কৈশোরের নিষ্পাপ অজ্ঞতা জ্ঞানের যন্ত্রণায় রূপ নিলে আমরা দেখি সে পিতার শরণাগত হয়। যে পিতা ব্যস্ত, কোনদিন সন্তানের প্রতি মনোসংযোগের অবসর পাননি তিনি যখন সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারণ করেন তখন কি নির্মল মিনুসের উল্লাস—Papa spoke to me! ডেভিড-মিনুস সম্পর্ক আসলে পরমপিতার সঙ্গে মানবসন্তানের অপহৃত সমীকরণটির আংশিক পুনরুদ্ধার।

শেষবিচারে অবশ্য রূপকাশ্রিত এই সংকট, দৈহিক নয়; আত্মার অনির্দিষ্ট অবস্থানই চিহ্নিত করে তবু মিনুসের সমস্যা যদি বয়ঃসন্ধির, কারিনের সমস্যা দুটি বিশ্বের, ডেভিডের সমস্যা শিল্প ও জীবনের এবং মার্টিন এদের মধ্যে সবচেয়ে সরল ও মৃত্তিকাশ্রিত। কারিন চরিত্রের রূপায়নের মধ্যে লুথারের শাসন শেষ হল। যদিও খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য অনুসারে স্নায়ুবিকার তার স্বচ্ছ দৃষ্টিরই পরিচায়ক এবং সে-ই উপস্থিত চরিত্রদের মধ্যে ঈশ্বরের দর্শনপ্রত্যাশী (প্রসঙ্গত স্মরণীয় হ্যামলেটের পাগলামি আর হ্যামলেটের উদাহরণটি যে বার্গমান নিজেও বিস্মৃত হননি তার প্রমাণ ডেভিডকেও ক্লডিয়াসের মত একটি নাট্যান্তর্গত নাটক সহ্য করতে হয়)। কিন্তু এই ঈশ্বর অন্তিমে কুদর্শন কীট বিশেষ যে কারিনকে ধ্বংস করবে। বরাভয় প্রদানের বদলে ঈশ্বর বিষনিশ্বাস ছড়ান; জন্ম নেয়—The idea of the Christian God as something destructive and fantastically dangerous, something filled with risk for the human being and bringing in him dark destructive forces instead of the

opposite. শেষে কারিন কালো চশমা পরে অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান পৃথিবী, যে পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে তাকে প্রত্যাখ্যান করে। সেভেনথ সীলের মৃত্যুর মত ঘায়ে হেলিকপ্টারের লোকজন করাঘাত করে। কারিন তার জীবন জিজ্ঞাসার অনির্দিষ্ট উত্তরণ পায় ; মেশিন ও পার্থিবতা চূড়ান্তভাবে প্রতিস্থাপিত করে ঈশ্বরকে।

ঔপন্যাসিক ডেভিডের শিল্প প্রেম ছিল জীবনবিচ্ছিন্ন। তার স্বার্থপরতাই, কারিন ও মিনুস, সন্তানদ্বয়ের সর্বনাশ ও যন্ত্রণার উৎস। অনুতাপের কান্নায় ক্যামেরা তাঁকে পেছন থেকে যদিও ধরে রাখে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর প্রতীকে এবং যদিও প্রেমের উদ্গমে ছবির শেষে যোগাযোগের একটি সাঁকো অন্তত সে নির্মাণ করতে পারে তবু—প্রেমই জীবন যোগাযোগ ও ভগবান : এই উদ্গত ধারণাটিই চুরমার হয়ে গেল পরের ছবি উইণ্টার লাইটে।

আগের ছবিটি যদি দৃষ্টির হিমনীল অবয়ব হয়, হিমরশ্মি তবে ধ্যানের সংহতি, এই ছবিতে আধুনিক প্রবন্ধধর্মীতার জয় সুনিশ্চিত হয়েছে। অন্যান্য ছবিতে যা রশ্মির মতো নিঃসৃত তাকে আমরা ধ্রুবনক্ষত্রের মতো স্থির জ্বলতে দেখি এই সৃষ্টিকর্মে ; যে জিজ্ঞাসা আমাদের অন্তর্ভূত এক বীজ, যাকে অনবরত লালন করে ফলিয়ে তুলেছি, তা-ই সুপক্ক হয়ে বিদীর্ণ হয়ে বেরিয়ে এলো যাজক টমাস এরিক-সনের দহনজ্বালায়। এই সিনেমার জোনাস পারসন—পুনরাবির্ভূত কিরিলভ-চিরকালের মত আমাদের শান্তিহরণ করে নিয়ে যায়। এই যে আকুল অশ্রু যুগে যুগে করে পরিশ্রম, তার সাক্ষী হতে গিয়ে বার্গমান ওয়াশিংটন পোস্টকে জানান —I made this film because I wanted to and I made it with no concessions to the public. I know it's a difficult film, but I think I have achieved that much of truth concerning the spiritual crises I've been striving for years to describe. অকারণ নয় যে এই চলচ্চিত্রের সময় সংস্থাপন মাত্র চারঘণ্টা ব্যাপী যা যিশুর যন্ত্রণা-ভোগের জন্যেও নির্ধারিত ছিল। খ্রীষ্টের প্রতীকটিও এখানে ত্রিধা বিভক্ত —যাজক টমাস তার মানসিক যন্ত্রণায়, গীর্জার কুঁজযুক্ত কর্মীটি তার দৈহিক বেদনায় ও স্কুল-শিক্ষিকা মার্তা কাঁটার মুকুটটি বরণ করে নিয়েছে কপাল ও করতলধৃত একজিমায়। তবে টমাসই আমাদের প্রধান বিবেচ্য। সে এই চলচ্চিত্রত্রয়ীর মূল সমস্যা যোগাযোগ সমস্যার কেন্দ্রীয় প্রতিফলন। একদিকে সে স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে সম্বন্ধহীন অন্যদিকে প্রণয়িণী মার্তার সঙ্গেও তার সংযোগ

হৃদয়হীন আনুষ্ঠানিকতার।

নাইটের সংশয়, ভগলারের ছদ্মবেশ ও অধ্যাপক বর্গের জীবন্মৃত্যুর সমন্বয়ে গঠিত এই চরিত্রটিকে আমরা নিষ্প্রাণ প্রথাপালনে রত দেখি ছবির প্রারম্ভে। সমবেত পাঁচ পুণ্যার্থীর নিয়মরক্ষার বিরুদ্ধে শুধু একটি শিশুর অবাধ্যতাই জীবনের সুর টেনে আনে। টমাসের শারীরিক রুগ্নতা তার মুখেও শ্রান্তির ছাপ ফেলেছে। তার শীতল মন্ত্রোচ্চারণ কোনমতেই অমার্জিত নয় তবু যেন এক ফাঁকা হাহাকার। গীর্জাকক্ষেই সে বুঝতে পেরেছে বিশ্বাস তাকে পরিত্যাগ করেছে। আতঙ্কিত জোনাসকে বেঁচে থাকার যৌক্তিকতা বিষয়ে গতানুগতিক উপদেশ দিলে যখন সে প্রতি আক্রমণ হানে (আমরা কেন বেঁচে থাকব ?) দেখতে পাই টমাস শূন্যে নিক্ষিপ্ত হল। বোমাতঙ্ক তথা জীবনের অর্থহীনতা বিষয়ে পারসনের উপলব্ধি টমাসের হৃদয়ে শাখা বিস্তার করে। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে গৃহে পৌঁছে দিয়ে জোনাস চার্চে ফিরে এলে যা শোনে তা সান্ত্বনার বদলে রোদনের ইতিবৃত্ত ও নাস্তিকতা : স্পেনে তার হতাশা, স্ত্রীর মৃত্যু there is no creator, no sustainer. এই বিবরণ বরং টমাসের অবচেতনায় অঙ্কুরিত আত্মনাশের এক প্ররোচনা। জোনাস আত্মহত্যা করে। যা কিছু দূরত্বের তাই আতঙ্কের—বার্গমান বলেছেন। স্রোতধ্বনির অনুষঙ্গে কি অসাধারণ সেই লংশট সমূহ। গীর্জায় প্রত্যাবর্তনের সময় ট্রেনের দ্রুত অপস্রিয়মান কামরা বহন করে আনে কফিনের অনুষঙ্গ। প্রেমিকার সঙ্গে তার সম্পর্ক জীর্ণ গ্রন্থি ; মার্তার দ্বারাও সে সনাক্ত হয় Your faith seemed obscure and neurotic and I cannot understand your indifference to Jesus Christ. জীবন ও ধর্মের অপব্যাখ্যায় রত পুরোহিত এবার দর্পণের মুখোমুখি হতে বাধ্য হয় : if only we dared show tenderness. সব বন্দর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—গীর্জাদৃশ্যে ধর্মের ; ক্লাসরুম দৃশ্যে প্রচলিত শিক্ষার ; এমন কি অন্তিম পর্যায়ে কর্মচারী আলগট বিজ্ঞানের প্রতিও ছুঁড়ে দেয় করুণ বিদ্রূপ—Electricity spoils our service. গেৎসিমানিতে শিষ্য পরিত্যক্ত একাকী যিশু দৈহিক দুঃখবোধের চাইতে বিশ্বাসহীনতার যে ভয়াবহ অভিশাপে আকুল হয়েছিলেন তাই মর্মরিত হয় টমাসের কণ্ঠে—Oh, God, Why hast Thou forsaken me ? নির্জন সন্ধ্যায় একমাত্র অতিথি মার্তার উপস্থিতিতে কোনভাবে আবারও সম্পন্ন হয় অন্ত্যেষ্টিপ্রতিম আরতি। শাস্ত্রনীতির মৃত্যু থেকে টমাস অন্তত সমমর্মী অনুভূতির জীবনে পুনরুত্থিত হয়। বাইরের হিমরশ্মি সেই অন্তশ্চক্ষু উন্মীলনের প্রতীক। উত্তরকাল প্রমাণ করবে এই

জাগরণ এই স্বাধীনতা শূন্য, শাদা, অনীশ্বর।

যদিও উইণ্টার লাইটে ক্লাশরুম দৃশ্যে অন্ধকারের অপ্রতিহত সাম্রাজ্যে জীবনের একমাত্র প্রতীক সেই বাচ্চাটি টমাসের প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছিল যে সে মহাকাশচারী হবে অর্থাৎ যুগপৎ ভবিষ্যৎ ও ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং যদিও বহুবার স্বয়ং বার্গমান আমাদের জানিয়েছেন ঈশ্বরের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত মহাযুদ্ধের সমাপ্তিতে হিমরশ্মির পর থেকে যাবতীয় ইনহিবিশন উত্তীর্ণ তিনি স্ব-গৃহকে পরিচ্ছন্ন করেছেন তবু এই পর্বান্তর আমাদের কোন স্বস্তি; কোন নিরাপত্তা; কোন আলোকমালায় পৌঁছে দেয় না। উক্ত বালক "পিতার" অভিভাবকত্বহীন জোহানে চরিত্রান্তরিত হলেও সাইলেন্সে এমন পার্থিব নরক চিত্রিত হয়েছে যার সংশোধক হিসেবে—বোদলেয়ার বিষয়ে এলিয়টের আলোচনা মনে রেখেও—আমরা ভিটা নুওভা বা ডিভাইন কমেডির নামও অলীক মনে করতে বাধ্য।

ঈশ্বর এখানে স্তব্ধ; বাসস্থান অপরিচিত পান্থশালা; ভাষা অবোধ্য; পথে ট্যাঙ্কের ধাবমান অমঙ্গল। জোনাস জানতে চেয়েছিল বেঁচে থাকা কেন। ক্ষিপ্ত আন্না সহোদরাকে আক্রমণ করে—বাবার মৃত্যুর পরেও তুমি এখনও বেঁচে আছ কেন? এই পিতার রূপকটিকে যেহেতু ইতিমধ্যে আমরা বিশ্লিষ্ট করেছি সুতরাং আমরাও এস্টারকে একই প্রশ্ন করব। প্রশ্ন করব কেননা এই জগতে মৃত্যুশয্যায় শয়ান এই নারী একমাত্র চিন্তাশীল; স্ব-মেহনে অন্তর্মুখী; পিতার বিরহে বেছে নেয় নিঃসঙ্গ আত্মানুশীলনের পথ। সে পথ অমসৃণ অনুর্বরতার, শাস্তির আর ব্যাধিতাড়িত কিন্তু কি সুন্দর! কি শুদ্ধতা! সেই দৃশ্য পর্যায়টির যেখানে ভাষার অতীত এক সংগীত—জোহান সেবাস্তিয়ান বাখ—এসে মেলবন্ধন ঘটায় বৃদ্ধ পরিচারক আর রুগ্না নারীটির। আর কোন পথ নেই?

আছে। সেই পথ পশুত্বে অবনমিত ও যাত্রী আন্না। সমস্ত মানবিক সংযোগ ভেঙে পড়লে হৃদযন্ত্র সচল রাখার জৈব প্রয়োজনে সে আশ্রয় নেয় বিকৃত কামের। জান্তব রতিক্রিয়ার দ্বারা নিগৃহীত হতে হতে একদা অমৃতের সন্তান সে নিখিল বেদনার ভার বহন করে বলে ওঠে—How nice we don't understand each other. বার্গমানের বিবেক এমনই নির্দয় যে স্তব্ধতার মধ্যেও তিনি আত্মবিস্মৃত হন না; এই উক্তি আশিরপদনখ সভ্যতার ধিক্কার ও লজ্জার প্রতিধ্বনি হয়ে ওঠে। এস্টার ও আন্না—দেহ ও আত্মা—দুই-ই আজ অসুস্থ ও নির্যাতিত।

বাকি থাকল জোহান—একবিন্দু শুভ্রতা। নিয়ত অনুসন্ধিৎসু এই বালক ইতিহাসের অবশিষ্ট এবং অপ্রতিরোধ্য মনীষা। মৃত্যুর প্রতিনিধি পরিচারকটির কাছ থেকে উপহার পাওয়া ছবিটি যখন সে কার্পেটের তলায় লুকিয়ে ফেলে তখন বোঝা যায় জীবন মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চাইছে। প্রথম দর্শনে জোহান অভিব্যক্তিহীন; পরিবেশ ও স্বজন তার কাছে দুর্বোধ্য। হোটেলে জননী পরিচর্যাবিমুখ, মাসি রোগগ্রস্তা, কুচকাওয়াজ করে চলে যায় প্রতিবন্ধী শিল্প তথা মানবতার প্রতিনিধি খর্বকায় বামনের দল, ওয়েটারটির রহস্যময় সসেজ ভক্ষণ, রুবেন্স-কৃত একটি তৈলচিত্র তাতে ফেনোচ্ছল ভোগস্পৃহা—কামনা ও হতাশার অন্তর্জগত আর বাইরে ধাবমান সমরাস্ত্রের শোভা, অপেক্ষমান ট্যাঙ্ক, ছ্যাকড়া গাড়ি—ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণাতীত ভয়াবহ শোণিতগন্ধী উৎসব। তার নীরব পর্যবেক্ষণ ও অবলোকন আমাদের সাহায্য করে পশ্চিমী শবযাত্রার দলিল পাঠে। ছবির শেষে আবারও নিরুদ্দেশ যাত্রা। জোহান কতিপয় বিদেশী শব্দের অর্থ উদ্ধারে লিপ্ত, আন্নার বৃষ্টিস্নাত মুখাবয়ব—আমাদের সন্দেহ থাকে না এই পরিভ্রমণ মহত্তম মনুষ্যত্বের অভিজ্ঞান। আত্ম-প্রতিকৃতি সততই ভয়ঙ্কর; দর্পণের মুখোমুখি উলঙ্গ হতে কেই বা চায়? যে চায় সে শিল্পী, প্রকৃত দ্রষ্টা। ক্ষীণস্বাস্থ্য বুর্জোয়াদল ও তাদের প্রতিক্রিয়াশীল নন্দনতত্ত্ব যে এবম্বিধ পুণ্যকর্মকেও একদা sick মনে করেছিল তা, অতএব, অসঙ্গত নয়।

অনুবীক্ষণে বার্গমান এই পরীক্ষাকার্যের একটি প্রস্থচ্ছেদ দেখতে চেয়েছিলেন। তাই বিচ্ছিন্নতার যুগপৎ সংহত ও প্রসারিত স্থানাঙ্ক পুনর্বার নির্ণীত হল পার্সোনায়

এই সিনেমায় মুখোশ হিসেবে প্রযুক্ত হয়েছে মৌনতা। ভাষা আর ভাব প্রকাশ করে না; শব্দ অর্থচ্যুত। অভিনেত্রী এলিজাবেথ ভগলারের নির্বাক ভূমিকার অনুরূপ কিছু অভিজ্ঞতাই বোধহয় আত্মবিযুক্তির সর্বগ্রাসী রূপটিকে একটি শোভন মলাট দিতে শ্রীযুক্ত জর্জ স্টাইনারকে অনুরোধ করে—

Are we passing out of a historical era of verbal primacy, out of the classic period of literate expression into a phase of decayed language, of "post linguistic" forms and perhaps of partial silence?

অবশ্য পার্সোনাকে দি ফেস-এর একটি মার্জিত সংস্করণ হিসাবেও বর্ণনা করা যায়। দুটি ছবিরই কেন্দ্রীয় চরিত্র শিল্পী; দুজনেই ভগলার, দুজনেই আপাত মূক এবং দুজনের আবরণই শেষ বিচারে পলকা। সেভেনথ সীলের প্লেগ,

উইণ্টার লাইটের বোমা, সাইলেন্সের ট্যাঙ্ক এখানে ভিয়েতনাম তথ্যচিত্র এবং ওয়ারশ ঘেটোর ছবি হিসেবে স্থান পায়। পার্সোনা প্রকৃত প্রস্তাবে এক ভয়ের স্বীকৃতি—প্রতিবেশের থেকে, আবিষ্কৃত হওয়ার থেকে, মৃত্যুর থেকে। এবার এই ছবির পশ্চাদভূমিতে সক্রিয় বার্গমানের প্রাসাঙ্গিক বক্তব্য উদ্ধার করা যাক—film as an art form is approaching a discovery of its essential self. It should communicate psychic states, not merely project pictures of external actions. এই আত্মিক অবস্থান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই তিনি ছবিটির সর্বপ্রসাধনমুক্ত নাম দিতে চেয়েছিলেন সিনেমাটোগ্রাফি। পরে প্রযোজকের স্বার্থে নামকরণ করেন পার্সোনা গ্রীক ভাষায় যার অর্থ মুখোশ। পার্সোনা ধারণাটির জন্য, আমার পাঠকের জানা জরুরী, জার্মান মনস্তাত্বিক কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং ঋণী করেন বার্গমানকে। ইয়ুং-এর মতে পার্সোনা মানুষের সেই বহির্জাগতিক মুখোশ যা বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত এবং আলমা সেই অন্তর্জাগতিক বর্ম যা অনুভূতিনিয়ন্ত্রিত। বলাবাহুল্য সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির নিজস্ব বোঝাপড়ার ভিত্তিতে পার্সোনার আকার স্থিরীকৃত হয়। যদি আর্থ-সামাজিক পরিবেশের চাপে পার্সোনা মাত্রা অতিক্রম করে তবে আলমার সঙ্গে তার স্থিতিসাম্য বিনষ্ট হয়ে ব্যক্তির সংকট অনিবার্য হয়ে ওঠে। যে সমাজ কাঠামোয় হিংসা ও যৌনতা ভিন্ন যোগাযোগের অন্যসব সরণি রুদ্ধ, বার্গমান তা-ই বিশ্বাস করেন, সেখানে শ্রীমতী এলিজাবেথ ভগলার উক্ত সংকটের শিকার। আলমা—পরিসেবিকার এই নাম নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বার্গমান উত্তমর্ণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও অপ্রকাশ্য রাখেন নি।

লক্ষ্যণীয় ইলেকট্রার অভিনয়কালীন এলিজাবেথ স্তব্ধতার অন্যতর ছদ্মবেশ বেছে নেন। এই স্তব্ধতা আত্মরক্ষার জন্য এক গোপন আয়োজন যার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন হাসপাতালের মনোসমীক্ষক : your hiding place isn't tight enough. Life tickles in from outside. And you are forced to react No one asks whether it's true or false, whether you are genuine or just a sham. Such are important only in the theatre.

সুতরাং জরুরী হয়ে ওঠে বাস্তবতার অন্যস্তর : দ্বীপান্তর। তার সঙ্গী হয় আলমা নাম্নী নার্স, শ্রীময়ী ও বাগদত্তার আবরণে। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি এলিজাবেথ সন্তানের ছবি ছিঁড়ে ফেলে এজন্য নয় যে সন্তানের প্রতি তার ঘৃণা

সঞ্চিত রয়েছে কিন্তু এ কারণে যে যোগাযোগ সম্ভব নয় জেনে সে বাস্তবতার সঙ্গে সম্বন্ধরহিতা হবে। কিন্তু দৈনন্দিন ঘটনাবলী যেহেতু এখন দুঃস্বপ্নের চাইতেও অলীক, ভীতিপ্রদ, জটিল এবং যেহেতু স্বপ্নে যেমন নিরুপায় তেমনভাবেই আমরা তাতে অভিজ্ঞ হই বার্গমান এবার এই দ্বীপপ্রবাসে স্বপ্ন ও বাস্তবের প্রচলিত তত্ত্বটিকেই আক্রমণ করলেন। সত্তায় ও অভিনয়ে চরিত্রদ্বয় এখানে স্মৃতি ও বর্তমানের মধ্যে বিভক্ত, বিনিময়যোগ্য; ঘূর্ণায়মান, সংহত, চূর্ণীকৃত ও অবিভাজিত। পারম্পর্যহীন চিন্তা স্বপ্নের স্তরে অনূদিত হওয়ার পরেও ছিন্ন হয়ে যায় ফিল্মরীল (স্বাধীনতা থেকে ত্রাণ কর আমাদের—ম্যাস্কুলাঁ। ফেমিনায় এলিজাবেথের আরোপিত স্বর শ্রবণে যদি পাঠকের মনে হয় তা বার্গমানের প্যারালাইজিং ফ্রিডম তত্ত্বের অনুসারী তবে স্মরণ করিয়ে দেব উক্ত চলচ্ছবিতে সাইলেন্সের প্যারডিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মাধ্যম পরীক্ষার সূত্রে গোদার ও বার্গমান সাম্প্রতিক য়োরোপীয় শিল্পের দুই বিপরীতমুখী পিতামাতা এই প্রথম বরং কাছাকাছি এলেন)। এলিজাবেথের বিষণ্ণ মৌনতা ও আলমার সানন্দ মুখরতা—এই দুটি মুখোশই সমকেন্দ্রাভিমুখী হতে হতে অবশেষে ধ্বংস হয়। ছবির সূচনা ও সমাপ্তিতে এলিজাবেথের সন্তান এক অব্যাহত সংশয় ও জিজ্ঞাসার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই চিত্রেও বার্গমান সমাধানের কোন প্রলেপ প্রয়োগ করেননি তবু টিভির পর্দায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আত্মাহুতির দৃশ্য দেখতে দেখতে অভিনয়বিস্মৃত এলিজাবেথ মুখে হাত চাপা দিয়ে উত্থিত গোঙানি থামালে আমরা পুনর্বার সকৃতজ্ঞচিত্তে উপলব্ধি করি মানবিকতার স্বপক্ষে বার্গমানের অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাস ও দুঃখসাধনা কতো প্রাজ্ঞ, কতো সার্থক।

সাত বছর বাদে (Cries and Whispers-এও আমরা বাস্তবতা আচ্ছন্ন স্বপ্নের স্তরটিকে পুনরায় আনুভূমিক বিস্তৃতির মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। ঘটনাকাল শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ—সে সময় ধর্ম নেহাৎ আভিধানিক শব্দে পর্যবসিত হয়নি। চরিত্রেরা সবাই গৃহান্তর্গত অন্তত বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রে দৃষ্ট হয়নি। অর্থাৎ বার্গমান তাঁর এই প্রথম দিকের রঙিন ছবিতেও অন্তর্জগতকেই বর্ণনা করতে চান—এই ছবিতে বারংবার ব্যবহৃত রক্তবর্ণ ফেড-ইন শুধুমাত্র ভগ্নীত্রয়ীর সম্পর্কের ইঙ্গিত নয়, বার্গমান কল্পিত আত্মার বর্ণ। এই ছবির মুখ্য চরিত্র নারীচতুষ্টয় দৈহিক পরিসীমায় আবদ্ধ ও যথারীতি একাকীত্বে নির্বাসিত। কর্কট রোগাক্রান্তা অ্যাগনেসের ভবনে অন্য দুই বোন অতিথি; আন্না শুশ্রূষাকারিণী তথা পরিচারিকা। তুলনামূলকভাবে অন্য

সকলের চাইতে অ্যাগনেস আবেগ ও মনস্ক্রিয়ার দ্বারা অধিকৃত থাকায় সে যথারীতি সাইলেন্সের এস্টারের মতই শাস্তিপ্রাপ্তা। তার অসুস্থতা আক্ষরিক অর্থে জরায়ুস্থিত হলেও (অনুর্বরতা ?) দার্শনিক অর্থে কিয়ের্কেগার্দীয় সিকনেস আন্টু ডেথ। এস্টার যেমন বীর্যগন্ধে বমনস্পৃহা জানায়, মেজো বোন কারিন অনুরূপভাবে কামপরাঙ্মুখ। কনিষ্ঠা মারিয়া সাইলেন্সের আন্নার মত কামনা-মদির ও ক্ষুৎকাতর। পরিচারিকা আন্না অন্তত ফলিত স্তরে ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার প্রতিরূপ। নির্বোধ সারল্যের প্রতিনিধি এই মহিলার প্রতি বার্গমান অঞ্জলি অর্পণ করেন পিয়েতা দৃশ্য রচনায়। অ্যাগনেসের প্রয়াণের পর অভিজাতদের দ্বারা নিম্নশ্রেণীভুক্তা তার অবমাননায় বার্গমানকে ক্ষুব্ধ ও বিষাদ গ্রস্ত দেখায়। কখনোও ধর্মের, কখনোও সামাজিক অসাম্যের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত লাঞ্ছনা বার্গমানের অন্যতম স্পর্শকাতর প্রদেশ—I think its terribly important that art exposes humiliation......because humilia tion is one of the most dreadful companions of humanity and our whole social system is based to an enormous extent on humiliation. এই ছবিতে বার্গমানের প্রহারের লক্ষ্যবস্তু দ্বিবিধ। একদিকে অ্যাগনেসের অন্ত্যেষ্টি নির্বাহ করতে এসে পুরোহিতটি—জোনাসকে আশ্বাস প্রদানে অনুরুদ্ধ হিমরশ্মির টমাসের মতই—জীবনের তাৎপর্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে নিজেই প্রার্থনা জানায়—Ask Him for meaning to our lives; অন্যদিকে কারিন নৃশংসভাবে উদঘাটিত করে দেয় যাবতীয় সম্পর্ক এমনকি দেহজ সমীকরণেরও কপটতা—It's nothing but a tissue of lies. অন্তহীন নিষ্ঠুরতায় মজে গিয়ে বার্গমান বিক্ষত যোনিরক্ত লেপন করে দেন তার মুখে, দেহের সবচেয়ে শুদ্ধ অঞ্চলে।

৩.

Of everything other than thought; there can be no history.

R. G. Colling Wood : The idea of history.

তাঁর আরও দুটি ছবি আমার দেখা আছে। মাদাম বোভারি পড়া থাকায় দি টাচ, কীটদষ্ট ম্যাডোনার ছবি ব্যতীত, আমাকে তেমন আকর্ষণ করে না। আর মোৎসার্ট সম্বন্ধে উপযুক্ত মানসিক অনুশীলন না থাকায় ম্যাজিক ফ্লুটের আলোচনাও আমার পক্ষে সমীচীন হবে না। অতএব ইংগমার বার্গমান বিষয়ে

আমার কথকতা আপাতত শেষ হল। মধ্যম পাণ্ডবের একনিষ্ঠতা বর্তমান লেখকের নেই সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সময় ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে একচক্ষু হরিণের মত আমি বার্গমানের মূল বক্তব্যের প্রতি—আঙ্গিকগত অন্যান্য কৃতিত্ব বাদ দিয়ে—অগ্রসর হয়েছি। তুলনামূলক শিল্পতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতসহ সে-সব প্রসঙ্গ ভবিষ্যতে আলোচিত হতে পারে। তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্ম আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি; হয়তো অসম্ভবই থেকে যাবে।—তবু তাঁর সৃষ্টিকর্মের অর্ধাংশ দেখে, আমার মত দীন ব্যক্তির দূর তীর্থদর্শনের, বলা ভালো কুড়ি-শতকীয় ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ পাওয়া গেল। ভ্রষ্টা পৃথিবীর থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একদিন আমাদের এই সভ্যতা সকালের আকাশের মতন বয়স হয়ত পাবে। কিন্তু তার আগে রয়ে গেল এই স্বধর্মনিষ্ঠ রাত্রি। রাত্রির সেই অবরোধ ভেঙে পড়লে যে সমস্ত স্মরণচিহ্নে আমরা শিষ্টাচার সম্মত পুষ্পস্তবক নিবেদন করতে যাব তার একটি ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়ে গেল ইংগমার বার্গমানের নামে।

২. পুনশ্চ : নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

ফ্যানি ও আলেকজাণ্ডার—যেন শাপভ্রষ্ট দেবশিশুদ্বয়—তবু দিগন্তরেখার অনতিদূরবর্তী বৃক্ষে ফুটে ওঠেনি সাত ভাই চম্পা ও পারুল বোন। এখানে অবাক হওয়া মুগ্ধতার আকাশ নেই, নীলিমা ও তরুলতা নেই যেখানে তরুণ মানবসন্তান নিজেকে বিরহহীন ভাবে খুঁজে পায়।

আসলে ফ্যানি ও আলেকজাণ্ডার শৈশবের কোন বিস্ময়-নিষিক্ত অমল উপাখ্যান নয় বরং স্বপ্নের একটি চক্ষুষ্মান মাত্রাযোজনা।

সাগ্রহে অবশ্য আমরা অনুধাবন করি যে ইংগমার বার্গমান তার শেষতম নির্মাণে বালক বয়সের নানা অভিজ্ঞান পুনর্জনের প্রয়াস পেয়েছেন। ছবির শেষে যখন 'ড্রিম প্লে' র মুখবন্ধ থেকে বিখ্যাত উদ্ধৃতিটি শোনা যায় তখন শুধু পূর্বসূরী স্ট্রীণ্ডবার্গের প্রতি নম্র স্তবগান ধ্বনিত হয় না, আমরা বার্গমানের পক্ষে অত্যন্ত নিজস্ব আলোকপ্রাপ্তির সঙ্গেও পরিচিত হই। কৈশোরের নিষ্পাপ উদ্যান থেকে নির্বাসন যন্ত্রণাগাঢ় অন্তর্জগতে—আরেক নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ!

যারা আমার বার্গমান বিষয়ক সমীক্ষাটি লক্ষ্য করছেন তাদের নতুন করে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই যে যাকে বলে আত্মজৈবনিক উপাদান তা সংশ্লিষ্ট ছবির সর্বত্রই

আকীর্ণ আছে। আমাদের মর্মে প্রবেশ করেছে আলেকজাণ্ডারের অন্তর্মুখী একাকীত্ব, ব্যক্তিত্বময়ী মা'র সঙ্গে যাজক পিতার সংঘর্ষ, গৃহে শাস্ত্রানুমোদিত শাস্তিদানের সমারোহ, পুতুলনৃত্যের পরিকল্পনা এবং ম্যাজিকলণ্ঠন প্রক্ষেপন, স্নেহময়ী মাতামহী, সৌরকর ও ধ্বনির চারুত্ব সব কিছুই বার্গমানের স্মৃতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। তবু ফ্যানি ও আলেকজাণ্ডার নিছক জীবনস্মৃতি নয়। ব্যস্তবতান্ধ আচ্ছন্ন স্বপ্নের স্তরটিকে আনুভূমিক বিস্তৃতির মধ্যে বর্ণনার একটি সত্যনিষ্ঠ প্রয়াস।

আযৌবন আমাদের আলোচ্য শিল্পী বিশ্বাস করেছেন যে স্বপ্নের বিশিষ্ট তাৎপর্য কাব্য বা চিত্রকলার চাইতেও চলচ্চিত্রের পক্ষে অধিকতর স্বাভাবিক; অধিকন্তু ষাট দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই তাঁর সৃষ্টিকর্ম অলংকার বর্জন করে অন্তর্গমনে মনোযোগী হয়েছিল। হে পাঠক, আপনার অবগতি ও সাহায্যের জন্য তাঁর অজস্র সাক্ষাৎকারের মধ্যে ১৯৬৪তে প্রদত্ত একটি আমি বেছে নিচ্ছি :

"Film as an art form is approaching a discovery of its essential self It should communicate psychic states, not merely project pictures of external actions"

স্বপ্নদ্রষ্টার ঐশ্বর্য নিয়ে বার্গমান প্রথম প্রার্থিত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন পার্সোনায়। আপাতত ফ্যানি ও আলেকজাণ্ডার সেই রাজত্বের সীমানা। যা কিছু পরিদৃশ্যমান ও একমাত্রিক বাস্তব তার অতিরিক্ত সত্য আবিষ্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট চলচ্ছবিতেও দেখা যাবে বাস্তবতার একটি আপাতগ্রাহ্য ভিত্তির উপর কল্পনা ঘূর্ণিত হয় ও বুনে যায় নতুন নতুন নকশা। স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, বিশৃঙ্খলা ও কিমিতি এখানে মিশ্রিত। চরিত্রসমূহ এখানে বিভাজিত ও বহুগুণান্বিত : অবলুপ্ত ও ঘনীভূত ; বিক্ষেপিত ও কেন্দ্রীভূত। আর সবার থেকে আলাদা হয়ে আছে ইসমায়েল স্বপ্নদ্রষ্টার নির্জ্ঞান চৈতন্যের শুদ্ধতা ও ইচ্ছাপূরণ। আলেকজাণ্ডারকে সেজন্যই কোন বিচ্ছিন্ন চরিত্র ভাবলে ভ্রম হবে। সে প্রায়শই সম্প্রসারিত, প্রকৃত প্রস্তাবে পরাযৌক্তিক সাধারণীকরণ।

একথা হয়ত সত্য যে ফ্যানি ও তার ভাই বার্গমানের রাজমুকুটের জন্য তেমন উজ্জ্বল কোন রত্নসঞ্চয় করতে পারেনি তথাপি পুনর্বার প্রমাণিত সামান্য শিল্প রচনার প্রথাসর্বস্বতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে চলচ্চিত্র জগতে বার্গমান সেই নিঃসঙ্গ পুরুষ যার চূড়ান্ত অন্বিষ্ট সত্যের অন্তরতম অবস্থান।

অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন

ক. খুকু গদ্যের বিপক্ষে—

আমাদের গদ্য নাকি বড় কঠিন। আমাদের গদ্য নাকি পড়া যায় না। আমাদের নাকি আরও সহজ হওয়া দরকার।

ভাদ্র ও আশ্বিন দুই মাস শরৎকাল। স্বভাবতই গ্রামে গঞ্জে, শহরে বন্দরে, অফিসে দপ্তরে লেখালেখির ধুম পড়ে গেছে। ধানের ক্ষেতে পর্যন্ত রঙিন সাইনবোর্ড নজরে আসে: নিরোধ ব্যবহার করুন ও শারদীয়া পড়ুন—দুইই সস্তা। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। বুর্জোয়ার কাছে সবই পণ্য—জননীর অশ্রু, সমুদ্রতীরস্থ তন্বী, তরুণের ক্রোধ; এমন যে নিশীথের স্তব্ধতা—স্তব্ধতার গান তাও। বুর্জোয়া সাহিত্যের জীবনদর্শন গণ উৎপাদন। অতএব যা কিছু তাকে খবরের কাগজ বানাও দ্রুতপাঠ্য। লেখা আলস্যের সঞ্চয়; লেখা প্রমোদ-উপকরণ; লেখা লোক-রঞ্জন চিন্তাহীন। লিখতে যে চায় সে এই ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসে সায় দেবে?

আমি মনে করি লেখক মূলত তাঁর সমাজ যে ভাষা ব্যবহার করছে, তাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নেবে। এখানেই তার অন্যতম মূল সোস্যাল কমিটমেণ্ট। ভাষা, কোন অক্ষর পদার্থ নয়। বাংলা ভাষার উনচল্লিশটি অক্ষর মরুবক্ষে প্রোথিত মর্মর শিলার মত। যে কোন বালির ঝড় তাকে ঢেকে দিতে পারে। মিল-মালিকরা জানে সে কথা। তাই তারা বলছে—সহজভাবে কলম চালাও যাতে সবাই বোঝে। অর্থাৎ বাজারী মেয়ে মানুষের মত সস্তা হয়ে যাও। তারা চাইবেই মানুষের প্রকাশ ক্ষমতা বিপন্ন হোক, সে ক্ষেত্রে শ্রেণী বিন্যাসও অব্যাহত থাকবে।

অথচ আমাদের শব্দ প্রেম চায়। সে সময়ের রাগমোচন। শব্দের প্রতি আমরা সাধ্যমত রেখে দিচ্ছি ধর্ষকাম। শব্দের সঙ্গে, অবসাদ সত্ত্বেও, আমরণ রতিক্রিয়া চালিয়ে যেতে আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত। আমরা, যারা জানি শিল্প পণ্যে পরিণত হতে পারে না, শিল্পী একজন যে টাকায় ক্রেয় নয়, সুতরাং চাইব কিভাবে পাঠককে দেখিয়ে দিতে পারি অনাবিষ্কৃত স্বপ্নসমূহ ও ভবিষ্যৎ বর্ণমালা। প্রাণপণে ভাবি শিল্প জনসাধারণের আয়ত্তাধীন হোক। কিন্তু বুর্জোয়ারা ঘুমপাড়ানি গান গায়। আমাদের উদ্দেশ্য পাঠকের জাগরণ। সহজ, আমরাও

হতে চাই। তথাপি দিন ও রাত্রির মতো, ইতিহাসের মতো, মানুষের একাকী শুদ্ধতা যাতে আছে।

আমাদের রচনা পাঠক বুঝছে না। নিরক্ষর চাষাও বুঝছে না যে এমন কি সুকান্তর কবিতাতেও জ্যোৎস্না রাতে তার নরম উৎসব। জুটমিলের শ্রমিকও বুঝছে না অন্তর্বর্তী নির্বাচনের চাইতে বিপ্লব অনেক সহজ। সে অশিক্ষিত বুঝবে কি করে বিড়লার মন্দিরে যাওয়ার থেকে মার্কসের ক্যাপিটালে যাওয়া অনেক সহজ। তবু কেউ কি হাল ছেড়ে দিয়েছি? রাজনৈতিক সংগ্রাম চলছে এবং এখনও অনেকেই বিশ্বাস করে যে চাষাও একদিন প্রিয়ার বদলে বন্দুককে চুমু খেতে পারবে। তাহলে? তাহলে আমরা খুকু গল্পের সাহায্য নেব কেন? ভুলে যাব কেন দীর্ঘদিনের শ্রম ও রক্তপাতের ফলে জাত ভাষা যে স্তরে রয়েছে, তা থেকে পিছিয়ে দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার হয়ে গেলে জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে আর শিল্পবিপ্লব ছুরিকাহত হবে, আর সাফল্যে উল্লসিত বুর্জোয়ারা হেসে উঠবে হো হো।

যা কিছু বিনাশ্রমে অর্জিত……তাই অসুন্দর—ব্রেশট এ রকমই ভাবতেন। ভাবনাটা ভুল নয়।

খ. বিষয়: আজকের কবিতা

এখনকার কবিতা নিয়ে আমাকে লিখতে অনুরোধ করেছেন। বিষয়টা আমার দিক থেকে বেশ অস্বস্তিকর। এজন্য নয় যে আমি কবিতার পাঠক নই বরং উল্টোটাই সত্যি। এমন কি আমার বন্ধুদের বেশ বড় একটা অংশ কবিতা লেখে ও তাদের সূত্রে কবিতার প্রতি আমার ভালোবাসা বেড়েই চলেছে।

প্রশ্নটা এখানেই যে জীবনানন্দের মৃত্যুর তেইশ বছর পর বাংলা কবিতার আশির পদনখ মিডিয়ক্রিটিতে ছেয়ে আছে। যা ভালো তার স্বপক্ষে কথা বলা যায়, যা খারাপ তাব বিপক্ষে কথা বলা যায়। বলা যায় অবশ্যই আমার দেখা অনুযায়ী। কিন্তু যা ভালোও নয়, খারাপও নয়, তা নিয়ে কথা বলা সবচেয়ে কষ্টকর। আমি বলতে চাই কবিতা, বাংলাদেশে, সুখে নেই।

আপনাকে খুব কষ্ট করতে হবে না। পরিশ্রমসাধ্য ডকুমেণ্টেশন ছাড়াও আপনি যদি মোটামুটিভাবে পরিচিত কবিদের পাতা ওল্টান, যেমন ফ্রান্স থেকে পেস, ইংরেজী থেকে এলিয়ট, রাশিয়া থেকে মায়াকোভস্কি, স্পেন থেকে লোরকা ও

এদেশের জীবনানন্দ—আমি ক্লোদেল, আপলিনেয়ার, নেরুদা এবং অন্য বিদেশী ও বাঙালী কবিদের ছেড়েই দিলাম, তবেই দেখবেন সত্তরের দশকে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যার জন্য আমরা গর্ব করার সুযোগ পাব। একটি বিপ্লবী যখন তাঁর সোনারূপো ভালোবাসতে শুরু করে তখন গর্ব না করাই ভালো।

ঠিক তাই হয়েছে। কবিতা এখন কবিতা ছেড়ে বেতার, দূরদর্শন ও রেকর্ডে চলে গেছে। বড় কাগজ আদর করে ছাপছে কবিতা। কবিতা লেখা যে সামাজিক ভাবে গর্হিত অপরাধ নয় এটা মেয়েরাও মেনে নিয়েছে। কবিতা লেখার জন্য কারুর চাকরী যাবে না। খ্যাতি ও প্রচার ভালোই। তবে জনসাধারণ্যে যা প্রদর্শিত হয় তা কবিতা নয়। মধ্যবিত্ততার বিরতিহীন কুচকাওয়াজ।

আসলে কবি যেহেতু এগিয়ে থাকা মানুষ তাকে আলাদা ভাবে বাঁচতে হয়; অন্য জীবনযাপন করতে হয়। এই সমাজ ও সভ্যতা তার হাতে দেগে দিয়েছে অস্বীকারের উক্তি। এবং যা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে তিনি সব কিছুই মেনে নিচ্ছেন। জন্মের জন্য সঙ্গম দরকার হয়। কবিতার জন্য অস্বীকার। যা দরকাব তা ক্রোধ, ঘৃণা ও উদ্বেগ। যা দেখতে পাই তা অভিমান ও ক্ষোভ। আর তাব সঙ্গে যে দিবসের লহ প্রণাম তো আছেই।

একটু খতিয়ে দেখলেই দেখা যাবে একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত যে কারণে ক্ষেপে যায়, ঠিক সে কারণেই কবিও ক্ষেপে যায়। কবি যদি সবার হয়ে রাগ করেন, তা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমাদের কবি নিজের জন্যই কিছু গোছাতে চান। যথা নাম, টাকা রোজগার ও টুকটুকে বউ কিংবা সুবাতাস যুক্ত ফ্ল্যাট। এসব বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ তিরিশের পর ঠাণ্ডা হয়ে আসে। মন একটা স্থিতাবস্থায় চলে আসে। এর পরেও কবি কবি হতে চান, অর্থাৎ মধ্যবিত্ততার সুবিধা ও বিপ্লবের সম্মান পেতে চান, আশ্চর্য! তাই কখনোও হয় নাকি।

আরও সব সমস্যা আছে। যেমন আমাদের কবি সর্বক্ষণের জন্য কবি। সকালে ও দুপুরে। শীতে ও গ্রীষ্মে। পুজোয় ও পঁচিশে বৈশাখে। অর্থাৎ সে কোন সময়ই কবি নয়। তার জীবন মানে সকালে লেখা কি রাত্রিতে, মধ্যে কফিহাউস ও পত্রিকা দপ্তর। এমনকি চাকরীর সময়েও সে যথেষ্ট অমনোযোগ সহ কবিতা যুক্ত। তার বন্ধুরা কবি। তার মদ্যপানের সঙ্গী কবি। তার বেশ্যালয় গমনের সঙ্গী কবি। সে কবিতার বই পড়ে। এবং কবিতা ছাড়া আর কিছুই জানে না। কোন কবিকে ইস্টবেঙ্গল মাঠে দেখেছেন? অর্থাৎ সে কবিতা ছাড়া আর সব কিছুই জানে। আমাদের কবি প্রেমিকার ঠোঁটে ঠোঁট রেখেও কবিতা খোঁজেন

যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে জীবন তাকে পরিত্যাগ করেছে।
সম্প্রতি যা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে তা হল এই অসহায় মানুষটি প্রতিরোধ পাচ্ছে না। তার জীবনে অপমান নেই। কেননা কবিতার, শুনতে পাচ্ছি, কমোডিটি ভ্যালুও গ্রো করছে। আর ব্যর্থতা? মেয়ে-পটানো ছাড়া আর ডিকসনারী সন্ধান ছাড়া অন্য কোথাও আছে বলে তো মনে হয় না। আমাদের কবি এত কম চায়!
এক্ষুনি সার্ত্রের কয়েকটা কথা আমার মনে এলো: Poetry is a case of the loser winning, and the genuine poet chooses to loose, even if he has to go so far as to die, in order to win…………
He is certain of the total defeat of the human enterprise and arranges to fail in his own life in order to bear witness, by his individual defeat, to human defeat in general.
এখানে কবি খুব শান্তিপূর্ণভাবে নিজের ও অন্যের সঙ্গে সমঝোতায় চলে আসছেন। পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দেওয়ার মত রিস্ক নিতে তিনি রাজী নন। অন্যদিকে জীবনানন্দের কথা ভেবে দেখুন। সেই ১৯২১ সালে ইংরেজীতে এম. এ হওয়ার পরেও ভদ্রলোক চাকরী ঠিক রাখতে পারলেন না আমৃত্যু। এই-ই হয়।
আমি কিন্তু বলতে চাইছি না কবিরা বেকার থাকুন। নানাভাবেই ভাঙচুর করা যায়। তবে, আপাতত মনে হয় কোন বড সামাজিক সঙ্কটে কবিদের প্যাড ও লেখার টেবিল না পুড়ে গেলে কবিতা লেখা বোধহয় হয়ে উঠবে না বাংলাদেশে। আরও কথা বলতে গেলে প্রবন্ধ হয়ে যাবে। চিঠি লেখার সূত্রে প্রবন্ধ না গুঁজে দেওয়াই উচিত।

গ. বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী বর্ষ

১.

হৃদয় নামের বস্তুটি বুকের বাঁ দিকে থাকে বলেই মানুষের ধারণা। উপরন্তু মানুষ যূথবদ্ধ জীব। তবু আত্মার বামফ্রণ্ট গড়ে ওঠেনি আজো। ভাগ্যক্রমে একা করবার মত কিছু কিছু কাজ মানুষের কররেখায় নির্দিষ্ট হয়ে আছে। যেমন কবিতা লেখা। পৃথিবীর প্রজাতন্ত্রসমূহে প্লেটো ও কবি অনেকদিন

সহবাস করেছে। প্রশ্নটা সুতরাং এই নয় যে কবিতা লেখা হবে কিনা বরং এই যে লেখা হবে কিন্তু কিভাবে।

কবিতা বানানোর জন্য আস্ত জমি মানুষের মগজে প্রায় নেই। একদিন ছিল। চাঁদ ছিল। নবীন চাঁদের মত স্তন ছিল। স্মৃতিচিহ্নের পাশে মাধবীলতা দুলে উঠত। বিস্ময় তখনোও সভ্যতাকে ছেড়ে যায় নি। রবীন্দ্রনাথের মত কবি ছিল। তাঁরা যুগপৎ নারী ও ঈশ্বর ভোগ করতেন। অক্ষয় বড়াল ও বিহারীলালের মত আলাভোলা লোক ছিল। লোকে বলত—কবি। আজকে নেই।

পঁচিশে বৈশাখ। ওই একদিনেই কবিতা রূপসীদের মুখে আইসক্রীমের মত মিলিয়ে যায়। পড়ে থাকে যে মাসঃ কাব্যহীন ও লোডশেডিংযুক্ত। আরও থাকে কলকাতা শহরঃ টিন ও এ্যালুমিনিয়াম, ঝুঁকে থাকা হাফ-গেরস্ত মেয়েমানুষ, বিবাদীবাগ থেকে ফিরে আসা মাথার অরণ্য। নির্বাচনী মামলা ও অ্যানফ্রেঞ্চের প্রকৌশল। ঠিকাদার। লিপস্টিক-বিনোদন সংখ্যা।—অনুমোদিত অ্যানার্কি। ক্রিকেট ও কার্ডিগান। খালাসি টোলা-চৌরঙ্গী লেন। সূর্য ওঠে।

শিশু জানে তার মায়ের বুকেই নিটোল, নিবিড়, নরম, সাদা। কবি যদি জানত। কবির সঙ্গে কবিতার যোগাযোগ কত অনিশ্চিত হয়ে গেছে!

পৃথিবী ছুটছে জাপানী ট্রেনের মত। খবরের কাগজের কার্বনে তার দাগ পড়ে না। বি-মূভির অরণ্যদেব ডায়াল করে। ডাউনিং স্ট্রিটের ডায়না কোমলকণ্ঠে উত্তর দেয়। আবও সব লোক আছে যাদের হাতে পারি কমিউনের পতাকা মাসিকের ন্যাকড়ার মতো দেখায়।

কোন শোক নেই যে কবি মন্থর বিলাপ করবে। কোন আহ্লাদ নেই যে কবি দীর্ঘ উল্লাস করবে। ট্র্যাজেডি নেই। কমেডি নেই। কেননা বিস্ময় নেই। বেঁচে থাকা শেষ পর্যন্ত সংখ্যাবদ্ধ কমিক। এখন কবি কি করবে? সে, যদি বা উত্তরপুরুষ, নিজে যাদুকর নয়। জীবনানন্দের মৃত্যুর তিরিশ বছরও পেরোয় নি, সে পাতকুঁয়োয় পড়ে গেছে। তাকে টেনে তুলবে কে? সম্পাদক? নিসর্গ? গড়িয়াহাটের চকিতা হরিণী না তার বগলের ভাঁজ?

সাপ্তাহিক পত্রিকার কোল আলো করে শুয়ে থাকে ফুটফুটে প্রথম প্রেমের গল্প। কবির লেখা। দেশী আন্টিদের কাছে বিদেশী আদবকায়দা শিখে ফিরে আসে কবির ছেলে। রাষ্ট্রপতি ভবনের একটুখানি ঘোষণা জানিয়ে দেয় কলম

তরবারির তুলনায় ভোঁতা। কবি রয়েছে, তার মহিমা নেই।
আকাশকুসুম তবু ফুটেছে পাপড়ি অনুসারে। অতএব লেখা হচ্ছে। নানা রকম লেখা : মর্ষকাম-আত্মনিগ্রহ-ইনভার্টিব্রেটের অভিমান; দেবদাসের যোনি-প্রার্থনা ও তদ্বিষয়ক কিছু আলুলায়িত পয়ারের সমারোহ, চৈত্রের চরাচর, নকশালপন্থার মেঘদূত।
কবি কবিতার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে; পরপুরুষ।

২.

কিভাবে লেখা হবে কবিতা? অনেকভাবেই হতে পারে। কেননা বাগ্মিতার শিরোচ্ছেদ করো—আওয়াজটি খুব পুরোন হয়ে গেছে। মরচে ধরেছে তাতে মায়াকোভসকির পর। আমরা মানেবইতে লেখা উপদেশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েও বক্তব্য রাখতে পারি। প্রকাশ্য দিবালোকে আমরা শব্দকে ধর্ষণ করতে পারি। কি লেখা হবে তাহলে? যতদূর মনে পড়ে বোদলেয়ারই বলেছিলেন—শৌচাগারের দেওয়ালে লটকে আছে মানুষের আত্মা। র‍্যাবো আরেকটু সহজ গলায় বললেন—সৌন্দর্য স্বয়ং উপবিষ্টা আমার জানুতে। আর তাকে নিয়ে আমি ক্লান্ত। আধুনিকতার সকল মন্ত্রের মধ্যে এই-ই গায়ত্রী। এখনো পর্যন্ত নেতি-বাচনই কবিতার মুখ্য উদ্দিষ্ট। না বলবার স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার চূড়ান্ত প্রয়োগে রাগের সাদা ফেনা ছাড়া কিছুই থাকে না। উদাহরণ জাঁ জেনে। বলা ভালো, শিল্পের ইতিহাসে কুড়ি শতকের অন্যতম প্রধান অবদান—ডমিন্যাণ্ট থিম হিসেবে ক্রোধের সংযোজন।
জীবনানন্দ দাশের রাজত্বের পরে উপরোক্ত তথ্যসমূহ বাহুল্য মনে হতে পারে। বস্তুত তা নয় আজকের বাংলা কবিতার অনুশোচনীয় পরিপ্রেক্ষিতে। আসলে আমাদের কবিতার সংকটের কারণ এই যে তা এখনোও, আশ্চর্য, বিষয় নির্বাচন করে কিন্তু বক্তব্য নির্ধারণ করে না। বক্তব্য বলতে আমি কি বোঝাতে চাইছি? অবশ্যই সত্যমেব জয়তে কিংবা কাউবয়ের বিরহ নয়। জবাব দিতে গিয়ে আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেব।
পোড়ো জমি—এলিয়ট। বিষয় নেই; যা আছে তা গুরুভার বক্তব্য এমনকি উদ্ধৃতি ও রেফারেন্সকণ্টকিত ও সটীক। কিন্তু সব থেকে বলার কথা ইংরেজী পাংশুতা কেটে গিয়ে ফুটে উঠেছে কবিতার দুর্দান্ত আদিম মত্ততা। নিউইয়র্কে এক কবি—লোরকা। লোল নিগ্রো কোন বিষয় নয়; বক্তব্য একটিই—অস্বীকৃতি।

পাৎলুনপরা মেঘ-মায়াকোভসকি। মারিয়ার কাছে চোট পাওয়া যদি বিষয় হত তবে ন্যাকা লিরিক পাওয়া যেত ; সমগ্র রচনাটি একটি প্রণিধানযোগ্য প্রবন্ধ। সৃষ্টির তীরে—জীবনানন্দ। বিষয় পুনর্বার অনুপস্থিত। যা আছে তা বক্তব্যের পরাযৌক্তিক মাত্রাযোজনা।

এই বক্তব্য প্রেম এতদূর প্রসারিত হয়েছে যে আজকে আর কোন স্মরণীয় কবি—কলমচী নয়—প্রচারিত নন্দনতত্ত্বের ভিত্তিতে লেখে না বরং যুগপৎ কবি ও সমালোচকের সচেতনতায় সেই কাব্যরীতির প্রতি প্রশ্ন ও কৌতুকসহ লেখে। মালার্মে এজন্যই তাঁর যুগকে লা পয়েজি ক্রিতিক আখ্যা দিয়েছিলেন। আর আমি আগেই বলেছি বোদলেয়ারের পর কাব্য প্রণয়নের পেছনে সক্রিয় মূল দ্বন্দ্ব বিশেষ পাল্টায় নি। ইতিবাচক কবিতা অদ্যাবধি মহান হয়ে ওঠে নি। অন্তত আমার চোখে পড়ে নি। অর্থাৎ কুড়ি শতকীয় আধুনিকতায় বিষয়ের কোন গুরুত্ব নেই। অন্যদিকে বক্তব্যধর্মিতা মৌল প্রতিজ্ঞা। তার সঙ্গে অন্তত তিনটি অনুসিদ্ধান্ত আমরা পাচ্ছি : ক. বিকৃতি খ বিমূর্ততা গ. সম্প্রসারণেচ্ছা।
ক মার্কসের ডায়লেকটিকস ও আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি সাহিত্যে বাস্তবতা প্রসঙ্গে চালু ধারণাটিকে নস্যাৎ করে দেয়। লক্ষ্য করে দেখা যাবে ন্যাচারালিস্টিক অবরোহণের বদলে শুদ্ধ বাস্তবতায় আরোহণ আধুনিক প্রতিটি শিল্পরূপেরই অন্বিষ্ট হয়ে উঠছে। লেনিন এমপিরিও ক্রিটিসিজমে দ্বিতীয় স্তরের বাস্তবতার কথা তুলেছেন। এইভাবে আমরা তৃতীয়······চতুর্থ·· n স্তরের বাস্তবতা খুঁজে নিতে পারি। লোরকার, জীবনানন্দের কিম্বা অন্য অন্য আধুনিক কবির বিকৃতি আসলে বাস্তবতার উচ্চতর পর্যায়ে অভিযান।

খ ফলাফলের দিক থেকে আধুনিকতা সাকার নয়। এই প্রসঙ্গে শিল্প ও দর্শনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তার ভাঙচুর নজরে আসে। শিল্প ও দর্শনের মূল প্রভেদ কি? শিল্প বিশিষ্ট; দর্শন সামান্য। শিল্প মূর্ত; দর্শন বিমূর্ত। প্রথম চিহ্নটি অক্ষত থেকে গেলেও দ্বিতীয় লক্ষণটির অবস্থান বদল হয়েছে। এখন শিল্প চাইছে বিমূর্ততা, দর্শন বরং তুলনায় বিজ্ঞানের সান্নিধ্য পেয়ে অনেক কংক্রীট।

গ. বোধহয় চলচ্চিত্রই অনুঘটকের কাজ করেছিল, আজকের কবিতা সীমাতিক্রমণ করেছে। এতদিন পর্যন্ত শিল্পের কিছু বিভাগ ছিল। উপন্যাস-নাটক-কবিতা। সঙ্গীত-চিত্রকলা। বা আরও অনেক কিছু। আপলিনেয়ার প্রথম সাড়া দেন চিত্রকলার আবেদনে। কপালদোষে শুধু প্রকরণগত দিক থেকে। আধুনিক কবিতার

মিশ্ররীতি বরং অনেক বেশি ব্যক্ত হয়েছে জীবনানন্দের 'রাত্রি'র মত কবিতায় যা খানিকটা ছন্দোবদ্ধ প্রবন্ধ, খানিকটা সুসম্পাদিত চলচ্চিত্রকর্ম।

৩.

অলমতিবিস্তারেন। আমরা জানি কলেজ স্ট্রীটে কফিঘরে নামবার আগে বাংলার কবিতার পরীটি বেলভেডিয়ারে জাতীয় গ্রন্থাগার ছুঁয়েই আসতে পারে। তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। গত পনেরো বছর ধরে আধুনিকতা শব্দটির বিস্তর অপব্যাখ্যা হয়েছে। এখন কবিতা চাই। যাকে সবচেয়ে বেশি বলতে হবে, সে কিছুই বলছে না। এখন বিনীত অনুমোদন প্রার্থীর বদলে একজন ভার্টিক্যাল ইনভেডার চাই। আমাদের টেবিলে একমাত্র জীবিত ধর্মপুস্তক—সাতটি তারার তিমির। হে প্রতিবন্ধী অর্কিউস, অপ্রতিরোধ্য অন্ত্যমিলের বদলে আপনার বাঁশি প্রসব করুক আত্মার পক্ষে উপকারী পথ্য ও পানীয়। ওই বইটির নিঃসঙ্গতা কেটে যাক।

ঘ. ওগো ললিতা

দিবসের শশীলেখার মতন কশিতা ছিলে একদিন চৈত্রপবনে। তারপর স্তনযুগ-ভারে ঈষৎনতা তুমি, ওগো ললিতা, কঁকিয়ে উঠলে। জীবনানন্দ দেখে ফেললেন তোমার রাং, অপরূপ চিতলের পেটি। এ রকম বিভ্রাটে কুশীলবদের ধৈর্য টুটবে না, বিন্যস্ত ভ্রূ-তরঙ্গ তোমার ক্ষণচঞ্চল হবে, মৃদু মধুর চিত্তবনে কুলুকুলু স্বরে বয়ে যাবে কবিতা।

সৌন্দর্য হবে স্নায়বিক পীড়া অথবা কিছুই নয় এবং পরপুরুষের সঙ্গে শুলো যার বাঁজা বৌ, ঠকাবে কে তাকে--মোটামুটি ভাবে, এ-কথাটাই আমি বলতে চেয়েছিলাম। একজন রুষ্ট আকাট আমাকে ফলে প্রশ্ন করেন—আপনি বক্তব্য-পরায়ণ হতে বলেন তার মানে আপনি কবিতাকে খতম হতে বলেন ?

ললিতা ওগো, ধূলিদলিতা, তুমি শুনতে পাচ্ছ ?—

মধুমালতি ডাকে আয়।

আমি বরং গোড়া থেকেই শুরু করি। একটা আপেল একদিন আধুনিকতার আকার নিয়ে বসেছিল জনৈক চিত্রকরের সামনে। ভদ্রলোক যতবার আপেলের

ছবি আঁকতে যান ততবার আপেলটা নড়ে ওঠে। শিল্পী ভেবে ভেবে আকুল। ফলটা তার রগড় না থামালে ছবি বুঝি আর আঁকা হয় না। এমন সময়ে পিকাসো সেখানে এলেন। দেখলেন সব। বুঝলেন। খেয়ে ফেললেন আপেলটাকে। ক্যানভাসে ফুটে উঠল আপেল। অভিবাদন জানাল সে পিকাসোকে।

অর্থাৎ আধুনিকতা, শেষ পর্যন্ত, কবির কাছে হজমের বস্তু, দেখানোর নয়। জরুরী একটি উপলক্ষ শুধু।

ওই আপেলটি টুক করে নিউটনের মাথায় খসে পড়লে মহাকর্ষ নামে কবিতার জন্ম হয়। আর্কিমিদিসের মাথায় পড়লে হত না। সেখানে উপলক্ষ অন্য। তাঁকে ভাসায় জল।

রবীন্দ্রসদনের সোপানে আসীন হে অমল বাঙালী, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কথা পরে বলা যাবে, সহর্ষে লক্ষ্য করুন আমরা বন্দনা করি যুক্তির ল্যাংটো ভেনাস কিন্তু পরিহার করি কুযুক্তির রেশম জর্জর ভেনাস।

যে কোন কিছুই ঘটতে পারে। আপনার পার্শ্ববর্তিনীর দহনক্লিষ্টা ও মুখমণ্ডলকে শ্রীমুখমণ্ডল মনে করে পুড়ে খাক হল ট্রয়। একটি বিবাহিতা মহিলার রুমালপাত শিল্পের রাগমোচন সম্ভব করে। মাংসে পোকা পড়লে যুদ্ধজাহাজ পটেমকিনে শুরু হয় শীত-প্রাসাদ দখলের মহড়া। সুতরাং বিষয় গৌণ ; আমরা বক্তব্য চাই। যেমন ইলিয়াড, যেমন ওথেলো, যেমন অক্টোবর বিপ্লব।

তাহলে কি আমরা আমাদের বইগুলোর উৎসর্গপত্রে লিখে দেব ঈশ্বর গুপ্ত ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় শ্রীচরণকমলচতুষ্টয়েষু ? আমরা কি ইচ্ছা করি দেশপ্রেম-ঈশ্বর প্রীতি-সুবুদ্ধির উদ্বোধন।

না, হেসে বলার, তা নয়। সূর্য একটি গ্রহ। সে আলো দেয়। অন্তত রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত দিয়েছে। অথচ বোদলেয়ারের সময় সে জানালার অন্তরালবর্তী গোপন কামকে প্রতিহত করতে পারল না। কত কবি কত ভাবে ভণিতা করেছে যুবতীর আদরণীয় ডালিম দুটিকে নিয়ে। বোদলেয়ারের প্রহারে তারা, ওই উগ্রচূড়াদ্বয়, পুঁজে রক্তে শহীদ হল।

যারা প্রাচীন তাদের ছিল অবজেকটিভ আঁখি। আমাদের আধুনিকদের আছে সাবজেকটিভ চক্ষু। আমরা চাই "মি" যা বৈষয়িক চরাচরে "আই" যা বিষয়ী চিন্তায় অনুমিত হোক। আমাদের বিবৃতি কর্তৃকারকের স্বপক্ষে।

আগেকার ধারণা, এক আমি বহুর মধ্যে বিযুক্ত হবো। উদাহরণ-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

ব্যাসকৃত মহাভারত। প্রক্রিয়াটি মূলত বিশ্লেষণধর্মী ও ডিফারেনসিয়াল। এখনকার ধারণা, বহু আমি একের মধ্যে সংযুক্ত হবো। উদাহরণ—পোড়ো জমি, টমাস স্টার্নস এলিয়ট লিখিত। প্রক্রিয়াটি মূলত সংশ্লেষণধর্মী ও ইনটিগ্রাল।

কিসমিস-বাদাম আনা হয়েছিল বিধাতার মৃত্যুর পরেই। তাই আবার আমাদের সময়ের কবিতার চরিত্র বস্তুত দ্বান্দ্বিক ও আপেক্ষিক। সে যুগপৎ আর্য ও ইয়াঙ্কি। সে একই সময়ে বিরোধী ধাতুসমূহের একত্র সমাবেশ ঘটাতে পারে। কেননা সে দিনরাত্রি, আলো-অন্ধকার, পাপ-পুণ্যের বিভাজনকে কৃত্রিম মনে করে। আমরা ভাবতে পারি জীবনানন্দের বিভিন্ন কোরাস (সাতটি তারার তিমির)। অন্যদিকে ধ্রুপদী কবিতা প্রধানত অধিবিদ্যার দ্বারস্থ। তার যাবতীয় পরিক্রমার একটি পরম কেন্দ্র রয়েছে—ঈশ্বর। সে যদিবা প্রশ্নশীল তবু বিশ্বাসী। সে তো জানে একদিন সকল কাঁটা ধন্য করে ফুল ফুটবেই। আরোহণ-অবরোহণ সম্বন্ধে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ বাটখারা তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের হে মোর সুন্দর (বলাকা) কবিতাটি একটি সম্যক দৃষ্টান্ত হতে পারে।

যারা বলেন কবিতা শব্দের সুচারু আলপনা, তারা ভুল বলেন। তাঁর 'পুঁজি' বইতে কার্ল মার্কস উৎকৃষ্টতম মৌমাছির চাইতে নিকৃষ্টতম স্থপতিকে বেশি দাম দেবেন বলে ভেবে রেখেছেন। কেন? না মানুষ তার কল্পনা-মনীষাকে প্রবৃত্তির অধিক গুরুত্ব দেয়। স্বতঃস্ফূর্ততার বন্যা রোধ করবার জন্য বুদ্ধির একটি বাঁধ রচে। সেই দিক থেকে বিদ্রোহী মৌমাছির চাকের চাইতে সরেশ, বিহারীলাল বাবুই পাখির চাইতে কবি, কিন্তু কতখানি কবি এঁরা, এই বিহারীলাল, নজরুল,—প্রমুখ তা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখবার জিনিস।

দুই-ই বিপ্লব, সশস্ত্র পন্থায় প্রচলিত শ্রেণী শাসনের উচ্ছেদ, তবু ফরাসী বিপ্লবের তুলনায় রুশ বিপ্লব একজন আধুনিক মানুষের কাছে কি জন্যে আরও স্মরণীয়? এ জিজ্ঞাসার সদর্থক জবাবের একাধিক মেরু আছে। আমাদের কাছে প্রসঙ্গের প্রয়োজনে যা তাৎপর্যের তা হল রুশ বিপ্লব জনসাধারণকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তির হাত থেকে উন্নীত করতে চেয়েছিল চেতনায়। অভ্যুত্থান একটি শিল্প। উক্ত পরি-প্রেক্ষিতে বলশেভিক দলের আছে নিয়ামকের ভূমিকা যা জ্যাকোবিন সঙ্ঘের ছিল না। রবসপীয়ার যেখানে স্বভাব কবি, লেনিন সেখানে স্বাভাবিক কবি। যে কারণে জীবনানন্দকে আমরা প্রধান পুরুষ মনে করি তা হল যে তিনি সেই কবি যিনি আমাদের কবিতাতে প্রথম প্রকৃতভাবে সেরিব্রাল এলিমেণ্ট আরোপ করেন।

যদি মেনে নেওয়া যায় আগুন ও কমপিউটার মানুষেরই বুদ্ধিবৃত্তির সন্তান তবে দেখব—রবীন্দ্রবিরোধিতা কোন পয়েন্ট নয় বা ট্যাকটিক্যাল উপজীব্য মাত্র, তা করার জন্য অনেকেই ছিল—বাংলা ভাষায় জীবনানন্দের পর কবিতার একটি গুণবাচক উত্তরণ ঘটেছে। এখন কবিতা কবির কাছ থেকে যা দাবি করে তা মেধাজীবীতা।

রাজনৈতিক ভাবে দেখলে পরাবাস্তবতাকে আমরা সাধারণ ধর্মঘটের সঙ্গেই তুলনা করতে পারি। প্রতিটি আন্দোলনেরই যা মুদ্রাদোষ, পবচুলাসমারোহ, যথাকালে সে পৌছে গিয়েছে সংসদীয় ভোজসভায়। অথচ একুশ শতক শুরু হতে আর আঠেরো বছর। বিশ্বাসের এমন হেতু আছে যে আমরা কোন নতুন বিপ্লবের রণনীতি রপ্ত করে নিতে পারব ইতিমধ্যে।

প্রিয় ললিতকলাবিধি, কবিকে জড়িয়ে যেন অস্পৃশ্য কবিতা ঋতুস্নানে, সৎসঙ্গে সর্বনাশ নেই এই বিশ্বাস থেকে যে কলাদর্শ নরসুন্দরের কাঁচি, নিজ হাতে তুলে নিতে কে চায়? ললিতা, অয়ি প্রিয়তমে, প্রকৃত চণ্ডাল এসে একদিন পোড়াবে তোমাকে।

সত্তর দশক ও চারজন কবি

And without a labour which is largely a labour of the intelligence, we are unable to attain that stage of vision *amor intellectualis Dei*. The Perfect Critic : T. S. Eliot.

বাংলা খুব বেশিসংখ্যক লোকের মাতৃভাষা নয়। সেদিক থেকে দেখলে বাঙালী কাব্যসমালোচকের অস্থবিধের দিকটি সহজেই অনুমেয়। শিক্ষিত বাঙালীমাত্রই কবি এরকম মন্তব্য যদি বা অতিশয়োক্তি হয় তবু সাধারণত তার একজন করে কবিকাকিমা ও দু'জন করে কবিমামা থেকে থাকে এরকম বলা যেতে পারে। যেহেতু সমালোচকও শেষপর্যন্ত সামাজিক জীব, তার পক্ষে নিরাবেগ সিদ্ধান্ত নেওয়া সে কারণেই দুরূহ হয়ে পড়ে। অর্থহীন বাক্যের রোমাঞ্চ তাঁকে তখন নিরাপত্তা দেয় কিন্তু স্বধর্মে প্রতিষ্ঠা না হোক নিহত হওয়ার সুযোগও দেয় না। দ্বিতীয় সমস্যাটি অবশ্য তাত্ত্বিক। আজ আর সমালোচকের মুগ্ধ হওয়ার অবসর তত নেই। একটা সময় ছিল যখন ফ্রান্স-প্রবাসী মধুসূদন দত্ত বোদলেয়ারের আঁচ না পেয়ে করুণ চতুর্দশপদীতে মগ্ন হতে পারতেন অথবা রবীন্দ্রনাথ আকুল হয়ে কামনা করতেন প্রায় শতবর্ষ পূর্বের হ্রদকবিদের সান্নিধ্য। ছায়া সুনিবিড় সে যুগ, হায়, নেই। প্রতীচ্যের শ্রেণীভিত্তিক সমাজবিবর্তনের সঙ্গে প্রাচ্যের গ্রামনির্ভর বর্ণাশ্রমিক প্রথার তুলনামূলক আলোচনা বা এদেশে শিল্প-সভ্যতার অসমবিকাশ এসব প্রসঙ্গ সমাজতাত্ত্বিকদের, আমি শুধু বলতে চাই সাতটি তারার তিমির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জীবনানন্দ একটি অমোঘ হ্যাঁচকাটানে আমাদের গুণ্ঠনাবৃত কাব্যলক্ষ্মীকে দাঁড় করিয়ে দিলেন জনাকীর্ণ আন্তর্জাতিক আঙনায়। ফলে আজ সমকালীন আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত ও অবস্থানের উল্লেখ সমালোচকের অবশ্যকৃত্য। ইতিমধ্যে আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মুখাপেক্ষী না থেকে, যা আরও বলার, অন্তত বাংলা কবিতারও জলবায়ু এমন একটি পুঁজিবাদী শাহরিক বাতাবরণ পেয়েছে যে কবির জন্য আর কোন পাঠক সেই অর্থে জনসাধারণ নেই। যা আছে তা ওক্তাভিও পাজের ভাষায় সংগঠিত জনপুঞ্জ। এরা দূরদর্শনের ধারাবাহিকতা, ক্যাসেট ও চিত্রিত উইকলির জন্য অপেক্ষা করে থাকে ; আবৃত্তিও শোনে। কিন্তু কবিতা পড়ে না। অতএব যে কবি জনসংযোগ চান তার জন্য পড়ে থাকে

সাংবাদিকতা। এ সেই অবস্থা যখন কবিকে মনে হয় হাই-ব্রাও; কবিতাকে হায়ারোগ্লিফিক্সবৎ; মেধাকে অবাঞ্ছিত। এবং এই পরিস্থিতিতে কবি যখন জনরুচিকে অস্বীকার করতে শুরু করেন তা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে না। কড-ওয়েলের অনুসরণে স্বদেশের খোঁড়া-বিলম্বিত-স্বভাবত মন্থর ক্যাপিটালিজম বরং আমাদের এই নেতিবাচনের উজ্জ্বল ও প্রগতিশীল সম্ভাবনার প্রতিই প্ররোচিত করে। সুতরাং সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে সমাজ তার আভিজাত্য হারিয়ে ফেলেছে, সেখানে অসন্তোষ উৎপাদনই কবির আভিজাত্য বোদলেয়ার যাকে বলতেন aristocratic pleasure of displeasing. ভূমিকা অসমাপ্ত রেখে এবার বলা যাক আমি আপাতত সত্তর দশকের কবিতার বিষয়েই আমার চিন্তা সীমাবদ্ধ রাখব।

চারিদিকে ভূগর্ভের ঘনজ্যামিতি সাংবাদিকের ঋতুকষ্ট কমপিউটারকূজন প্যাথোলজি শ্রুতিনাটক চুক্তিবাজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পরিসংখ্যানের স্থাপত্য পদযাত্রা গজলের লাজনম্র স্তনভার মাগগিভাতা পঞ্চাশের পোপ দয়ালু কোটাল সংসদীয় দাম্পত্য স্বাধীন রক্ষিতা অন্ধভিড় অলীক প্রয়াণ—আমাদের পক্ষে বলা কি সমীচীন হবে যে ইতিমধ্যেই বাংলাভাষায় কবিতার একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়ে গিয়েছে? আবার যখন নতুন কবিতা বলি তখন দেখি নতুন শব্দটি ব্যবহৃত হতে হতে কত ময়লা হয়ে গেছে। চণ্ডীদাস নতুন কবিতা লিখেছেন। সমর সেনও। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও এই একই শিরোপা পেয়েছেন বহুদিন হল। এঁদের মধ্যে সময় ও কাব্যধর্মের প্রভেদও রয়েছে। সুতরাং আজকের নতুনত্ব অন্যরকম পরীক্ষার দাবি রাখে। বস্তুত নতুন বলতে আমি পরিমাণগত রূপান্তরের বদলে গুণগত রূপান্তরের প্রতি ইঙ্গিত করতে চাই। আনুভূমিক বিস্তারের বদলে আমাদের এবার উল্লম্ব প্রসারণের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। অর্থাৎ ইতিহাসকে তথ্যের বদলে নীতির ভিত্তিতে সাজাতে হবে।

সত্তরের কবি এই অর্থে সাবালক যে সে আততায়ী বা পূজারী কোনটাই নয়। তার কোন বিগ্রহ নেই। তিরিশে ছিল—রবীন্দ্রনাথ। চল্লিশে—বিষ্ণু দে। পঞ্চাশে—জীবনানন্দ; ষাটেও। কিন্তু সত্তরে কে হবেন? রবীন্দ্রনাথ মৃত। জীবনানন্দ অধ্যাপকসঙ্কুল; সুভাষ তাঁর দলের মতোই ক্ষীণস্বাস্থ্য। অপরদিকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বন্ধুদল এমন কোন মনসা নন যে সত্তর দশককে চাঁদ সদাগর সাজতে হবে। এই ঘটনাকে আমি বলব ঐতিহাসিক প্রিভিলেজ যে, যেহেতু দেবতাহীন, কালাপাহাড় সাজবার বিরক্তিকর প্রহসন থেকে সত্তরের

কবি অব্যাহতি পেয়েছেন। আর্থ-সামাজিক পরিবেশ চেতনাকে প্রভাবিত করে এবং কবিরা, যেহেতু সাম্প্রতিককালে কাব্যচর্চা বড়লোক বা গরীবের পক্ষে বিলাসিতা, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। একটু আগে আমি যখন বোদলেয়ারের উল্লেখ করছিলাম তখন মনে হচ্ছিল ১৮৪৮ সালে ফরাসী ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পতন বা জার প্রথম নিকোলাসের সময় ১৮২৫ সালে রুশ ডিসেম্বরপন্থীদের বিপর্যয়ের সঙ্গে পশ্চিমবাংলায় '৬৭-'৭২ সালে মূলত সি. পি. আই (এম) ও নকশালপন্থীদের প্রচেষ্টায় আগ্নেয় চেতনার উন্মেষ ও পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় দমনের তুলনা করা যেতে পারে। মন্বন্তর ও দেশবিভাগের পর আমাদের মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ এত বড় প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার সুযোগ পায়নি। সামাজিক আঘাতের এই অনুঘটকটির উপস্থিতিসত্ত্বেও বোদলেয়ার বা পুশকিনের প্রতিক্রিয়া ঐতিহাসিকভাবেই আর সম্ভব ছিল না। যখন সর্বস্ব যায় বস্তুকামে গৃধ্নু তায় নানাবিধ কাজে তখনও তোওফিল গোতিয়ে, জনৈক রোমান্টিকের পক্ষে বলা সহজ যে তার নাগরিক অধিকারের চেয়ে অধিক আদরণীয় প্রকৃত রাফায়েল কিংবা কোনও সুন্দরী বিবসনা। কলাকৈবল্য-বাদ, বাস্তবিক, ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনাজাত এক ধরনের মূর্ত অভিমান। একটি স্বপ্নপরিব্রাজনা। অথবা নিউ স্টেটসম্যানে সার্ত্র-বিশ্লেষণে নিযুক্ত ডেভিট কোটের মতন অন্যরকমভাবেও বলা যেতে পারে—Art for art's sake, then, is depicted as a diversionary manoeuvre patronised by a bourgeoisie who preferred to hear themselves denounced as philistines rather than as exploiters.

কিন্তু বুর্জোয়াদের ভূমিকা যখন সুপরিজ্ঞাত, যখন কতিপয় চিহ্ন ও কিছু সংখ্যা প্রতিস্থাপিত করেছে দ্রব্যের মহিমা, যখন স্বপ্নও মুদ্রারাক্ষসের ব্যভিচারজনিত ভ্রমমাত্র তখন কাব্যের মুক্তি কোন পথে? অন্তর্মুখীনতা অত্যন্ত সেকেলে শব্দ; আমরা বুঝতে পারছি কাব্যও বাস্তবতার উচ্চতর পর্যায়ের দিকে অভিযান শুরু করেছে। এতদিন পর্যন্ত কবির মূল অন্বিষ্ট ছিল পরিমাণগত হেরফের সত্ত্বেও স্বপ্নকে চিন্তার জগতে অনুবাদ করে দেওয়া। সত্তর দশক—একুশ শতকের সূচনা—এখন থেকে কবিতার লক্ষ্য হয়ে উঠেছে চিন্তাকে স্বপ্নের স্তরে উত্তীর্ণ করে দেওয়া। আমরা প্রত্যক্ষ করছি এই সেই মালার্মেকথিত লা পয়েজি ক্রিতিক যখন কাব্য নিজেই নিজের বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে নিজেকে পরীক্ষণীয় ভাবছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সত্তর দশক আমাদের প্রথম বাধ্য করছে মানবসভ্যতায় কবিতার আদৌ কোন সম্ভাবনা আছে কিনা—এরকম মৌল তদন্তে নিযুক্ত হতে।

আমার কথা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসার কোন কারণ নেই যে আমাদের আলোচ্য কালপর্বে দলবদ্ধভাবেই ভালো কবিতা লেখা হয়েছে। দশক-সংকীর্তন বা সংঘ-শক্তির জয়গান আমার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমি জানি সত্তর দশকে যে পরিমাণ সুকাব্যের জন্ম হয়েছে তা পূর্ববর্তী দশকসমূহের তুলনায় কিছু কম নয় এবং বাজে লেখার সংখ্যাও তুলনারহিত। আমি দশক-ভিত্তিক আলোচনায় প্রবৃত্ত নই; যাকে বলে প্রচলিত অর্থে উত্তীর্ণ—এমন সব রচনাবিচারও আমার অভিপ্রেত নয়। আমি শুধু চারজন প্রতিনিধিস্থানীয় কবির—তুষার চৌধুরী, অনন্য রায়, রণজিৎ দাশ এবং জয় গোস্বামী—শিল্পসিদ্ধি নিয়ে আপাতত ভাবিত যারা ঘটনাক্রমে সত্তর দশকের চরিত্র হিসেবে সুচিহ্নিত। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১৯১২ সালে লেখা আপোলিনেয়ারের একটি চিঠি: Don't you think that to make it possible for a new conception of art to assert itself, mediocre works must appear along with the sublime?

এমনকি এই চারজনের লেখার মধ্যে সাধারণ উৎপাদকের সন্ধানও খুব জরুরী নয়। রণজিৎ চূড়ান্তভাবে একটি সফল কবিতাই লিখে উঠতে চান এবং অনন্য প্রথম থেকেই সচেষ্ট থাকেন কবিতার যে কোন রকম সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দিতে। তুষারের মগ্নমৈনাক কোনক্রমেই জয়ের অধিবিদ্যার সঙ্গে সমীকরণ রচে না। তবু এদের কথা বলা যেতে পারে কেননা এই কবিচতুষ্টয় এই সময়পটভূমির পৌরহিত্যে ইতিমধ্যেই আমাদের ভাষাকে অন্যরকম অলঙ্কার দান করেছেন।

তুষার চৌধুরী

Genius is not a gift but the way-out that one invents in desperate cases. : Saint Genet : Jean Paul Sartre

স্বভাবতই কবিতার ইজ্জৎ কেড়ে নেওয়ার স্বয়ংক্রিয় দায়িত্ব তাঁর ওপরে বর্তায়।
আটষট্টি নাগাদ, প্রথম যখন তুষার লিখতে আসে সময়টা তখন কেমন ছিল? প্রতিষ্ঠিতদের কথা তুলছি না। কিন্তু সাধারণভাবে নবাগতদের পক্ষে অনুমান করা সঙ্গত ছিল বিবিধ মর্ষকাম ও যৌনঅভিমানময় এলানো অক্ষরবৃত্তই কবিতার নিয়তি। তুষারই পরিস্থিতিকে রাগী কানাইদের হাত থেকে উদ্ধার করে নৈরাজ্যের সংহতি প্রতিষ্ঠা করে। অত্যন্ত প্রখর সমসাময়িকতাকে মুড়ে দেয় একটি ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বকে। যে কারণে আমার কাছে অদ্যাবধি তুষার সত্তর দশকের প্রথম পুরুষ তা হল সে-ই আমাদের সময়ে পঞ্চাশ ষাট বা আরো আগেকার ছোঁয়াচমুক্ত। কতিপয় হাতমকশো বা অবসরবিনোদন বাদ দিলে সত্য এই যে আজও আমার মনে হয় তাঁর কবিতার কোন কৈশোর বা শৈশব ছিল না; জন্মক্ষণেই সে যুবতী: অযোনিসম্ভবা। চলতি শতকের দ্বিতীয় দশকে এলিয়ট যে মনোভাব নিয়ে ইংরেজি কবিতায় ধ্রুপদী স্বর যোজনা করেন তার সঙ্গে তুলনা টানা সম্ভবত উচিত হবে না; তুষারের শ্রেষ্ঠ কবিতা অনেকাংশে বরং দালির ধ্রুপদী কাঠামোর অনুসারী। তবু পাঠক লক্ষ্য করুন তুষার ছন্দ বর্জন করেনি। পরবর্তী সকল গদ্যগমন সত্ত্বেও বস্তুত সংহত পয়ারের সঙ্গেই তাঁর সহবাস; তৎসম শব্দের প্রতি প্রবল ঝোঁক এবং যা প্রণিধানের বিষয় তাঁর অক্ষরবৃত্ত মাত্রাহ্রাসবৃদ্ধির স্থূলতা নয়, পেলবতামুক্ত ও উল্লম্ফনময়। এটা অবশ্য গৌণ বিষয়। তুষার পয়ারের প্রভু হওয়া না হওয়ার ওপর কিছু প্রমাণিত হয় না। বরং কবিতা—তা সান্ধ্য মেঘমালা নয়, গ্রন্থবীক্ষা নয়, এ নয় যে দেখে শুনে জানা হল বেশ কিছু—জন্মের মত রোদনশীল, মৃত্যুর মতো গম্ভীর ও গ্রীষ্মের চরাচরের থেকে অধিকতর রহস্যময়: একথা ছত্রে ছত্রে মুদ্রিত করে সে কবিতাকে আমাদের পক্ষে শিক্ষণীয় করে তুলেছে।

অথচ তুষারের ছদ্মবেশ প্রায় নিখুঁত। ফুটপাতে প্রত্যক্ষদর্শী ভিখিরির মধ্যে কেউ বলে উঠল 'খাসা' / খোলামকুচির মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অঢেল তামাশা (বাঞ্ছাকল্প-তরুছায়াতলে)। বাস্তবিক তুষারের কবিতা অনুধাবনের পথে অন্যতম প্রধান চোরাফাঁদ হচ্ছে এই 'অঢেল তামাশা' যা প্যান্টলুনময় দুঃখ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে 'শিশুদের জন্য সুসমাচারে' কিংবা তার দুটি স্তন উড়ে ঘুরে ঘুরে সভাগৃহে কুহুধ্বনি করে 'আমাদের নারী'-তে। এই কবি পাঠকের জন্য একটি আবরণ বা আড়াল নির্মাণ করেন। বলা চলে দ্বিতীয় সত্তা-গঠনের পথে তাঁর এই প্রয়াস প্রায় সফল হয়েছে। যখন 'শিশুদের জন্য সুসমাচার'—এই স্মরণীয় কবিতাটির

কোন অংশে প্রথম বন্ধনী থেকে অপ্রাসঙ্গিক একটি নির্দোষ কৌতুক উঁকি মারে—আখরোট ভেঙেছিলে নাকি—তখন অদীক্ষিত লোকজনের কাছে প্রায়ই চালান হয়ে যায় তাঁর ভুল প্রতিকৃতি। এইভাবেই ব্যক্তিগত জীবনে সে কপট মত্ততা বা রগড়মদির অসংলগ্নতার মাধ্যমে আড্ডা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে কবিতা-বিষয়ক মর্মান্তিক প্রতিবেদনসমূহ। কবিতাতেও তাই। আমি দেখেছি তুষারের কনটেণ্টহীনতা বা eros-ধর্ম নিয়ে যখন হাবিজাবি আলোচনা চলে তখন সে কি ধরনের নিরুত্তাপ ও লঘুপক্ষ যুক্তিকে প্রশ্রয় দেয়। অর্থাৎ এলিয়টের কাব্যালোচনা পড়ে থাকার সোচ্চার দাবি না করলেও সে ভালোভাবেই জানে কিভাবে কুকুরকে পচা মাংসের দিকে ঠেলে দিতে হয়। একেই ইয়ুং বলবেন : The consciously artificial or masked personality complex which is adopted by an individual in contrast to his inner character, with intent to serve as a protection, a defence, a deception or an attempt to adapt to the world around him.

এই পরিহাসপ্রীতির মুখোশ তাহলে তুষারের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার অবদান। নিজেকে রিডিকিউল করাই হল সবচেয়ে বড় আধুনিকতা কথাটা বলেছিলেন সম্ভবত জাঁ-লুক গোদার। হ্যাঁ, গোদারই তো। গোইয়া থেকে চ্যাপলিন পর্যন্ত শিল্পের সঞ্চার পথে সামান্য পায়চারি করলেই মনে হয় ওই পঙক্তিটি আধুনিকতার স্বরবর্ণ, এমন কি হামাগুড়ি শুর। সুতরাং অলীক কুকাব্য রঙ্গে—প্রথম বইয়ের শিরোনাম থেকেই যে বোঝা যাচ্ছে তুষার চৌধুরী নিজেকে নিয়ে প্রচুর মস্করায় লিপ্ত হবে তা গুরুত্বপূর্ণ হলেও অতটা চিন্তিত করে না যতটা জরুরী মনে হয় মুদ্রার আপাতভাবে অদৃশ্য অপর পিঠটি। তাহলে কি পাল্টা ঠাট্টা সে ছুঁড়ে দিচ্ছে স্ব-কালের অন্য অন্য সহযোগীদের প্রতিও? আমরা বুঝতে পারছি এই কবির রচনা গভীরতর অনুধ্যান আশা করে। আমাদের নির্বাচনমুখী হতে হবে। হয় বাংলা সাহিত্যের আবালবৃদ্ধবণিতা কাব্য সুধাসাগরে সাঁতার কাটছে ও এই কবিমাত্রই এক সরকারী কর্মচারী নয়তো সমবেত গোপিনী সমাবেশে সে-ই একমাত্র পুরুষ। বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আমাদের আছে; উপরন্তু নিরপেক্ষ সমালোচনায় আমি বিশ্বাসও করি না। আমি নিশ্চিত যে গত দশ বছরের মধ্যে কবিতার পাবলিক গণ্ডদেশে কোন চড় এত সশব্দে বাজে নি।

অপর দিকে বেদনার আমরা সন্তান। তফাৎ শুধু এই আধুনিকতার প্রতি যথার্থ

অভিবাদন জানিয়ে তুষার এই অসম্ভব বেদনাকে একটি যৌগ পরিণতি দেয় অমোঘ আমোদের বিক্রিয়ায়।

চূড়ান্ত টালমাটাল আরেকদিন র‍্যাবো, চক্ষুষ্মান সেই বালক এসে পৌঁছেছিলেন পারিতে। তার অনেকদিন বাদে লোরকা রক্তবমি করে রাখলেন নিউইয়র্কের রাস্তায়। এই পরিপ্রেক্ষিতটুকু মনে রাখলেই বোঝা যাবে নিতান্ত বাঙাল তুষার চৌধুরীর পক্ষে কেন এই শহর হাইকোর্টসঙ্কুল। নিশ্চিতভাবে এই জন্ম তুষারের কাছে ইনট্রুশনপ্রতিম এবং একই সঙ্গে অনুধাবনীয় আক্রান্ত হওয়ার পরেও সে ফেটে পড়েনি। আমার খেয়াল আছে তুষার জিজ্ঞাসা করেছিল—

> সে এক কেউটের ক্রোধ
> লেজে যে পা রেখেছে আমার তার কপালে কি চুমু খাব
> দাঁত বসিয়ে ঢেলে দেব অতিনীল বিষ ?

তবু আমি বলব তাঁর প্রধান উপজীব্য ক্রোধ নয়। তুষার জন্মের আদি ও সেই সূত্রে হয়তো শব্দের আদি কুমারীত্ব আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু অনুরূপ পরিস্থিতিতে যখন সহকর্মী জয় গোস্বামী গর্ভপাতকে বিকল্প উদ্ধার ভাবে কিংবা অনন্য রায় সাদা নির্মেঘ রাগের মধ্যে খুঁজে পায় নৈতিক নির্দেশনামা (উল্লেখ্য নৈশ-বিজ্ঞপ্তিরও প্রথম কবিতায় মাতৃসম্বোধন আছে) তখন তুষারের পক্ষে "যেহেতু প্রথম নারী তুমি" একটি নির্মল অশ্রুমোচন: জল, নীলিমা, পৌষের নরম রোদে একাকী একটি মানুষ অত্যন্ত শান্তভাবে অবলোকন করে গহীন গর্ভগুল্ম, শয়নরতা রাজহংসী, প্রাণী ও ফসলের নিশ্চেতনা। বস্তুত তুষার ঈষৎ ঘুরপথে হাত রাখে অস্বীকারের পেরিনিয়মে। সেরিব্রাল বিছানায় আদুল নমিতাকে দেখে বলতে পারে:

> 'বেআব্রু নগ্নতার চেয়ে বরং অনুধাবন করো জ্যামিতি
> সঙ্গীত ও নৈঃশব্দ্যের যা পারম্পর্য তাকে সন্দেহ করো
> মাতাল হ'লে প্রশ্রয় দাও বমনেচ্ছা ও গূঢ় ভাবনাকে
> মৃত্যুর আগে চিন্তা করো সমাধিগম্বুজের
> অবজ্ঞা করো অবজ্ঞা করো অবজ্ঞা করো'

ক্রোধ কাম মাদক কবিতা এমন কি মৃত্যুও তুষারের কাছে রসিকতার বিষয়। খুব সপ্রতিভ আলাপের ভঙ্গিতে সে জানায় আমি খুবই অসুখী কেননা সব সময় হড়কে যাচ্ছি। নিহিত রোদন ও অন্তর্মুখ প্যারানোইয়াক সাক্ষী রেখে

এই প্রশ্ন কি করা উচিত—পুরন্দর, কেন তুই ম্যাণ্ডোলিন বাজানো ছেড়ে দিলি। কিন্তু তুষার করে। যারা ফ্রানসিস্‌কো গোইয়ার ছবি নিয়ে আমার বক্তব্য পড়েছিলেন তাদের নতুন করে বলতে হবে না পিতা পিতামহ ঈশ্বর নারী কবিতা ও মহিষকে নিয়ে এই হাসি, অমর ও অসংশোধনীয়, সর্বাধিকভাবে মূল্যবান, গভীরতম নেগেশন। বোদলেয়ারীয় নির্বেদের অন্তিম পরিণতি। সন্দেহের অধিকার যার মজ্জাগত বা কোন কিছুকেই বিশ্বাস করবার যৌক্তিকতা যার কাছে ফুরিয়ে গেছে, উদাসীনতা তার রক্ষাকবচ হতে বাধ্য; চাক্ষুষ বিশ্ব তুষারের কাছে অর্থহীন—কেন যে রোদ্দুর কেন নিমডালে কাক কেন দিবাস্বপ্ন ছাড়া কোন শুভ বার্তা নেই / বা আরও তাৎপর্যময় ভাবে—

যে সময় মৃত্তিকা নেই ঋজুপাদপ নেই কেউ আর পরিক্রমণশীল নয় / এমন কেউ নেই যে আমার ঘর-বাড়ি তৈজস আর ক্ষুধা লুণ্ঠন করবে / এমন কিছু নেই যা আমার আত্মক্ষয়ী প্রসাধন / ক্ষুৎকাতর ধর্মপুস্তক (পরজীবী)। সুতরাং ঘুমন্ত অবলোকিতেশ্বর ও গম্বুজের পিতার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে তাঁর কাব্য—

ভেষজক্রিয়ায় পরিশ্রুত তোমার গলিত স্বপ্ন
স্বপ্নের গলনাঙ্ক জানা হোল না
নক্ষত্রাভিযানে বাহৃত তুমি, মহাশূন্যে ব্যবহৃত তোমার জরুরী
ছাতা কেন ফিরে আসে
ঊরুবাহিত শ্বেতঋতুর কুমারী
স্বপ্ন কেন ফিরে আসে

তুষার অকারণে লোরকা ককতো বায়েহোর নামে উচ্ছ্বসিত হয় না। চেতনা অলীক প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর নির্জ্ঞান প্রণালী ভিন্ন প্রকৃত স্বজ্ঞায় উপনীত হওয়ার আর কি পথ অবশিষ্ট থাকতে পারে? ভূমিষ্ঠ হয় তুষারের পরাবাস্তবতা, সদর্থের ভাঁড়বিদ্রোহ ও কডওয়েলের তর্জনী। যেমন ট্র্যাফিক উদ্যানে অশ্বতর। যেমন লিবিডো। যেমন পরবর্তীকালের নীল সূর্য।

এইবারে তুষারের বহু বিতর্কিত এরস খানিকটা বোধগম্য হতে পারে। দার্শনিক অর্থে, ডায়লেকটিক্যালি, তাঁর অনস্তিত্বের অন্য মেরু 'নারী মাংস', অন্য সব প্রয়াস বাদ যাওয়ার পরেও যা নিতান্ত জৈবিক কারণে মৌহূর্তিক সেতুবন্ধন করতে পারে। আর সেক্ষেত্রেও আমাদের আলোচ্য কবি কোন মোহবিস্তার করেন না। তুষারের সেক্সুয়ালিটি শ্বাসরোধকারী দুঃস্বপ্নের মতো বিপজ্জনক :

১) দেখেছি এক নরখাদক বৃহদোষ্ঠ একটি আস্ত ঘোড়া গিলছে

২) ভালোবাসা ক্ষারগন্ধ পুঞ্জ পুঞ্জ কোষ্ঠ কারাগার

৩) নৈঃশব্দ্যকে সে সময় মনে হয় জেলিমাখা দীর্ঘ যোনিখাদ

অতএব যৌনসংলাপমুখর প্রথম রিপুর উপাসক হওয়ার মধ্যবিত্ততা তার নেই। যা আছে তা অন্তিম সমর্পণ ঃ আত্মায় বিঁধেছে যে পেরেক তাকে উপড়ে ফেলতে পারেনি কোন নারী/ফলত খুলি থেকে গোড়ালি পর্যন্ত এই যা কিছু/সব একদিন এক বিপুল ইস্পাতের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে, আর তখন/আপাতভাবে যা কিছু নশ্বর তাই অবিনশ্বর নয় এই হিসেবে/তোমার অস্ত্রের চেয়েও তোমার মুখগহ্বর স্বতন্ত্র ও আদরণীয় হবে (ইস্কাবনের কবিতা)।

আমি পরীক্ষার্থী নই যে কবিতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারাবিবরণী দেব। তবে প্রকাশিত গ্রন্থের নিরিখে তুষারের কবিতার চারটি পর্যায় আমি দেখতে পাই।

ক) বিষাদাচ্ছন্ন লিরিকের মেজাজ

খ) বিদ্রূপপরায়ণ ও আক্রমণাত্মক মেজাজ

গ) তুলনায় শান্ত ও সচেতন পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি

ঘ) কথ্যভঙ্গী ও প্রাত্যহিকতার ধ্বনিচপল পর্যবেক্ষণ

এই পর্বচতুষ্টয়ের মধ্যে শীর্ষদেশ দ্বিতীয় পর্যায় ও ভূমি চতুর্থ পর্যায়। ঈষৎ বিস্তারিত ভাবে বলা যায় সত্তর দশকের সমাপ্তি পর্যন্ত, তুষারের লেখায় কনটেণ্ট অর্থে বিষয় ছিল না। সেই লেখা শিশুদিবস কি দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি নয়ত পাড়ার বালিকাটির স্তনোদ্গম সম্পর্কে আমাদের বোধ ও বুদ্ধিকে আলোড়িত করে না। অন্যদিকে তা মনিয়া নামের নগণ্য পাখি, লিলি নাম্নী কুসুম, ঘোড়া ও বুনোমহিষের মত প্রাণী, সড়ক ও ঘূর্ণায়মান সিঁড়ি, নানাবিধ বর্ণালিবীক্ষণের আপাতঅসঙ্গত অবসেসনের আবহকে বাস্তবতার আরোহী সঙ্গতির দিকে পরিচালনা করে। হে পাঠক, অনুগ্রহ করে স্মরণে আনুন আরাগঁ বিষয়ে সার্ত্রের সেই বিখ্যাত উক্তি ঃ In communist literature in France, I find only one genuine writer. Nor is it accidental that he writes about mimosa and beach pebbles, কিন্তু কনটেণ্ট অর্থে বক্তব্য আছে। আমরা জানতে পারি একজন কবি স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার অসহযোগে লিপ্ত আছেন। একেবারে ইস্তেহারের ভাষায় বললে একটি আধা পুঁজিবাদী আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশের কোন লেখক যদি শুঁড়িখানা ও লাল আলোর অঞ্চলকে অন্তত চিহ্নিতও করে দেন তাকে তো কমরেড বলে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে

করে। ইলিউশন চূর্ণ করার চাইতে আর কি বেশি সামাজিক কর্তব্য থাকতে পারে কোন কবির এই দুর্ভাগা দেশে? প্রবচন ও গম্ভীর প্রপাতধ্বনির অনুষঙ্গ বহন করে সভ্যতাকে সে দণ্ডদান করে: আমি মরে যাচ্ছি ব'লে মানুষের বিশাল বন্দীত্ব আরো বাড়ে। শব্দের লগ্নীক্ষমতায় প্রতিস্থাপিত করে অর্থনীতির মহড়া: মানুষ বমন করে রক্ত / আমাদের চামড়ার তলায় রূপা রূপার অধীন উপশিরা / রক্তের অতলে গুল্ম মৎস্য বা জলপরী বুনো অন্ধকার প্লাসেণ্টাও ছিল /—কাতর আর্তনাদ করে ওঠে: কেন পিকাসোর ছবি গুয়েরনিকার চেয়ে ভয়াল হ'লো না / কূট পরাবৃত্তে এই আমার শরীর বেঁকে যায় /—এবং আমরা বুঝতে পারি তুষারের আর্বান কিমিতি কি আকুলভাবে স্ব-কালের অস্ত্রপরীক্ষা করে। এমনকি আশ্চর্য এই যে তুষার দর্শনের গুরুভার বইতেও অনীহ নয়। সহসা উন্মোচিত হয় সত্যের নগ্নাবস্থান—হারিয়ে যাচ্ছে না কেউ না 'আমি' না মৃত্যুর চূড়ান্ত বিমূর্তন।

তুষার একটু বড় মাপের কবি। তাই নিজের সাফল্য পুঁজি করে সে ক্ষুদ্র শিল্পপতি হতে চায়নি। নিজেকে বদলাতে চেয়েছে। অথচ সেই সূত্রে এই কবি যখন শিল্পে গার্হস্থ্যধর্মের প্রবর্তন করেন, ঘোর পরিশ্রম দৈনন্দিন কথ্যভাষা ও প্রাত্যহিকতার ভিত্তিতে বিষয়মুখী কবিতা লেখেন তখন ব্যর্থ হন। উদাহরণ পঞ্চানন, জাহ্নবী, জীবনানন্দ বা সামান্য মানুষদের প্রতি কিংবা স্বপ্নলোকে কোথায় শিকারীর আরও কয়েকটি লেখা যা চতুর্থ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। আমার মনে হতে থাকে শব্দের ইনস্ট্রুমেণ্টাল ফাংশন, যৌনতার অস্বীকৃতি, বাজারচালু স্মার্টনেস তার রক্তে নেই। যে তুষার একদা শিশুর ললিপপের মত আধুনিকতার নির্বিকল্প নন্দনতত্ত্ব নির্মাণ করেছিল সে এই বইতে একাধিক রচনায় আন্তরিক অভিনিবেশ সত্ত্বেও কবিতার ধর্ম ও কবির স্বভাব বোঝাতে গিয়ে কবিতার থেকে দূরে চলে যায়। আমি নিশ্চিত, বিশেষত সাম্প্রতিক মাপুসা সিরিজের পর, যে এই বন্ধ্যাত্ব ছিল সাময়িক তবু কেন এমন হল?

কিছুদিন আগে পর পর আমি বার্গমানের দুটি ছবি দেখি। থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি ও উইণ্টার লাইট। প্রথমটিতে আছে দৃষ্টির হিম-নীল অবয়ব (art of gazing)। দ্বিতীয়টি চিন্তার সংহতি (art of contemplation)। তুষার প্রথমটির মত তাকিয়ে থাকার কবি। যেমন অনন্য রায় দ্বিতীয়টির মত। আসলে মুগ্ধতা, প্রকৃত প্রস্তাবে বিস্ময়হীনতার বিস্ময়, ইন্দ্রিয়মনস্কতা তুষারের শিল্পের জরায়ু। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তাঁর নয়। শিশুদের জন্য অন্যতম সুসমাচার সে

বহন করে আনে—কাবকারণ সম্পর্কের তদন্ত করো না। সকল মন্ত্রের মধ্যে এই-ই গায়ত্রী অন্তত তুষারের অর্চনায়। ছুটন্ত ফিটনের জানালায় মিঞাবিবির ভালবাসার এক ঝলককে তার আদরণীয় মনে হয় নিরবধি কালের চাইতে; প্রজ্ঞাকে ঠাট্টা করেন কবির পক্ষে বাঁদরের গলায় মুক্তোমালা বিবেচনায়; দ্ব্যর্থহীন বিবৃতি দেন—শব্দ মণীষার মত অতলান্ত হবে, কেউ বলে/কিন্তু আমি মনে করি শব্দেরা নিজ্জন শব্দেরা ইচ্ছার মতো বায়ুভুক···/এবং আমাদের জানা আছে বর্ণমালার আদর খেতে কিভাবে উড়ে আসত তার স্নায়ু লিবিডোর মত কবিতায়। কিভাবে ৭১-'৭৫ তুষার শব্দের যোনিঝিল্লি তছনছ করে দেওয়ায় শব্দের আত্মঋতুদর্শনে সম্মোহিত আমরা বুঝতে পারি বর্ণমালাচারী মাত্র কবি এই অভিজ্ঞতা শিশুসময়ের। তুষার বাস্তবিক আহা! জাগরণ চেয়েছিল জীবপ্রস্তরে লিপ্ত বর্ণমালার শিশুসময়ে যা অপাপবিদ্ধ যা তমালতালী-বনরাজিনীলা যাকে একমাত্র কবিরাই ইতিহাসের অনতিদূরবর্তী কলঙ্করেখা হিসেবে চিনতে পারে। তাই বাস্তবতার উপরিতল তাঁর অচেনা; এই অপরিচিত পৃথিবী তাঁকে উপহার দিতে পারে বড়োজোর কিছু স্কিম্যাটিক ছন্দবিন্যাস। সচেতন পর্যটন, সংক্ষেপে বলার, তুষার চৌধুরীর কাব্যশরীরে পরধর্ম ভয়াবহ।

ও মানবীয় যূথবদ্ধতার অনুভূতি থেকে তুষার যখন ভাষাকে আঘাত করে তখন, একমাত্র তখনই, সে ভাষাকে বাঁচায়, হয়ে ওঠে চক্ষুদানকারী পুরোহিত। তুষার জানে বাংলা ভাষা মনোপলি কর্তৃপক্ষের হাতে নিরাপদ নয়। কবি ও হিন্দু বিধবাতে তফাৎ অনেক; তুষার যে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টায় বিরত থেকে নিজের সান্ধ্য উদ্ভট বর্ণমালা নিজেই প্রণয়ন করতে চেয়েছিল তাতে আরেকবার প্রতিষ্ঠিত হয় সে কবি, কেননা কবি ছাড়া আর কে জানবে মহান চিন্তা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে উপন্যাস বা অন্য গদ্যশিল্প কবিতার থেকে ভিন্নপথে চলে যায়।

অনন্য রায়

Niels Bohr once remarked in connection with Heisenberg's unified theory of elementary particle "this is undoubtedly a mad theory. The only thing whether it is mad enough to be true."

Einstein: B. Kuznetsov.

অত্যন্ত সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে কোনরকম উৎকোচ বা ভীতিপ্রদর্শন ব্যতিরেকে আমি ঘোষণা করছি যে অনন্য রায় আমাদের সাহিত্যে একুশ শতকের প্রথম

কবি। সত্তর দশক একুশ শতকের সূচনা—এই আপাতভাবে নীতিবিরুদ্ধ বাক্যটির দায়িত্ব যে আমি নিতে প্রস্তুত হয়েছি তার প্রধান কারণ এই দশকটি অনন্যর প্রহারধন্য। তুষার চৌধুরী, রণজিৎ দাশ, জয় গোস্বামী, আমি বলব, কবি। আর অনন্য তাদের থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে: স্বতন্ত্র, একাকী, দ্রাবিড়, ভার্টিকাল ইনভেডার। মানুষের ইতিহাস যেমন আদিম উপজাতি-প্রধান সমাজ থেকে শ্রমবিভাজনের অমোঘ ফলশ্রুতিতে শ্রেণী-সভ্যতার স্তর অতিক্রম করে সম্ভবত একদিন শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে প্রবেশ করবে, অনন্যর কবিতা তেমনভাবেই মহাকাব্যের সুদূর অতীতের ইশারাটুকু মনে রেখে লিরিকের খণ্ডতাকে অস্বীকার করছে। আমিষ রূপকথা আমাদের ভাষায় প্রথম সমগ্রের উন্মোচন; সেই মহাকবিতা যা সর্গবদ্ধ কাহিনীকাব্য না হয়েও আসন্ন সমাজ ও শিল্পচৈতন্যের একটি শুদ্ধ অ্যানানশিয়েশন; কাব্যের আঙ্গিকটির অবকাশ বাড়িয়ে নতুন আয়তনের পরিধিতে ব্যাপ্ত করে দেওয়ার এদেশে সম্পন্ন প্রথম সফল প্রয়াস। একবার স্ত্রী-চিহ্নের আদলে একটি কবিতা লিখলেও অনন্যর প্রসঙ্গে আপলিনেয়ার বা অন্য কোন গৌণ কবি যেমন কামিংসের তুলনা অবান্তর। আমি আপলিনেয়ারকে লঘু করে দেখছিনা; ভুলে যাচ্ছিনা আলকুল —আঠেরো থেকে তেত্রিশ—এই পনেরো বছরের মধ্যে লেখা নির্বাচিত পঞ্চান্নটি কবিতার সেই কৃশকায় সংগ্রহটিকেই কামু্য র‍্যাঁবোর ইলুমিনেশনের মতই অব্যর্থ ভেবেছেন, তবু আপলিনেয়ারের সম্প্রসারণ মূলত বহিরঙ্গের প্রসাধনচর্চা; আসলে আপলিনেয়ারের শব্দ দলিত কুসুম, তাঁর প্রেমের বিষণ্ণলোকী আলো কিউবিজমের অন্তস্তল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। সুতরাং ফ্রানসিস স্টিগমুলারের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর সময় জর্জ ব্রাক যে মন্তব্য করেন আমি তার সঙ্গে মতান্তর ঘটানোর কোন যুক্তি খুঁজে পাই না:

I suppose when he printed some of his poem in the shape of guitars and other objects we used to use in our canvases that could be called cubist poetry, though personally I should prefer to call it cubist typography.

অনন্য অপর দিকে কবিতার আত্মার অবস্থান বদলে দিতে চায়। সেই উদ্দেশ্যে অনন্য রায় বরং উত্তমর্ণ মনে করতে পারে জীবনানন্দের রাত্রির মত কবিতাকে যা খানিকটা ছন্দোবদ্ধ প্রবন্ধ খানিকটা সুসম্পাদিত চলচ্চিত্রকর্ম। কিন্তু অনন্যর মৌলিকতা—এ অর্থে মিশ্ররীতিকে আরও অর্থবহ করে যে তা প্রকাশিত হয়

এপিক ভঙ্গিতে। অনন্যর সঙ্গে যদি কোন শিল্পীর মনোধর্মের মিল থেকে থাকে তবে তিনি শ্রীঋত্বিক কুমার ঘটক, কবি নন একজন চলচ্চিত্রকার, এবং ঘটনাক্রমে অনন্য যার অন্তিম নির্মাণের সঙ্গী ছিল। পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করতে আমি চুল্লীর প্রহর ও আমিষ রূপকথার অনুষঙ্গে স্মরণ করব কোমল গান্ধার যেখানে ঋত্বিক বলেন একটি বাস্তবধৃত বহুবিষয়সমন্বিত জটিল নকশা প্রস্তুত করাই ছিল অভিপ্রেত, যেখানে উল্লম্ব মন্তাজের মহিমা অর্থাৎ শব্দ যেখানে ছবির সঙ্গে ধারাবাহিক বিন্যাসে (Sequential order) না থেকে সহবিন্যাসে (Simultaneous order) আছে—যা শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্রায়িত প্রবন্ধের উন্মোচন। বস্তুত ঋত্বিক যেমন আবেগময় পিকটোরিয়াল বিষয় পাশে রেখে দর্শককে চিন্তিত হতে বাধ্য করেন সংলাপের প্রয়োগে—আমরা ভাবতে পারি ভৃগু যেখানে অনসূয়াকে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার উপাখ্যানটি বোঝায় সেই অংশটি—অনন্য তেমনভাবেই কাহিনী ও কাব্যের সমান্তরালভাবে প্রবাহিত করেন দর্শন চুল্লীর প্রহরে। আসলে উভয় শিল্পীই জানেন শিল্প আজ যা স্রষ্টার থেকে দাবি করে তা মেধার উদ্বোধন ও মনন-ধর্মের প্রকাশ। এমন কি, সকৌতুকে লক্ষ্য করার, এই দুজনের বিরুদ্ধে সমালোচনার প্রকৃতিও প্রায় একই ধরণের—বক্তব্যপ্রীতি, অতিরঞ্জন ও কুসম্পাদনা সম্পর্কিত। তফাৎ এই যে ঋত্বিক দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবতার প্রথম স্তরটিকে নির্বাচিতভাবে প্রয়োগ করেন এবং অনন্য কবিতার স্বধর্মে লিপ্ত থেকে শব্দানুমোদিত বিকৃতির আশ্রয় নেন। এবার তাহলে অনন্য রায়ের পৃথিবীতে প্রবেশ করার সুযোগ নেওয়া যাক।

ক্রিস্টোফার কডওয়েলের একান্ত অনুরাগী অনন্য রায় কি তবে বয়ঃসন্ধি পার হয়েই বুঝতে পেরেছিল—A poet who brings into his net a vast amount of new reality to which he attaches a wideranging affective colouring we shall call great poet. giving Shakespeare, as an instance. Hence great poems are always long poems; just because of the quantity of reality they must include as manifest content. But the manifest content, whatever it is, is not the purpose of the poem. The purpose is the specific emotional organisation directed towards the manifest content and provided by the released effeets.

কেননা একজন অনুত্তরবিংশতির পক্ষে যা স্বাভাবিক তৎকালীন সময়ে,

নকশালপন্থার মেঘদূত দেবদাসের স্ব-মেহন বা অনুরূপ কিছু, ১৯৭২ সালে প্রকাশিত (দৃষ্টি অনুভূতি ইত্যাকার প্রবাহ এবং আরো কিছু) তা নয় ; কৈশোরের তারল্য সত্ত্বেও অতিরিক্ত উচ্চাশাপরায়ণ তিনটি পর্বে বিভক্ত একটি দীর্ঘ কবিতা। যেন ভেবেছিলাম অসফল মদনরাজত্ব ; দেখেছি—সময় শিরদাঁড়া ভেঙে বহুকাল পড়ে আছে অধিবৃত্তাকার অন্ধকারে। কোমল নির্ঝরিণীর মত লিরিক আমায় আঘাত দেবে কি ? হায় ! এখানে—একচক্ষু সিংহীর গর্ভে উদ্বাস্তু সময়। অর্থাৎ এই লেখা নমণীয় নয়, পেলব নয়, এবং আমরা যা চাই—মানুষের মরচে পড়া মুখ—অনন্য প্রথম আবির্ভাবেই তা সম্ভব করতে চেয়েছিল। তবু আজকের পরিণত অনন্য রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে লেখাটি যে অকিঞ্চিৎকর, কঠোর শোনালেও, ব্যর্থ মনে হতে বাধ্য তার কারণ সংশ্লিষ্ট রচয়িতা তখনোও শব্দকে শাসন করতে শেখেন নি, আবেগের ঘনীভবন তখনও তাঁর অজ্ঞাত ও ধারকরা দর্শনটিতে সুদের দাবি মাত্রাছাড়া।

অবশেষে প্রচারিত হল নৈশবিজ্ঞপ্তি। ১৯৭৪। কুশ্রীতার বর্ণমালা—ইতিহাস ও সমাজ নির্দেশিত তাঁর রাত্রিময় অস্তিত্বকে পরীক্ষণীয় ভেবে অনন্য বন্দনা করলেন সেই দিব্যসুন্দরীর যার নিবিড় কেশদাম তবে এক আতঙ্কের সূচনা যা আমাদের পক্ষে আদৌ প্রীতিকর নয় ; মাত্রই সহনীয়। যদিও কারলভের পিস্তলধ্বনি রুশ সীমান্ত অতিক্রম করার পর থেকে নৈরাজ্যই ন্যায়, অনন্য এই গ্রন্থ-ধৃত একচল্লিশটি কবিতা লেখার সূত্রে পাঠককে বোঝালেন কবির কৃত্য সেক্ষেত্রে একটি পবিত্র বিশৃঙ্খলার প্রকল্প নির্মাণ। এই নির্মাণ বইয়ের অন্তত নটি চতুর্দশপদীর (৬নং সনেটটি প্রেমপত্র, অনায়াসে উপেক্ষা করা যায়) বিপন্নতা ও শ্বাসরোধকারী ঐশ্বর্যে স্তম্ভিত হতে হতে আমরা উপলব্ধি করি হীরকে যে রাখে ওষ্ঠ, সে কবি। আর কবি বলেই মেদ ও মজ্জায় র‍্যাঁবোর মতো দুঃস্বপ্নকে বিধিবদ্ধ করে সে ও বলে : I have cóme to hold sacred the disorder of my mind. যে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে নৈশবিজ্ঞপ্তি সে আলুলায়িতা রোদসী নয়, ম্লান দিগন্তরেখা নয়, শূন্যতার জঠরে প্রবেশাকাঙ্ক্ষী এক নেতবাচক স্থাপত্য—কারুকার্যময় বহ্নি, হা-হা চুল্লী, ঋতু, আরণ্যক বিভা :

> যেন মৃত্যু ; ভয়ার্ত আদরণীয় মরচে-পড়া নখ
> বহুকৌণিক জ্যোৎস্নায় শিকারীর গুলি ও হরিণ
> একাকার ; হাইড্র্যাণ্টে বহুলাঙ্গ ইস্পাতের চোখ
> জেগে গ্যাখে—সারারাত চাঁদের আহার স্যাকারিন ! (সনেট : ৮)

শিল্পের উদ্দেশ্য যদি স্বাধীনতাবোধের বিস্তার হয় তবে অনন্য বোঝে যে-মৃত্যু এক প্রগাঢ় হিম নিমফোম্যানিয়াক একটি গীটারের জন্য যে দিয়ে দেবে তার ব্যর্থ উরুদ্বয়, নিয়তির কালো পুলিশের সশস্ত্র কঠিন পরিহাস, স্কাইস্ক্র্যাপারের স্বর্গীয় সমাজ, ট্রেনের হুইসিল, টিনফুডের অভ্যন্তরস্থ সমুদ্রের শব্দ, আমিষাশী বৃশ্চিকের ধূসর যকৃতে লিপ্ত ভাষা—না বলবার স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার প্রয়োগ ঘটাতে গিয়েই ক্রোধকে উপাস্য থিম হিসেবে গ্রহণ করে সে। কবিতায় গুমরে গুমরে ওঠে পাহাড়, ঝড়ের শব্দ, ছেঁড়া মেঘের নাস্তিকারী বিলুপ্ত আক্রোশ। চাবুকের সপাং বারবার ফিরে আসে কবিতায়। মেঘে ঢাকা তারার কথা কি মনে পড়বে আমাদের? এই জন্যেই নৈশ বিজ্ঞপ্তিতে ক্রোধের সমানুপাতে আবেগ অসংযমী, প্যাশন রুক্ষ, ঘৃণা তীব্র ও স্বর উচ্চগ্রামের। সনেট নয়—সে তো গৌণ কবিদের অস্মিতাপরায়ণ সাজাবো যতনে—বাংলা সাহিত্যে অনন্য রায়ের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের যদি কোন অবদান থেকে থাকে তা হল এই বইয়ের কতিপয় রচনা রাগের অঞ্জলিবদ্ধ ফেনা উপহার দিয়েছিল মুদ্রণ যন্ত্রকে। এইখানেই সতীর্থ তুষার ও রণজিতের সঙ্গে অনন্যর তফাৎ যে সে বিদ্রূপের কবি নয়, অন্যমনস্কতা তাঁর অপরিচিত। অন্যদিকে সচেতনতা তাঁর কবচকুণ্ডল। ম্যাথু আর্নল্ডের মতো সমালোচকেরা যাকে হাইরিয়াসনেস বলেন তা অনন্যর আছে এবং আছে বলেই তাঁর লেখা গ্রীক দেববাণীর মত গম্ভীর হয়ে সভ্যতার পাপ ও পুণ্যের বিচার ও রায়দান করে। অনন্য রাগী তাই ইনভলভ্ড। এই প্রসঙ্গে আমার পাঠক স্মরণ করতে পারেন যে অন্যত্র আমি জানিয়েছিলাম শিল্পের ইতিহাসে কুড়ি শতকের অন্যতম প্রধান অবদান ডমিন্যাণ্ট থিম হিসেবে দ্বিতীয় রিপুর সংযোজন।

যারা বলেন অদ্যাবধি অনন্যর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব নৈশ বিজ্ঞপ্তি আমি তাদের কথা মেনে নিতে অপারগ। এই বই নিঃসন্দেহে অত্যুত্তম কবিতার সংগ্রহ কিন্তু যে জন্য অনন্য রায়কে আমি একুশ শতকের কবি বলেছি তার দৃষ্টান্ত নয়। অনন্য তখনোও পর্যন্ত—সিনেমায় গোদার যাকে বলেন Cinephille appreciation—কাব্যগুণ বিষয়ে অতিরিক্ত চিন্তিত। তাঁর কবিতা তখনোও রোম্যান্টিক অর্থে কবিতাই; সীমাতিক্রমণকারী ও ধ্বংসের সারমর্ম হয়ে ওঠে নি। আর খণ্ড কবিতার এই পন্থা স্বয়ং অনন্যকেও বোধ হয় খুশী করতে পারে নি। কেননা এরপরেই এলো আমিষ রূপকথা (—এলিয়টীয় unified Sensibility-প্ররোচিত সেই শৃঙ্গজয়ের উপাখ্যান যা শুষে নিল নৈশবিজ্ঞপ্তির যাবতীয় অভিজ্ঞতা কিন্তু হয়ে

উঠলো স্থিতাবস্থার সহিংস আততায়ী। নৈশবিজ্ঞপ্তি থেকে হয়ত নন্দনতাত্ত্বিক অর্থে প্রস্তর ও বমনেচ্ছার সুষমা পাওয়া যেত অধিকতর মাত্রায় কিন্তু আমি বলব সমন্বিত বহুবাচনিক চিন্তা, পদ্মের ওঙ্কারধ্বনি ও গোলাপের মুহ্যমান পাপ, অনুবাদ করে দেওয়া যেত না স্বপ্নের পরম্পরাহীনতায়।

মানুষের ইতিহাস আসলে তার বুদ্ধির ক্রমউদ্বোধনেরই ইতিহাস। সেই সূত্রে অনন্য রায়ের সেরিব্রাল প্রদাহপ্রীতির বিচার করতে গেলে আমাদের পুনরায় ফিরে যেতে হবে ঋত্বিকতন্ত্রে অন্যথায় প্রচলিত মূল্যবোধ থেকে তাকালে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে অনন্য রায়ের অর্থ এলোমেলো মূঢ় দিশেহারা অসঙ্গতি—ঠিক যেভাবে শান্তিনিকেতন-পন্থীদের পীড়া দেয় ঋত্বিকের গ্রামারহীনতা। কেন তিনি প্রথাসিদ্ধ সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্র বোধকে বিসর্জন দিলেন—এই প্রশ্নের উত্তরে ঋত্বিক ঘটকের কাছ থেকে আধুনিকদের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি তত্ত্ব পাই —ছবিতে গল্পের যুগ শেষ হয়ে গেছে, এখন এসেছে বক্তব্যের যুগ। শুধু ছবির কথা কেন বলব, সব শিল্পেই এই বিবর্তন ঘটেছে। বহু আগে জেমস জয়েস তার ইউলিসিস উপন্যাসে এই ধারা এনেছিলেন, বেরটোল্ট ব্রেশট তার ড্রামস ইন দি নাইট নাটকে এই ধারার প্রবর্তন করেন ১৯১৮ সালে।—এই তত্ত্বের সমর্থনেই আমরা উল্লেখ করতে পারি এলিয়টের পোড়ো জমির মত কবিতা উদ্ধৃতি ও রেফারেন্স কণ্টকিত এবং সটীক কিংবা সৃষ্টির তীরে যা জীবনানন্দীয় বক্তব্যের পরা-যৌক্তিক মাত্রাযোজনার নামান্তর। গল্প, অতএব, শ্রীঘটকের চোখে মায়াঞ্জন মাত্র; বক্তব্যই মূল। শুরু হল প্রত্যক্ষভাবে ওভারটোন ও কিম্বদন্তী নিক্ষেপের রীতি। মেঘে ঢাকা তারা বা সুবর্ণরেখায় গল্পাংশ অত্যন্ত দুর্বল; কোমল গান্ধারে তো গল্পই নেই প্রায়। যেহেতু তিনি জানতেন শিল্প শেষপর্যন্ত সত্য নয় বরং কৃত্রিম ও মিথ্যা, যার ডায়ালেকটিকাল উপলব্ধি আমাদের পৌঁছে দেয় সত্যের দ্বারপ্রান্তে; যেহেতু পরিদৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যাটাই প্রকৃত কাজ, অন্যসব গৌণ, সুতরাং অসমসাহসিক ঋত্বিক দাবি করতে পারেন তাঁর ক্ষেত্রে সেন্টিমেণ্টাল মেলোড্রামাও একটা ফর্ম। চলচ্চিত্র নিজেই আঙ্গিক তার কাছে; চলচ্চিত্রের আঙ্গিক এমন কিছু জরুরী নয় অথবা অন্যভাবে বলা যায় সম্প্রসারিত চলচ্চিত্রই একমাত্র সত্য। তিনি বলেন—কাল যদি সিনেমার চেয়ে বেটার মিডিয়াম বেরোয় তাহলে সিনেমাকে লাথি মেরে চলে যাবো। আই ডোণ্ট লাভ ফিল্ম। —কিন্তু পাঠক ভুল বুঝবেন না। এদেশে একমাত্র ঋত্বিকের ক্ষেত্রেই আঙ্গিক উদ্ভাবন; অন্যান্যদের ক্ষেত্রে অনুসরণ। মালার্মে যখন নিজের যুগকে

সমালোচনার যুগ বলেন অথবা টমাস মানের যখন মনে হয় শিল্প আজ সমালোচনা হয়ে উঠেছে তখন তারা আধুনিকতার রক্ত পরীক্ষা করেন। ভাবলে অবাক হতে হয় ব্রেশটের অভিজ্ঞতায় জারিত হয়ে প্রায় একই সঙ্গে পুর্বে ও পশ্চিমে দুজন চলচ্চিত্রকার—ঋত্বিক ও গোদার—আবিষ্কার করেছিলেন সমালোচনা অর্থাৎ বক্তব্য রাখার নতুন রীতি। এই ভূমিকাটুকু প্রয়োজনীয় কেননা বর্তমান আলোচককে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে অনন্য "কবিতার নিজস্ব স্বভাবের ফর্মাল লিমিটেশন" বিষয়ে অভিযোগ করে ও জানায়—কবিতা লেখার আমার কোন দায়িত্ব নেই। আমি চাই ইতিহাস ও সমাজ নির্দেশিত আমার অস্তিত্বের সার্বিক উদ্ঘাটন। এবং সেটা করার জন্য আমি যে কোন প্রকরণ, যে কোন ভাষা, যে কোন বক্তব্য অবলম্বন করতে পারি।—উক্ত প্রেক্ষাপটে আমিষ রূপকথা ও পরবর্তী পর্যায়ে অনন্যর কাব্যে বক্তব্য শুধু অতিরিক্ত নয়; বহুস্তরযুক্তও। ইতিপুর্বে আর কোন বাঙালী কবি মণীষাকে এ রকম ষোড়শোপচার অর্ঘ্য প্রদান করেছেন বলে আমার জানা নেই।

অনন্য যাকে সপ্তম দৃশ্যকবিতায় বর্ণিত এক আত্মজৈবনিক প্রহসন বলেন সেই আমিষ রূপকথার বিপুলায়তন সৌধটিকে আমি এইভাবে বর্ণনা করি: ঈশ্বরীয় পরমতত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক আপেক্ষিকতাপ্রসূত চৈতন্যের সংঘর্ষে জাত দেবকীর অষ্টম গর্ভসম্পর্কিত উপাখ্যানের বিমূর্ত নবীভবন যার মূর্ত ভিত্তি তরুণ মার্কসের ছিন্ন শ্রম ও ১৮৪৪ সালের অর্থনীতির খসড়া। স্ট্রাকচারালি এই নির্মাণ সংশ্লেষধর্মী ও ইনটিগ্রাল, পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের অর্কেষ্ট্রা বা সিম্ফনির মত নানা স্বরের সাম্মিলিত আবর্তন—একীভবন—পুনরাবর্তন ছকটির ভাষাচিত্র। অধিকন্তু বক্তব্য এখানে একই সময়ে একাধিক সমান্তরাল তলে উপস্থাপিত হয়। তাদের ভারসাম্য রক্ষা করে আপাত অসংলগ্ন পুনরুক্তিসমূহ। চরিত্রমালা এখানে স্থির ও স্বয়ং সমাপ্ত নয় বরং ত্রয়োদশ হিজড়ে বিচ্ছিন্ন অথচ ঘনীভূত, বিক্ষেপিত অথচ কেন্দ্রীভূত। সাম্প্রতিকতার একটি উপেক্ষনীয় মঞ্চ অবশ্য আছে। তাকে দিন-রাত্রি ছয় ঋতু দ্বাদশ মাস নৈর্ব্যক্তিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করে। আবহাওয়া তীব্র যৌগধ্বনির; কল্পনা মানবচিন্তার স্তূপীকৃত কোলাজ। আর যে একক চেতনা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে সে বক্তব্যকে স্নায়ু বিপর্যয়ের স্তরে পরিচালনা করতে চায়। এই রচনার পাঠকের পক্ষে নাট্যস্রোতের অন্তর্গত চিন্তার চাইতে—ব্রেশটের সাহায্য নিয়ে বলা যাক—নাট্যস্রোতের উর্দ্ধগত উপলব্ধি অনেক বেশী জরুরী। চালু পঠনাভ্যাস থেকে আমিষ রূপকথাকে অনাবশ্যক ভাবে দীর্ঘ,

ছিন্নগ্রন্থী মনে হতে বাধ্য। লেখাটির বড় ত্রুটি যে গদ্য অতিশয় নড়বড়ে ফলে শরসন্ধানে লক্ষ্যচ্যুতি ঘটে যায় নানা পর্যায়ে কিন্তু অসম্ভব অবদান যে একটি সর্বতোভাবে আধুনিক এপিকমনোভাবের প্রচলন করে বাংলা কবিতায় রোমান্টিক যুগের অবসান ঘোষণা করে।

পরবর্তী চুল্লীর প্রহরে (পরীক্ষা অব্যাহত থাকে। শুধু সংযোজিত হয় এক নিষ্কাম দার্শনিকতা। একে অন্যভাবে দেখলে আমরা সাম্যবাদী ইস্তেহারের একটি পরাবাস্তব রিজয়েণ্ডার আখ্যা দিতে পারি। পূর্বজ প্রয়াসের তুলনায় চুল্লীর প্রহর সরলীকৃত এই অর্থে যে দর্শনের এখানে স্পষ্ট পৃথকীকরণ হয়েছে (ভাষাও দ্বিখণ্ডিত) আবার শিল্পসাফল্য এই অর্থে যে শিলাদিত্য—রূপানন্দা তথা ঈদিপাস —জোকাস্তার কিংবদন্তীটির তত্ত্ব ও প্রয়োগে, সঙ্গীত ও স্বরলিপিতে, কাব্য ও নন্দনতত্ত্বে আশ্চর্য সমাপতন ঘটেছে। প্রবন্ধধর্ম ও সমালোচনাপ্রবৃত্তির জয় আলোচ্য গ্রন্থে সুপ্রতিষ্ঠিত। বক্তব্য এখানে এতই মুখ্য যে, আত্মহননের বর্ণমালা প্রণয়ন করতে গিয়ে অননা কবিতাকে প্যারেনথিসিসের অধিক মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেছেন। চুল্লীর প্রহরে অত্যন্ত আপত্তিকর বিষয় হচ্ছে ইংরেজি ভাষার বিরক্তিকর দীর্ঘ উপস্থিতি। কিন্তু জীবনানন্দের মায়াবী মনোপলিতে বন্দিনী কবিতার উদ্ধারে স্ব-নিযুক্ত এই কবির মাইক্রো-এপিকধর্মী সংগ্রামের অন্তঃশীলা তাৎপর্যের অনুবর্তী হয়ে তা আর তত বিড়ম্বনাময় মনে হয় না।

রণজিৎ দাশ

According to Aragon, great poetry is eternal becausc it is dated, "eternelle d'e´tre date´e'' as he puts it. Sartre extends this to all literature claiming that eternity is the reward of those who take sides in the 'peculiarity of our time.'

Commitment in Modern French
Literature : Max Adereth.

যাকে আজ আমরা সংস্কারে ধর্মে হাড়ে মাংসে কবিতা বলে বিশ্বাস করি, রণজিৎ দাশ তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কত কবি কতভাবে ভণিতা করেছে যুবতীর আদরণীয় ডালিম দুটিকে নিয়ে। বোদলেয়ারের প্রযত্নে তারা, ওই উগ্রচূড়াদ্বয়, পুঁজে রক্তে শহীদ হল। রণজিৎ দাশ এই তথ্য জানে ও আমাদের উপহার দেয় সংক্ষিপ্ত লিপিকুশলতা :

বেড়াতে এসেছি এই কবরখানায়, তুমি
খুলে দাও ওই দুটি বুক
পরিপ্রেক্ষিতের সাথে প্রকাশ্যে মিলিয়ে দেখি
ওই দুটি সমাধি গম্বুজ।

রণজিতের কবিতা এইরকমই—ক্ষিপ্রগতি, রূপে ঝলমল, নেতির সুস্বাদু দ্রাক্ষারস। তুষারের গভীর সন্ত্রাসবাদ তাঁর চরিত্রে নেই। অনন্যর মতো সে উচ্চাশী দার্শনিক নয়। জয় যেরকম বিশ্বামিত্রের স্বভাবে স্বর্গ ও মর্ত্যের থেকে পৃথক একটি অন্তরীক্ষে বাস করতে চায় তাও রণজিতের কাম্য নয়। রণজিৎকে যে জন্য আমি প্রতিনিধিস্থানীয় ভাবি তা হল একটি সার্থক, সর্বগুণান্বিত, পাঠযোগ্যতাসম্পন্ন রচনা সে অনায়াসে লিখে উঠতে পারে। তুষারের অন্তত একুশটি পদ্য আমি দেখাতে পারি যা ছাপা হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের লাভ হয়নি তুষারের ক্ষতি হয়েছে ; অনন্যর লেখার ফাঁক-ফোকরেই লুকিয়ে থাকে বিপর্যয় ; জয়ের রচনায় চোখে পড়ে কিছু পরিহার্য ছেলেমানুষী অথচ রণজিৎ প্রায় সতত মসৃণ। এই গুণ খুব অনুচ্চার্য নয়। বিশেষত প্রতিষ্ঠান সমর্থিত যে কুপ্রচার অর্থাৎ স্বাধীনতাউত্তর একটি বিশেষ যুগের পর ভালো কবিতা লেখার রেওয়াজ আর নেই তার সহাস্য প্রতিবাদ হিসেবে আমরা উল্লেখ করব আমাদের লাজুক কবিতা ও জিপসীদের তাঁবু।

ফুটপাত শিশুরা ভারি ঝলমলে হাততালি দেবে
তাদেরকে দিও তুমি ছন্দজ্ঞান, লজেন্স দিও না—

এই আবেদনে সাড়া দিতে গিয়ে আমরা বুঝি রোমান্টিক তো বটেই রণজিতের শিল্পতত্ত্ব যথেষ্ট আস্তিকতামণ্ডিত। রোমান্টিকতার ভাষ্যকার গোতিয়েকে আবার মনে পড়ে—They included nearly everybody—bankers, brokers, lawyers, merchants, shopkeepers etc.—in a word everyone who did not belong to the mystical cénacle (অর্থাৎ রোমান্টিক চক্র) and who earned their living by prosaic occupations—এই ব্যাঙ্ক-সভ্যতার থেকে, বাজারের থলে হাতে বিষণ্ণ মানুষের থেকে, গন্ধমূষিকের থেকে, গদ্যের থেকে রণজিৎ কবিতাকে পৃথক, পবিত্র, সভ্যতার গোপন কম্পাস ও পরিত্রাণের পন্থা হিসেবে বিশ্বাস করে চলেছে আর সেই বিশ্বাসই তাকে প্ররোচনা দেয় নির্মল কবিত্বের উপমায় পৌঁছতে :

ভাতের গ্রাস তুলতে গিয়ে বুড়ির হাত বারবার
পাখির ভারে বেসামাল কাঁচ গাছের ডালের মতো কাঁপে

বাংলা কবিতার ঐতিহ্যে নগর-মনস্কতার যে ধারা বিদ্যাপতি—ভারতচন্দ্র রায়—ঈশ্বর গুপ্ত—বিষ্ণু দে—সুভাষ এবং সমর সেন—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছে, রণজিৎ দাশ আপাতত তারই নিবিড় সংযোজন ও সম্প্রসারণ। এক সাক্ষাৎকারে সে জানায়—'কবিতা' এবং 'কলকাতা' এই দুটি শব্দেরই আদি ও অন্ত এক, এটা বেশ ইণ্টারেষ্টিং ; এই মিলটা অবচেতনে কাজ করে বলে মনে হয়।—আশ্চর্য এই যে দীর্ঘ কৈশোর একটি মফস্বল শহরের আলো—আঁধারিতে কাটালেও তাঁর শিল্পে কোন সতীলক্ষ্মী ঠিকে ঝি অথবা শ্যামল হাম্বাধ্বনি নেই ; পাঁচালি নেই। অর্থাৎ রণজিৎ ফিউডাল নয় বুর্জোয়া। নস্টালজিয়ার বদলে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে মেগাপলিসের নৈশ হামাগুড়ি। স্মৃতির চাইতে বায়ুদূষণের ঘেরাটোপ। সেখানে রেফ্রিজারেটরলুব্ধ কেরাণী, ডুবুরির নগ্নছবি, ভূতলযাত্রী অনুপম, নৈশ রেডিওতে কিশোরকুমার ও সেইসব যুবতী অন্তর্বাস মথিত করে যারা সভ্যতাকে হাহাকার উপকার দেয়। এবং রণজিতের সবচেয়ে বড়ো কীর্তি যে সে সতত সচেতনভাবে সমসাময়িক। তার কবিতার প্রতিটি শব্দে একজন চতুর সপ্রতিভ সন্দিগ্ধ যুবকের পায়চারি ; ক্যালেণ্ডারের পাতা। এমন কি তার কাব্যে যৌনতার নিয়ত উপস্থিতিও যুবশরীরের সমকালীনতাপ্রসূত। আর শুভেচ্ছার হাত প্রসারিত

হোক কবির প্রতি কেননা আমরা তো জানি সেইসব তথাকথিত শাশ্বত শিল্প যা তারিখচিহ্নিত নয়, যা তুচ্ছ করে জঙ্ঘাক্রিয়া দংশিত আপেল বা গড়িয়ার মতো বাসভূমি তাতে কতো তাড়াতাড়ি চিড় ধরে।

প্রকৃতির দিকের মত কবিতায় যে প্রশ্ন করে—ছুটি কাটানোর ছলে মণীষা তাহলে কেন তার কোলে মুখ রেখে কাঁদে- অথবা যে লেখে—প্রতিটি শব্দের নাম নীলাঞ্জন—আমৃত্যু খরার মধ্যে / এর কোন বিকল্প হবে না—তাঁর কবিত্ব স্বতঃ প্রমাণিত তবু আশঙ্কা থাকে এ সেই আদি রোমান্টিক অঙ্গীকারের পুনরালোচনা নয় তো! সুখের কথা রণজিৎ শর্টস্কোয়ার লেগস্থিত সোলকারসুলভ তৎপরতায় ওয়ার্ডস্বার্থীয় উদ্যান থেকে সরে আসে ও আমাদের আবেশ ছিন্ন করে জানায়—মেঘ, সে তো সংস্কৃত জানে না, জানে যতীনের বড় বোন—আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি যখন দেখি ব্রাহ্মনিতম্বিনীদের যাবতীয় বিরহ সংরক্ষিত থাকে রাত্রির জন্য; শুধুই রাত্রির অপেক্ষায়। অর্থাৎ সে সকাম কিন্তু নির্লিপ্ত। রণজিৎ দাশের রোমান্টিকতা এই অর্থে আধুনিক যে সেখানে ঘুমের লাবণ্য ও ইনসমনিয়ার যুগপৎ উপস্থিতি।

এই আধুনিকতাই তাকে অতঃপর উপদেশ দেয় সন্দিহান হয়ে উঠতে। রণজিতের সঙ্গিণীরা নারী নয়, স্ত্রীলোক ও সচরাচর মাংসাশী একথা জানবার পরেও আমাদের পক্ষে যা অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য থেকে যায় তা হচ্ছে—এই দেহ, সম্পূর্ণ সন্দেহ। —প্রেম নয় সুতরাং যৌনবীক্ষণ এবং এই সন্দিগ্ধ যুবক অবাস্তব মনে করে গাম্ভীর্য ও সেই সূত্রে দার্শনিকতা; হয়ে ওঠে বিদ্রূপপরায়ণ। মান্য যে চোখে পড়ে নৈশ ফুটপাতের একটি দৃশ্য যেখানে তিক্ততা নির্মল ও সুমিত কিংবা সৌরশাসন যেখানে প্রকাশ্য হতে চেয়েছে ক্রোধ। তবু এরকম দু-তিনটি দৃষ্টান্ত বাদ দিলে রণজিৎ পরিহাসমদির ও ইয়ার্কিপ্রিয়। বিশ্বাস তার কাছে সূর্যাস্তের পথে খুল্লতাতপ্রতিম। এদিক থেকে তুষার চৌধুরীর সঙ্গে তার মনোভঙ্গীর মিল। হে পাঠক, দয়া করে লক্ষ্য করুন তুষারের 'রাতে ও নিশীথে' এবং রণজিতের 'স্বপ্নে পিতামহ'। দেখতে পাবেন শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষ কিভাবে ঠাট্টার উপকরণ হয়ে ওঠে। অবজ্ঞার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তুষার পরিহার করে নবসুন্দরের কাঁচি ও রণজিৎ নস্যাৎ করে তথাকথিত সমাজসেবা: কবিতা লেখার পর সিগারেট খেতে হয়, যেমন সঙ্গমশেষে জল / আমি সিগারেট প্রিয়—আমি তো জেনেছি সব—সেই বন্ধুটিকে নিয়ে / কবিতা লেখার রীতি কতখানি বাণিজ্য সফল।

সভ্যতার রুদ্ধদ্বার স্নানদৃশ্য অগোপন রাখার মধ্যে যে কৌতুক রণজিতের কবিতাবলী তার আদর্শ উপমা। কিশোরীর নম্র নয়নপল্লবে বা ছায়াবীথিতলে নয়, ক্ষতযুক্ত নিতান্ত ময়লা প্লাস্টিকের এই শহরে ব্যাণ্ডেজের মত সেটে থেকে তার রচনা আমাদের হৃদয়কে রূপবানই করেছে। তথাপি রণজিতের প্রধান সঙ্কট যে সে অবিরল ভাবে অবন্ধুর ; বিরামহীন ভাবে নিপুণ, সাফল্যের সঙ্গে স্থায়ী চুক্তিতে বদ্ধ। তার কাব্যে কোন পতন নেই—এই বাক্যটির অর্থ সম্প্রসারিত করলে দেখা যায় সে এতোই নিরাপত্তামদির ও ঝুঁকিপরান্মুখ যে প্রায় কখনোই আক্রমণাত্মক নয়। 'দংশনের অনুষ্ঠান'—কবিতাটির কথা মনে রেখেও বলছি, এমনকি জীবনের যৌনসত্য অনুসন্ধানের সময়ও সে তা বিষ্কার করতে চায় না লরেন্সের মত কোন আদিম অ্যাডভেঞ্চার। যে প্রতিমা রণজিৎ নির্মাণ করে তার তনুপুষ্প রৌদ্র-সজল আমরা মুগ্ধ হই তবু নজর এড়ায় না সে প্রায় বিনাযুদ্ধে পরাভব মানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো অগ্রজের কাছে ; 'নষ্ট হবার বয়স এলে' বা মনীষা শব্দের ব্যবহারে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্নেহও দৃশ্যমান হয়। আসলে রণজিৎ একটি মনোরম সরোবর যা রুদ্ধগতি ; সেখানে ফেনপুঞ্জ, চোরাস্রোত ও ভাঙা মাস্তুল নেই। জয় একটি নতুন প্রদেশের খোঁজ করে, অনন্য কবিতার অধিক বিকল্প বিষয়ে ভাবিত, অপস্বপ্নের মধ্যে কবিতাকে প্রশ্ন করে চলেছে তুষার, রণজিৎ কিন্তু ঈষৎ তদন্তের পর মনে হয়, সংস্কার ও অভ্যাসের পুনঃসম্প্রচার মাত্র। এবং সেই অর্থে এখনো পর্যন্ত উচ্চাশাহীন। তাছাড়া নিছক যুবাধর্ম—দর্শনশূন্যতা—তার কবিতাকে প্রবীণ হতে বাধা দেয়। শিল্প দর্শন নয় ঠিকই কিন্তু কোন না কোন প্রাতিস্বিক দার্শনিক মনোপ্রবণতার দ্বারা পুনর্গঠিত না হলে ইতিহাসের দ্বারা প্রতিবন্ধী হিসেবে নির্দেশিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রচুর। গ্রন্থ সমালোচকের থাবা সম্পর্কে রণজিতের আতঙ্ক আমাকে ছোঁয় ; কিন্তু যেহেতু তার কাব্যের অনুরাগী, উদ্বিগ্ন না হয়েও পারি না তার আকাঙ্ক্ষার মধ্যবিত্ততায়। আশা করি রণজিৎ আমার সঙ্গে একমত হবেন, যদি বলি ক্ষুদ্র ভূস্বামীর কোন রিস্ক থাকে না, তার আছে কাছারিবাড়ি কমবেশী নিয়মিত রাজস্ব আদায়। অথচ যার থাকে অলীক মানচিত্র ও বিধ্বংসী বিস্তার, অস্টারলিটজ বা ওয়াটারলু—সেই সম্রাট। রণজিতের শিল্পের শরীরে ইদানীং কিছু অস্থিরতাও লক্ষ্য করলাম। আমি কি তবে সাগ্রহে একটি প্রকৃত অভ্যুত্থানের জন্য অপেক্ষা করে থাকব?

জয় গোস্বামী

An artist who turns mystic does not ignore idea content; he only lends it a peculiar character.—

Art and social life : G. V. Plekhanov.

রণজিৎ দাশের তুলনায় জয় গোস্বামীর অবস্থান বিপ্রতীপকোণবর্তী। রণজিৎ যদি মেট্রোমলিন এই শহরের রোজনামচা, জয় তবে অন্য নক্ষত্রের জীব। জয় গোস্বামীকে আমি বলব আমাদের যুগের এমন এক নিষ্পাপ সত্যার্থী গ্রানউইচ সময়ের জন্য যার মমতার লেশমাত্র নেই। আমার তবু বক্তব্য যে অংশকে সমগ্র হিশেবে দেখার মধ্যে যে ভুল তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে কেবলই জয়ের কবিতা বিচারে। তার সাম্প্রতিক অতিখ্যাতি, দ্রুতস্বীকৃতি ও প্রায় সর্বজনপ্রশংসিত হওয়ার পেছনে সক্রিয় একটি অনচ্ছ ভ্রম যে এই কবি এমন একটি হিরন্ময় পাত্রের মুখ উন্মোচনে ইচ্ছুক যাতে পাপ ও অঙ্গারের দাগ ধরে না। প্রথা ও প্রতিষ্ঠান যাকে শিল্পের স্বত্বগুণ মনে করে তা পরিকীর্ণ আছে জয় গোস্বামীর পরিধেয়তে। কিন্তু জয় কি শুধু তাই? সময়ের কর্কটরোগ বিস্মৃত হয়ে আঙ্গিকের অসংখ্য কৌশল নিয়ে বিলাস ও ব্যসনের সদিচ্ছা? শুধু শুদ্ধ কবি?

আমার মনে হয় না সে অত হিমরক্তের প্রাণী। যতদূর পর্যন্ত পুস্তকধৃত সেই কাব্য-পাঠে আমি মেনে নেব যে জয় অনন্যর মতো ক্রুদ্ধ নয়, রণজিৎ বা তুষারের মত তার অধরোষ্ঠে তাচ্ছিল্য ঝুলে নেই কিন্তু উল্লেখ করব জয় বীতস্পৃহ। শংসাপত্র প্রদানকারীরা যা জানে না বা অনবহিত থাকার ভান করে যে জয় বর্তমানকে এতই অর্থশূন্য অকিঞ্চিৎকর ও আলোচনার অবজ্ঞেয় ভাবে যে সে অতীতকে ভবিষ্যতে পুনর্জিত দেখতে চায়। প্রত্নজীব বইটি পড়ে আমার অন্তত এরকম ধারণা জন্মায়। এই মানসিকতাকে যদি বা আধুনিকতার পরিপন্থী বলে কেউ নির্দেশ করেন তবু একই প্রসঙ্গে বলার যে জয় কোনমতেই স্থিতাবস্থা সমর্থন করেনি। বস্তুত প্রত্নজীবের পিতা ইতিহাসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে মানুষ। মনে আছে একটি স্বল্পায়ু পত্রিকার পাতায় একদা আমি তাঁকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্ঞাতি হিসেবে বর্ণনা করার প্রয়াস নিয়েছিলাম। উভয় শিল্পীর বিবেচনাতেই মানুষ ও তার ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন নয় বরং অর্বাচীন। উভয়েই আস্তম্বব্রহ্মের অবেক্ষক হিসেবে সভ্যতার শ্রেণীযোনিঋণরক্তরিরংসা ও ফাঁকিকে ভগ্নাংশের অধিক গুরুত্ব প্রদানে সম্মত নন।

ইতিহাসনিরপেক্ষ শিল্পীমাত্রই অধিবিদ্যার পথিক হতে বাধ্য। কিন্তু জয় গোস্বামী একটি মৌলিক প্রকৌশল এ প্রসঙ্গে যুক্ত করেছে এবং তা হল সন্নিধি বা Juxtaposition। ফলে, প্রথম দুটি রচনা বাদ দিয়ে, কবিতার অন্যান্য দেশগুলি নানান শাসকের দ্বারা বিজিত জেনে একটি নতুন প্রদেশে পৌঁছনোর যে অভিযান প্রত্নজীবে শুরু হয় তা আমার রুচি অনুযায়ী ভ্রান্ত মনে হলেও বুঝতে পারি এর ফলে অন্তত আবিষ্কৃত হবে আরেকটি উত্তমাশা অন্তরীপ। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমি উচ্চারণ করছি জয় গোস্বামী আমাদের ভাষায় কবিতার এক অনাস্বাদিত জগৎ সৃষ্টির কাজে মগ্ন রয়েছে। এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে বরং দূরান্বয়ী সেতু বন্ধন রচনা করে অনন্য রায়ের প্রকল্পসমূহ। জয় আমাকে যখন প্রত্নজীব উপহার দেয় রাণাঘাটে আমার জনৈক নিকটাত্মীয়ের গৃহে তখন সে পিরানদেল্লোর এই বচনটি উক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে—আমি যে লিখেছি কিছু তা তেমন কোন উচ্চাশা থেকে নয়। জন্মেছি, এই ঘটনার জন্যই মাত্র। এই বিবৃতি প্রাথমিক পর্যায়ে হয়ত সত্য কেননা জয় প্রকৃত কবি কিন্তু গভীরতর অর্থে মিথ্যাভাষণের সৌন্দর্য। কাব্যের প্রচলিত সিদ্ধিতে আস্থার তীব্র অভাবে অনন্তর মতোই সে ছোট ছোট শীতল নুড়ির তীরভূমি থেকে অন্য কোন মূল্যমানের তটভূমিতে নোঙর ফেলতে চায়।

জয়কে আমি অন্যরকম কবি বলছি কেন? এই প্রশ্নের জবাবে আমি প্রত্নজীবের অতঃপর উল্লিখিত পঙতিগুচ্ছের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই :

সব চুপ। শুধু পাহাড়েরা জেগে। যেন আমজাদ সরোদে
ভোর করছেন ডিসেম্বরের দীর্ঘ রাত্রি। এখন আর
রাত্তির নয়, দিন নয়।
রোজ এই সময়ে প্রতাপ তাঁর চৈতকে ছুটে যান জিতে
আনতে গভীর শূন্যের
স্বাধীনতা............

জয় Juxtapose করছেন পুরো কবিতা জুড়ে ও তার চালিকা শক্তি গভীর শূন্যের স্বাধীনতা অর্জনের বিপুল আগ্রহ। শূন্যের জঠরে প্রবেশের আকাঙ্খা থেকেই জয় প্রাক্‌-ইতিহাসের ধাতু প্রস্তর ও তরল রাশির রাসায়নিক সংমিশ্রণ প্রস্তুত করেন। আর তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় মনুষ্য ব্যবহৃত হাতঘড়িটি। কেননা তিনি দেখতে পান আদি ও অনন্ত :

১। এবং আকাশছোঁয়া চুল্লী? যে চুল্লীর ভেতর/সেই গোল বলটি রয়েছে—

দাগকাটা, দীপ্যমান ও ঘুরন্ত।

২। শেষ রাত্তিরের দিকে আলফা সেঞ্চুরির একটি পাথর এসে পড়বে/ তোমাদের ঐ কলাগাছতলায়।

আর আমাদের নিত্য প্রজ্জলনশীল মোমবাতিটি নিভিয়ে দিয়ে জেগে ওঠে অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া। অর্থাৎ, জীবনানন্দের সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক বলা যাক, মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা জয় গোস্বামীর কাব্যে সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো। ব্যক্তিগত তথ্য যদিও, এইবারে বুঝতে পারছি কেন সে দীর্ঘদিন আগে লিখিত আমার গতি তবে স্তব্ধতার মতো প্রবন্ধটি সম্পর্কে আন্তরিক প্রীতি পোষণ করে।

অবশ্য ১৯৮১তে জয় এই পরিখা থেকে বেরিয়ে এসে অবতরণ করে আলেয়া হ্রদে। স্বভাবে নিরুত্তেজ শান্ত তার এই অবগাহনে উত্থিত তরঙ্গসমূহ দীর্ঘ নয় ছোট, কিন্তু বিরোধী অনুভূতিগুচ্ছের একত্র সন্নিবেশে প্রার্থনা করে আমাদের আত্মজ্ঞান। জন্ম ও মৃত্যুর প্রহরায় এখানে ফুটে ওঠে চিত্রমালা: চেতনার চারুভাষী অন্তর্গমন। অনুবাবুর সঙ্গে বিচিত্র সংলাপে, ধাবমান ট্রাকের শব্দে অথবা ফাল্গুনের ভস্মরাশিতে তন্নতন্ন করে আমি নিশ্চিত হই জয় পাঠককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে একাধিক বীজসহ উচ্চ পর্যায়ের একটি সমীকরণের সমাধানে। ক্রমে ক্রমে এই কবি শব্দের মলাটে মুড়ে দিতে চায় চেতনার মুখবন্ধ ও উপসংহার। থাকে অনন্তশয়ানে বিষ্ণু, কিটাসের হোমপাত্র, জন্মবৃত্তান্তের বারিরাশি। থাকে অতিচেতনাপ্ররোচিত প্রেতজাগরণ, নশ্বরতার আত্মভুক পট, বিমর্ষ তমোধারা।

জয় গোস্বামীর অনুচ্চরোল স্পর্ধাকে আমি সম্মান করি। তার নবীন মিস্টিসিজম যে অতিশয় তপোক্লিষ্ট একথা মেনে নিতে কোন হৃদয়বান পাঠকেরই অসুবিধে হয় না। প্রত্নজীবের যে জনক নিজেকে সভ্যতার অধিকবয়সী ভাবে বা আলেয়া হ্রদে যে স্নাতক প্রচার করে তেলরঙে লিখিত তন্ত্রভাষা সে আমাকে পরামর্শ দেয় উইণ্ডহ্যাম ল্যুইসের আলোচনায় বৃত এলিয়টের প্রতি মনোযোগী হতে—The artist, I believe, is more primitive, as well as more civilized, than his contemporaries. His experience is deeper than civilization, and he only uses the phenomenon of civilization in expressing it.

এবং সেই পরামর্শ থেকেই জয় প্রসঙ্গে আমার সংশয়ের জন্ম; কবি কি তবে অন্তঃপ্রেরণাকে ইতিহাস চেতনায় সুগঠিত করে নেবে না? এই প্রশ্নের উত্তর

ইতিবাচক, আমরা জানতাম, উদ্ধৃতিটি দিতে হল—এই মাত্র। একটু দুর্দিনের সঙ্গেই আমি বলব জয়ের কবিতার হারমেটিক বাতাবরণ প্রতিবেশচেতনার পথরোধ করে। এক্ষুণি একশ তিনের মাথায় আউট বয়কট ঘোষণা বা মফস্বলী ইতিকথার ক্ষণিক বশবর্তী হলেও তাঁর কবিতা অনুনয় দীপ জেলে এমন মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের আরতি করে যে আমাদের সময়প্রস্থতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা বোধ করা কঠিন হয়ে আসে। জয় প্রতিভাবান কিন্তু সময়সচেতন সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ তর্কের ইঙ্গিত যদি সে না শুনতে চায়, তবে আমার ভয় হচ্ছে, অলোকরঞ্জনীয় রূপবাদ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে।

এতক্ষণ পর্যন্ত দেখাতে চাইছিলাম যে একবিংশ শতকের উপকূলে একটি অনতিতরুণ গ্রানমাদল অপেক্ষমান। সত্তর দশকের এই চতুরঙ্গ থেকে আমার প্রতিপাদ্য ছিল সফল কাব্যরচনাই আজকের যুগের কোন কবির আয়ু সুনিশ্চিত করতে পারে না। সামাজিক উপযোগের বিরুদ্ধে নিজেকে সৃজনশীলভাবে বিপন্ন করার জীবনানন্দীয় রণনীতির সঙ্গে সঙ্গে এই দশকে একটি মেধাজর্জর প্রতি আক্রমণের উদ্যোগ অবয়বী হয়ে ওঠে। এই-ই, এই সম্পূবক উপলব্ধিটুকুই ইতিহাসের কাছে তার দায়বদ্ধতা।

আমার আরও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন ছিল। বিশেষতঃ রণজিৎ দাশ ও জয় গোস্বামীসংক্রান্ত বক্তব্যে। এছাড়া পাঠকের একটু বয়স্ক হওয়া দরকার। মধুসূদন দত্তের মৃত্যুর পর একশো বছরেরও বেশী কেটে গেছে। এখন পাঠক আর এমন কোন গোপাল নন যে আলোচনার নামে হাত ঘুরিয়ে তার হাতে আমি কবিতার নাড়ু তুলে দিতে পারি। আমি আমার পাঠলব্ধ অভিজ্ঞতা বিবৃত করলাম মাত্র। পাঠকের জন্য থেকে যাক না একাকী প্রবেশ ও খননকার্যের উল্লাস।

চন্দ্রমল্লিকার মাংস এবং/অথবা দোলমঞ্চে উত্তেজনা

ক.

Young hoodlum is an outdated expression that leads straight to the legion of Honour and a house in the country.

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা বিষয়ে আলোচনার অনুরোধ আমাকে যথেষ্ট বিব্রত ও সঙ্কোচগ্রস্ত করে। এ জন্যে নয় যে তাঁর কবিত্ব বিষয়ে আমি সন্দিহান ; বরং উল্টোটাই সত্য। অতিরিক্ত সম্বর্ধিত বলেই আমার আশঙ্কা হয় যে কোন অনাহত মুগ্ধতা বোধহয় আমার জন্য আর অপেক্ষা করে নেই। প্রণয়স্নিগ্ধ জনৈকা মহিলা যদি দশজন মূর্খের বিক্ষোভে প্রীত না হয়েও থাকেন তবু অনুমোদিত অ্যানার্কি ও বাতানুকুল স্বেচ্ছাচার সাহিত্য আকাদেমি ও ভারতভবনের দরজায় কড়া নেড়ে যেতে থাকবে। উপরন্তু ভীড় বস্তুটির হাত-পা-চোখ না থাকলেও হৃদয় আছে। আর তা আপাতত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যে সমর্পিত। বিগ্রহ বন্দনার সুবিধা বা অসুবিধা হল তার আবাহন বা বিসর্জন আছে কিন্তু কোলাহল মুক্ত অবলোকনের সুযোগ কম। আর আমাদের সাহিত্যে উত্তীর্ণপঞ্চাশ শক্তি চট্টোপাধ্যায় আজ এমন শালগ্রামশিলা যে তাঁর বিষয়ে যে কোন আলোচনারই রাসলীলায় পর্যবসিত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। একজন কবি যার মান বাঁচায় আদালত, একজন কবি যার সুগোল ও স্বাদু কণ্ঠস্বরে সিগারেট সন্ধ্যায় উপচে পড়ে রূপসীদের স্তনসম্ভার, নিজ কর্মস্থল থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকায় যার সাক্ষাৎকার পড়ে মনে হয় পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের যোগ্যতা বিষয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণসমূহ অতঃপর অন্তর্ভুক্ত হবে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান উদ্যোগের সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকায়, একজন কবি যিনি সরস্বতীর হাতে তুলে দিতে চান ছন্দের মোয়া, একজন কবি যার মত্ততাও আমাদের মধ্যবিত্তমথিত শহর রোমহর্ষে উপভোগ করে —তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে আমার মত অজ্ঞাতকুলশীল পাঠকের আর কিই-বা অতিরিক্ত বলার থাকতে পারে? একদা যে বলেছিল কবিতা, মর্মরফল শূন্যতার নীলিমার দ্যুতি ; আজ সে হায়! আরূঢ় ভনিতা, বাক্-বিভূতিতে চলমান অশরীরী ; তার করতল নেই সে কাকে ভিক্ষে দেবে?

খ.

Cover her face, mine eyes dazzle, She died young

এতদ্বারা আমরা কুযুক্তির রেশমজর্জর ভেনাসকে পরিহার করলাম। এরপর আমাদের কর্তব্য হবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাবলীর ঈষৎ পরীক্ষা ও পুনরীক্ষণ। আমি সানন্দে স্বীকার করব যে অন্ততঃ "হে প্রেম হে নৈঃশব্দ" এবং "সোনার মাছি খুন করেছি" আমাদের ভাষাকে সম্পদশালিনী করে তুলেছে অথচ এও এক নক্ষত্রের দোষ যে ভঙ্গুর তটরেখাটি সম্পূর্ণত অদৃশ্য না হলেও উক্ত অভিযান অনতিকালের মধ্যেই ভ্রষ্টলক্ষ্য আত্মরতি ও উদ্দেশ্যহীন প্রকরণচর্চায় পর্যবসিত হয়। এই কূটাভাষটির একটু সম্প্রসারণ প্রয়োজন। স্বতঃস্ফূর্ততা ইতিহাসকে মোচড় দিতে প্রায়ই সাহায্য করে কিন্তু তার সীমাবদ্ধতা সুপরিজ্ঞাত। অনুরূপভাবে শক্তির প্রতিভা স্বতঃপ্রমাণিত কিন্তু তা বিপ্লব নয়।
যে কারণে জীবনানন্দকে আমরা প্রধান পুরুষ মনে করি তা হল যে তিনি সেই কবি যিনি আমাদের কবিতাতে প্রথম প্রকৃতভাবে সেরিব্রাল এলিমেণ্ট আরোপ করেন। যদি মেনে নেওয়া যায় আগুন ও কমপিউটার মানুষেরই বুদ্ধি বৃত্তির সন্তান তবে দেখব—রবীন্দ্র বিরোধিতা কোন পয়েণ্ট নয় বা ট্যাকটিক্যাল উপজীব্য মাত্র, তা করার জন্য অনেকেই ছিল—বাংলাভাষায় জীবনানন্দের পর কবিতার একটি গুণবাচক উত্তরণ ঘটেছে। এখন কবিতা কবির কাছ থেকে যা দাবী করে তা মেধাজীবীতা। বিষ্ণু দে র জ্যাবদ্ধ টানে নয়, সুধীন্দ্রনাথের ভাস্কর্যে নয়, কবিতা যে উন্নীত চৈতন্যের ভাষা এই সত্য প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মুদ্রিত হল সাতটি তারার তিমির কাব্যগ্রন্থে। শ্রাব্য আয়তন ও বক্রিমাযুক্ত শূন্যতার সহাবস্থানে জীবনানন্দ বাংলা কাব্যকে ক্রমআরোহী বাস্তবতায় উত্তীর্ণ করে গেলেন।
যারা উত্তর রবীন্দ্র যুগে জীবনানন্দের পর শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে অপর আলোকস্তম্ভ হিসেবে চিহ্নিত করবার প্রয়াস পান তারা অতিশয়োক্তির আতিশয্যে নিশ্চিত ভাবেই ভুলে যান ইতিহাসের ধারাবাহিকতা—বিষ্ণুবাবুর বহুস্তরসমন্বিত অরমণীয়তা, সুধীন্দ্রনাথের ধ্যান, সমর সেনের নাগরিক অবদমন. সুভাষসহ সমগ্র চল্লিশের আলোকিত শরসন্ধান। তথাপি আমি এও যুক্ত করব যে শক্তির কবিতা যা, বাস্তবিক, অন্তহীন মুগ্ধতার দৃষ্টিপাতমালা আমাদের আধুনিক মননধর্মের

বিরুদ্ধে প্রথম স্মরণীয় প্রতিকূলাচার। একদা নজরুলের অপরিকল্পিত বিদ্রোহ যেমন আমাদের আড়ষ্টতার মায়াবী সম্মোহন ছিন্ন করেছিল, শক্তির অস্তিত্ব সংক্রান্ত বিক্ষোভ—যোনির মাড়ির খিল হাট করা বেহায়া পাংশুতা—অনেকটা তেমনভাবেই আমাদের কাব্যের ক্রমাবয়বী ও আপাতনির্দিষ্ট পরিকাঠামোটিকে পরিহাস করে শৈশব স্বাচ্ছন্দের জলবায়ু প্রবর্তন করে। এই ভূমিকা ঐতিহাসিক; সকৃতজ্ঞচিত্তে আমরা তা স্মরণ করি।

এই-ই তাহলে যুগাবসান অর্থাৎ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লিখনরীতির সূত্রে আবার প্রবৃত্তি জয়যুক্ত হল। প্রবৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ততার জন্ম দেয়, স্বতঃস্ফূর্ততা ক্ষণদীপ্তির। আজকের একজন কবির ক্ষেত্রে নির্মাণের বদলে স্বভাবই যদি ক্রমাগত প্রশ্রয় পেয়ে যেতে থাকে, চিন্তার দুরূহতার বদলে আবেগের সারল্য, তবে তা সংস্কৃতির ইতিহাসের পরিপন্থী বলেই অনতিকালের মধ্যে স্বরব্যঞ্জনের টুং-টাং ও সত্যেনদত্তীয় বেলোয়ারী আওয়াজে অবসিত হয়ে যায়। নজরুলের প্রাকৃত রোষও তো মিশেছিল ফুলের জলসায়—আমি স্পষ্ট করেই বলতে চাই শক্তি মনোপ্রবণতার দিক থেকে কোনক্রমেই আধুনিক নন, তাঁর শীর্ষদেশে আধুনিকতার সন্নিহিত অঞ্চলের বাসিন্দা। ছন্দ ও কথ্যভঙ্গী নিয়ে বিলাস-ব্যসনের সদিচ্ছা তাঁকে অসামান্য লোকপ্রিয়তা দিতে পারে কিন্তু ইতিহাস চেতনায় সুগঠিত না হয়ে সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ তর্কের ইঙ্গিতহীন অন্তঃপ্রেরণা যুদ্ধোত্তর কালের শিল্পে কি শোচনীয় বিপর্যয়কে আমন্ত্রণ জানায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভার অসফলতা আমাদের কাছে তার এক মূর্ত দৃষ্টান্তস্থল।

ইতিহাসগতভাবে পরবর্তী সভ্যতার জীব বলেই সংশ্লিষ্ট কবির এই ব্যর্থতার প্রেক্ষাপট আরও মর্মান্তিক হয়ে ওঠে যখন লক্ষ্য করি নদী ও প্রান্তরের সাম্রাজ্যকে সজাগভাবে বিস্রস্ত হতে দিয়ে বরিশালের নিতান্ত বাঙালী কিভাবে মুখ ফেরান জটিলতায় হৃতচক্ষু শহরের দিকে সাতটি তারার তিমিরে আর নিউইয়র্কের কবিতায় স্পেনের শীতল দিগন্তরেখা কি ম্লান হয়ে আসে লোর্কার সত্যবদ্ধ রক্তবমনে। অথচ কালজ্ঞানে জারিত নন বলেই দক্ষিণ বাংলার শ্যামশ্রী থেকে নাগরিকতায় প্রক্ষিপ্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায় একজন বিমূঢ় ফিউডাল থেকে যান। "রমণীর সাজ আর স্বরূপের বিরোধের মতো" তাঁর মধ্যে একটি বিরোধ ক্রিয়াশীল থেকে যায়। জন্ম এবং পুরুষ-এর আতঙ্ক 'জরাসন্ধর" অসহায়তা এবং খেলনার নির্মম ঔদাসীন্য একটি সম্পূরক নমনীয়তা খুঁজে পায় যখন—ভয়/রাত্রি ভেঙে গেলে ভোর যদি/ইষ্টিশান মাস্টারের মেয়ের মতন মনে হয়। যখন শালবনের

মাধুর্য ও মহিমা রাহু বিস্তার করে। যখন শব ছুঁয়ে থাকে চন্দ্রমল্লী, পৃথিবীর অমর বিধবা।

প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছিল তিনি সৌন্দর্যনাশক নন; সৌন্দর্যের রচয়িতা। শক্তি তা অস্বীকারও করেন না। পদ্য শব্দটির প্রতি তাঁর মাত্রাতিরিক্ত প্রীতি ও ছন্দবিষয়ক অহেতুক মমতা দেখিয়ে দেয় তথাকথিত কবিত্বে তার আস্থাও প্রচলিত নন্দনতত্ত্বের অহঙ্কার হয়ে উঠবার প্রতি তাঁর আত্যন্তিক বাসনা। এক অমূলক প্রচারের দ্বারা আমরা অভিভূত হয়েছিলাম—সম্ভবত "কবিতার সত্য" জাতীয় রচনাকে পরিপ্রেক্ষিতনিরপেক্ষভাবে বিচার করার কুফলে—যে তিনি পারাপারহীন বিস্ময়হীনতার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কবিতাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। অথচ সত্য এই যে মড়কে, সাহিত্যে, মদ-মস্করায়, অনভিনিবেশে তিনি বিস্মিত হতে পেরেছেন। আর সেই বিস্মিত মুহূর্ত সমূহই তাঁর কাব্য। তিনি মুহূর্তের কবি, তাৎক্ষণিকতার কবি।

অনুধাবন করবার যে এই মুহূর্তসমূহ যেহেতু ব্যবধানযুক্ত ও স্বয়ম্ভর, শক্তির লেখায় কোন সুষম চিত্রলেখ নেই। ভালো, যাকে বলে সার্থক কবিতার অব্যবহিত পরেই তিনি জুড়ে দিতে পারেন ক্যাকাশে পদবন্ধ। পুনর্বিবেচনার মত সিদ্ধি কখনই প্রতিশ্রুতি দেয় না যে বাল্যকালের দোলমঞ্চ বিষয়ে শক্তি আকুল হয়ে উঠবেন না।

এবং এই তাৎক্ষণিকতার ওষ্ঠ চুম্বন করে থাকে মৃত্যু: কূটনীতি, ঠাণ্ডা, শূন্য আগ্নেয় তোরণ। তাঁর কোন কোন রচনা যে অদ্যাবধি আমাদের স্মৃতির আনুগত্য দাবী করে তার কারণ নামহীন নশ্বরতার এই বিকীরণ। মৃত্যুই তাঁকে বিযুক্ত করে মত্ততা থেকে (সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়)। মৃত্যুর দ্বারা পরিদর্শিত বলেই তাঁর অনুভূতিমালা, অশ্রু ও উল্লাস, দূরাবলোকনে অবিচ্ছিন্ন কিন্তু সামীপ্যে স্বতন্ত্র। শক্তির সৌন্দর্য, অতএব, হিন্দু প্রতিমার সৌন্দর্য। এই আচ্ছন্ন স্বয়ংক্রিয়তা, এই দুয়েন্দে তাঁকে পদ্যের হাত থেকে বাঁচায়। অপর দিকে সচেতন অগ্নিবন্দনা বা প্রস্থানের প্রতিবাদ ("ও চির প্রণম্য অগ্নি" অথবা "যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো"র অধিকাংশ লেখা) দুর্ভাগ্যজনক হয়ে ওঠে কেননা পরচুলা ও রঙ খসে পড়লে যা থাকে তা স্থূল হস্তাবলেপন—তা কাব্য নয়। বায়রণ সম্বন্ধে গ্যেটে যা বলেছিলেন ঈষৎ বদলে নিলে শক্তির সম্পর্কে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য—The moment he thinks, he is a child.

সৌন্দর্যের নগ্ন, প্রত্যক্ষ, জৈব পরিচয়-নায়ভিটি-শক্তির ভিত্তি ও প্রাথমিক

প্রতিজ্ঞা। অনবরুদ্ধ আবেগ আর লাবণ্যের জন্য তাঁর হাহাকার—ধ্বংসের প্রজ্ঞানমুক্ত সারমর্ম তাঁর নয়। একটি সভ্যতার শোণিতগন্ধ ও রুগ্নতা তাঁকে ক্ষমাহীন আত্মপরীক্ষার বদলে স্বপ্নের মধ্যে পুনর্বাসিত করে। সময়কে আক্রমণ নয় বরং এক পশ্চাদপসরণ যার সমাপতন রোমান্টিক স্বর্গে। এতোল বেতোল আর উলুক-ঝুলুকের কথ্য রুনুঝুনুতে যদি অধিক মন মজে, যদি মেঘে মেদুর সেই যে বক্ষে বাস্তুভিটা অধিকতর মন কেমন করায়, উল্লম্ফনময় ছড়ার ছন্দ যদি হয় ইষ্টদেবীর বিকল্প, বিউলিডাল ও একবাটি সুক্তো যদি অন্তিম ভোজ্য দ্রব্যের গৌরব পায় তবে আমাদের মেনে নিতেই হয় যে বক্তা প্রবঞ্চিত সামন্ততান্ত্রিকতার প্রতিনিধি। পাঠককে তাঁর শেষতম প্রদেয় হৃদয়ের একটি কৃষি-সংস্কার প্রকল্প। যখন সর্বস্ব যায় বস্তুকামে, গৃধ্নু তায় নানাবিধ কাজে তখন ত্যেওফিল গোতিয়ে, জনৈক রোমান্টিকের বলাই স্বাভাবিক যে তাঁর ফরাসী নাগরিক অধিকারের চাইতে অধিক আদরণীয় প্রকৃত রাফায়েল কিংবা কোনও সুন্দরী বিবসনা। ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনাজাত অনুরূপ মূর্ত অভিমানে চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে নিজ নিতম্ব বিষয়ক উদ্বেগে অথবা অন্যের পশ্চাদ্দেশে পদাঘাতের দুর্মর অভিপ্রায়ে নদীতীরে সূর্যাস্ত এবং প্রেম প্রসঙ্গে শক্তির ক্রুদ্ধ চালাকি তাহলে ইয়ার্কির পর্দা খুলে দিলে তেমন অভিনব কিছু নয় (২৬নং ও ৬৩নং সনেট)।

আর কথা বলা আপাতত খুব জরুরী নয়। আবৃত্তি, সূচীশিল্প, কারুকর্ম এবং অন্য অন্য ললিত কলার সঙ্গে তাঁর বীমাকৃত নৈরাজ্য এখন প্রচার মাধ্যমের নিয়মিত কুচকাওয়াজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর "সতর্কীকরণের" বিজ্ঞপ্তিটি যে শক্তির হাতে পৌঁছয়নি তাও নয়। তবু রূপের আলেয়া তাঁকে ধীমান হতে বাধা দিয়েছে বারে বারে। তাঁর নারী নিসর্গ নক্ষত্রমালার মধ্যে চিন্তা জটিল শাখা-প্রশাখা ছড়ায় না বলে চোখের সকল ক্ষুধা কানের সমস্ত আবেদন মিটে গেলে সেই কবিতা আমাদের আত্মার অন্তস্থল পর্যন্ত সঙ্গী হতে অসামর্থ্য জানায়। এই অসামর্থ্য—স্তব তিরস্কার, বহমান এই বিবৃতি-বিজ্ঞাপনের মধ্যে হঠাৎ আমাকে ঝলসে দেয় কতিপয় শব্দের একটি অমোঘ বিন্যাস—অলৌকিকতার কাছে সবার আকৃতি ঝরে যায়।

মনে হয় এই তো মুহূর্ত ; শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্য অবিচুয়ারি তবে লেখা যেতে পারে।

অগ্নিবর্ণ মৃত্যু

'কিন্তু বুঝি না তাকে
দুধ ও তামাকে সমান আগ্রহ যার,
দুনৌকায় যাত্রী এই বাঙালী কবিকে,
বুঝি না নিজেকে।' (২২শে জুন : সমর সেন)

যে তিক্ততা ও কটু কৌতুক নিজেকে ক্রমশ নিঃশেষ করে তারই মহিমান্বিত চিত্রলেখ কবি সমর সেন। এই কথাটুকু সত্য হতে পারে কিন্তু তা খণ্ডিত সত্য। অন্তত এই প্রসঙ্গ বিস্তারের জন্য ছোট এই নিবন্ধের অবতারণা করিনি। বরং আজ তাঁর প্রস্থানের পরে নির্বিকল্প শ্রদ্ধা জানাতে হয় সেই মৌনব্রতকে যা তার কোন কোন সহকর্মীর মতো বুদ্ধিস্খলিত স্থূলতার অবিরাম প্রজননকে কবির নিয়তি বলে মেনে নেয়নি। যুথীবনের দীর্ঘশ্বাস যাদের আকুল করে তাদের মনে হওয়াই সঙ্গত যে ১৯৩৪—৪৬ এই বারো বছরের কাব্যচর্চা অগ্নির ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ। যেমন মনে হয় মধ্যবিত্ত ও ঔপনিবেশিক হীনমানস থেকে যে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের পৌত্রের একমাত্র কীর্তি ইংরেজী ভাষার অত্যুত্তম ব্যবহার। সুতরাং নাউ ও ফ্রন্টিয়ার সম্পাদনা সম্পর্কিত সুস্বাদু স্মৃতিচারণ অথবা—কবিরা যেন সচরাচর অতিমানুষ বা অবমানুষ—সমরবাবুর মনুষ্যত্ব বর্ণনা। অথচ আমরা জানি এই সব সুপ্রচারিত বাগবিভূতি যত ক্ষণপ্রভ সমরবাবুর কাব্য ততটা নয়। সমরবাবুর নকশালপন্থার চাইতে তাঁর সাহিত্যচর্চা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যে জন্য আমরা সমর সেনের উত্তরাধিকার বরণ করে নিয়েছি তা এইজন্য নয় যে তিনি ছিলেন একজন বংশগৌরবসম্পন্ন ইংরেজীনবিশ কিম্বা একজন অভিজাত উগ্রপন্থী, বরং এই সামান্য কারণে যে তাঁর কবিতাবলী আমাদের ভাষার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারসমূহের অন্তর্ভুক্ত। গদ্যছন্দ ও নাগরিকতা বিষয়ে তাঁর খ্যাতি সুপরিজ্ঞাত কিন্তু এবার অন্তত গুছিয়ে বলার সময় হয়েছে যে কেন সমর সেন প্রগতিশীল কাব্যচেতনার সঙ্গে অনন্যভাবে সম্পৃক্ত। একদা আদি রোমান্টিকদের পক্ষ থেকে জন কীটস আকাঙ্খা করতেন—O for a life of sensations rather than of thought ! না বলা বাণীর এই ঘনযামিনীটি ইংরেজী কবিতায় চলতি শতকের দ্বিতীয় দশকে ব্রুকের প্রেমগীতি ধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবসিত হয়ে যায়।

আমাদের এখানে এলিয়ট অবশ্য ক্রাইটেরিয়ন ও পবিত্র অরণ্যর প্রবন্ধাবলী সমেত এসে পৌছলেন আরও পরে--১৯৩০ সাল নাগাদ। কল্লোলযুগ ও নরেন্দ্রীয় প্রমত্ততার খোয়াড়ি ভেঙে একটি সৌরকরময় সূচনা। সাহিত্যের ইতিহাস স্মরণ করবে সুধীন্দ্রনাথের 'কাব্যের মুক্তি' সদৃশ প্রবন্ধ, তবু আরও তাৎপর্যময় ফলাফল হচ্ছে বিষ্ণু দের চোরাবালি এবং সমর সেনের কয়েকটি কবিতা। এলিয়ট যখন লিপিবদ্ধ করেন তাঁর বিখ্যাত চরণত্রয়—

Shall I say, I have gone at dusk through narrow streets/ And watched the smoke that rises from the pipes/Of lonely men in shirt-sleeves leaning out of windows?

আমরা সহজে মেনে নিই যে বেকার বিহঙ্গ এবং অথবা নাগরিকের স্মৃতিকাগার ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে গেছে।

> শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে শূয়রের চামড়ার মতো,
> গলিতে গলিতে কেরোসিনের তীব্র গন্ধ,
> হাওয়ায় ওড়ে শুধু শেষহীন ধুলোর ঝড়;
> এখানে সন্ধ্যা নামল শীতের শকুনের মতো। (মৃত্যু: সমর সেন)

যদি বা উদ্ধৃত পঙক্তিসমূহে এলিয়টের ধূসর উপস্থিতি অনুভূতও হয় তবু মান্য যে এরপর আমাদের মহান নগরীতেও বিবর্ণ দিনের শেষে নেমে আসবে আলকাতরার মতো রাত্রি।

এরকম একটি কুসংস্কার প্রায় সত্যের মর্যাদা পাচ্ছে যে আমাদের আধুনিকতার আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে এবং অমিয় চক্রবর্তী। লক্ষণীয় যে সমর সেনকে এই পঞ্চপাণ্ডবের সমশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। যুক্তি এক্ষেত্রে এই যে রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য প্রতিভাকে উত্তীর্ণ হওয়ার আপ্রাণ আয়োজনে অথবা নতুন কাব্যাদর্শের বাধ্যতামূলক সন্ধানে তাঁকে, প্রথমোক্ত পাঁচজনের মতো, সর্বতোভাবে নিযুক্ত হতে হয়নি। অথচ উত্তররবীন্দ্র আমাদের কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিরিশ দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সমর সেন শুধু উদ্ভাবকের ভূমিকায় নয়, ১৯৩৫-এ প্রকাশিত অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া' বা ১৯৩৭-এ প্রকাশিত বুদ্ধদেববাবুর 'কঙ্কাবতী-র' তুলনায় একই বছরে প্রকাশিত ও মুজফ্‌ফর আহমেদকে উৎসর্গীকৃত 'কয়েকটি কবিতা' প্রায় এক আলোকবর্ষ এগিয়ে। প্রথম পথিক তখনোও "উর্বশী ও আর্টেমিস" ও "চোরাবালি"র সূত্রে বিষ্ণু দে, "ধূসর

পাণ্ডুলিপি”-র (১৯৩৬) জীবনানন্দ “বোধ” ও “মৃত্যুর আগে”-র সূত্রে অনিশ্চিত স্বর্গের অভিযাত্রী আর সুধীন্দ্রনাথ, ভাষায় ও প্রকরণে না হোক, প্রখর আত্ম-সচেতনতায় মুখরিত করেছেন অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫)।

আবেগের বিরুদ্ধে বুদ্ধি, লাবণ্যের বিরুদ্ধে চেতনাচালিত এক দ্রোহকে যদি আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ বলে স্বীকার করে নিই তবে সমর সেনের শিল্প তার এক আশ্চর্য অভিজ্ঞান। স্তনযুগভারে ঈষৎনতা কোন তন্বীর মদির কটাক্ষ সেখানে আমাদের স্বাগত জানায় না, অন্যদিকে সহসা, এই প্রথম দেখা মেলে আমিষাশী নাগরিকাদের ঃ

> “শুধু কিসের ক্ষুধার্ত দীপ্তি, কঠিন ইশারা,
> কিসের হিংস্র হাহাকার সে চোখে।” (নাগরিকা)

উর্বর সেইসব মেয়েরা, বিষণ্নমুখে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে আসে। অবিরাম বর্ষণধারাকে সাক্ষী রেখে—রবীন্দ্রনাথ তখনোও, আক্ষরিক অর্থেও, সশরীরে জীবিত—সমর সেন তাঁর মেঘদূতের যক্ষপ্রিয়াদের জন্য রেখে যান একটি সংহত বিদ্রূপ :

> “হে ম্লান মেয়ে, প্রেমে কী আনন্দ পাও,
> কী আনন্দ পাও সন্তানধারণে ?” (মেঘদূত)

এই জিজ্ঞাসার সূত্র ধরে বলা যায় সমরবাবুই আমাদের কবিতায় প্রথম স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বুর্জোয়া সভ্যতার জীব। যে জন্য তিনি আমাদের চিরঋণী করে যান তা হ'ল বাংলা কবিতার সেই রবীন্দ্রনাথ আচ্ছন্ন সুনিশ্চিত শান্তিনিকেতনে, শস্যশ্যামল সেই ফিউডালতন্ত্রে গতিশুদ্ধ শাহরিক জলবায়ুর প্রবর্তনে সফল হয়েছিলেন সমর সেন। আজ প্রায় অর্ধশতকের ব্যবধানে এই সাফল্যটুকু বিস্মরণযোগ্য মনে হতে পারে কিন্তু ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে ধারণা থাকলে শ্রদ্ধায় নত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না।

অবশ্যমান্য ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্রের পরিশীলনের অভাব থাকলেও সাংবাদিকতার ধর্ম সুমুদ্রিত ছিল। তবু আর্থ-সামাজিক কারণেই তাঁরা শ্লথগতি, নিছক কৌতুকপরায়ণ ও চারুত্বে আস্থাশীল। অপরদিকে পুঁজিবাদী দাঁতচাপা সেই বৃদ্ধা গণিকা, সমরবাবুর ধাত্রী বলেই তাঁর রচনা বেগবান, ধারালো। আক্রমণোদ্যত, অবদমিত আবেগের ভাস্কর্য। কারেন্সি সভ্যতার তিক্ততা ও অবিশ্বাস, ক্রোধ ও বিদ্রূপ, আর্তি ও অস্বীকার তাঁর বিশ্বস্ত সহচর বলেই সমর সেনের ভাষা উপমা এবং সদর্থে কাব্যরীতিতে অপরিচিত জগতের মানচিত্র বহন করে আনে।

১) সমস্ত পশ্চিম আকাশ যেন ইন্দ্রজিতের কুণ্ডল

২) সাকারিনের মতো মিষ্টি একটি মেয়ের প্রেম

৩) উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন এপ্রিলের বসন্ত আজ।

৪) তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো!

৫) আর কত লাল শাড়ি আর নরম বুক, আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ
আর হাওয়ায় কত গোল্ড ফ্লেকের গন্ধ
হে মহানগরী!

৬) 'আমি নহি পুরুরবা হে উর্বশী'
মোটরে আর বারে
আর রবিবারে ডায়মণ্ড হারবারে
কয়েক টাকার কয়েক প্রহরের আমাদের প্রেম
তারপর সামনে শূন্য মরুভূমি জ্বলে
বাঘের চোখের মতো।

৭) মধ্যরাত্রে,
ধাবমান ট্রেনের মন্থর শব্দ;
আমাদের মৃত্যু হবে পাণ্ডুর মতো।

৮) আর এখনো আকাশের মরুভূমিতে
নিঃসঙ্গ পশুর মতো রাত্রি আসে,
ট্রামলাইন শেষ হলে, শেষ হলে ধূসর শহর।

৯) কাঁচা ডিম খেয়ে দুপুরে ঘুম
নারী ধর্ষণের ইতিহাস
পেস্তাচেরা চোখ মেলে প্রতিদিন পড়া
দৈনিক পত্রিকায়।

১০) জানি, রক্তহীন অন্তরে প্রতিদিন বারে বারে আসে
ফুটবল মাঠের চঞ্চলতা,
অষ্টপ্রহর কাঁপে
ভদ্রমহিলা দেখার তীব্র ব্যাকুলতা ;

১১) নরম মাংসস্তূপে গভীর চিহ্ন এঁকে
নববর্ষের নাগর চলে গেল রিক্ত পথে,
বন্ধ্যা নারীর অন্ধকারে পৃথিবীকে রেখে।

১২) যেখানে দুপুরে শ্যাওলায় সবুজ পুকুরে
গরুর মতো করুণ চোখ
বাঙলার বধূ নামে ;

১৩) এপ্রিলে যে সংগ্রাম শুরু, এ্যাসেম্ব্লি হলে হবে শেষ,
এ হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে অনেক পার্টির চিত্ত।

১৪) মধ্য ইউরোপে
জারজ সন্তানকে সঙ্গোপনে রসদ জোগায়
মাতা তাঁর, দাঁত চাপা বৃদ্ধা গণিকা,
পশ্চিমী গণতন্ত্র নাম।

১৫) আকাশে চিমনি কালো রক্ত ছোঁড়ে

১৬) করাল শূন্যের বৃত্তে
নাভিচ্যুত শূন্য যেন কাঁদে,
লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ,
শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ।

যদিও সমর সেন স্বীকার করেন এলিয়টের সেই বহুনন্দিত প্রবন্ধ "ঐতিহ্য ও প্রাতিস্বিক প্রতিভা" (Poetry is not a turning loose of emotion but an escape from emotion) তাঁকে আলোড়িত করেছিল কিন্তু

এতদ্বারা এমন সিদ্ধান্ত করা অত্যন্ত ভুল হবে যে তাঁর কণ্ঠস্বর নিরাবেগ। আমরা বরং প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি যে তার গদ্যছন্দ মোটেই দোলনরহিত নয় বরং স্বপ্নময়তার বিরুদ্ধে যুক্তির পরিস্রুত প্রকাশ। কবিতা নামের শিল্প মাধ্যমটির প্রতি সমরবাবুর প্রণয় নিঃশর্ত আর লেখাতে "মতো" ও "যেন"র অমিতব্যয়ী প্রয়োগ মনে করিয়ে দেয় উপমার প্রতি আমাদের আলোচ্য কবির মনোভাব পৌত্তলিকতা দোষে দুষ্ট। বাস্তবিক সমর সেন অবদমিত রোমান্টিকতার প্রতিনিধি—কলকাতার অধিবাসী এক তরুণ প্রুফক। তিরিশ দশকের সূচনাতে পাউণ্ড, ডলার ও মার্ক রুগ্ন হয়ে পড়লে জনৈক দণ্ডিত যুবাপুরুষের ক্রোধ, অভিমান, হতাশা, বিষণ্নতা, পরিহাস ও অমসৃণ যৌনতা জলজল করে ওঠে সংশ্লিষ্ট কবির রচনায়। এতদিন পর্যন্ত যা অশ্রুত ছিল সেই কথ্যভঙ্গী ও প্রাত্যহিকতা, ন্যাকামিবর্জিত ও সাংবাদিকতার সমধর্মী প্রত্যক্ষ উক্তি যার অন্তরালে লুকিয়ে থাকে একটি অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাস সমর সেন ভগীরথের মতন আমাদের বার্ধক্যচর্চিত কাব্যে নিয়ে এলেন যুবাধর্ম যা অনতিকাল পরে, অকপটে বলার সময় এসেছে, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ব্যতিরেকে সবান্ধব সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রতিষ্ঠা পেতে প্রধান সহায়তা দেয়। প্রচার-কৌশলে বারে বারে প্রতিপন্ন করা হয় যে স্বদেশে জীবনানন্দ ছাড়া অন্য কোথাও 'কৃত্তিবাসের' কোন ঋণ নেই এবং পরুষবাক্য, আত্মহনন, শহরের পিঠ তোলপাড় করা অহংকারের দ্রুত পদপাত এসব পঞ্চাশ দশকের মৌলিক আবিষ্কার। বাংলা কবিতার পাঠক, হেসে আশা করা যায়, প্রয়াত সমর সেনের উত্তরাধিকার চিহ্নিত করতে পারবেন। ব্যক্তিগতভাবে সুনীলকে আমার সমরবাবুর সবচেয়ে প্রতিভাবান শিষ্য বলে মনে হয়। সন্দেহ নেই ১৯২৯-৩০ এ পুঁজিবাদের দ্বিতীয় সংকটের তুলনায় মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনে, যেখান থেকে সুনীল ও সমরের আগমন, মন্বন্তর ও দেশবিভাগের পরবর্তী সংকট অনেক গভীর ও মর্মান্তিক। তবু যেহেতু ইতিহাস ঐতিহ্যকে নামঞ্জুর করে না সুতরাং আসন্ন ভবিষ্যতে সমালোচকেরা তাঁকে সমর সেনের পয়ারপ্রত্যাশী, সম্প্রসারিত ও অরাজনৈতিক উত্তরপর্ব হিসেবে হয়ত বর্ণনা করতে চাইবেন।

সুনীল দীপক ও তারাপদ এই তিনজোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্ররচনাবলী পাপোশে লুটিয়ে পড়বার অনেক আগেই কালিঘাট ব্রিজের ওপরে লম্পটের পদধ্বনি শুনিয়ে স্বর্গ হতে বিদায় দিয়েছিলেন আমাদের সমরবাবু।

১) 'তুমি কি আজ আসবে?'—
নীল, নীল চোখে শরীরের শেষহীন প্রশ্ন,

ভিজে ফুলের মতো নরম প্রেম—
'নিশ্চয়ই আসব'
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তা ছাড়া একসঙ্গে রাত্রে শোবার
দুর্লভ সুযোগ !

২) তোমার ক্লান্ত উরুতে একদিন এসেছিল
কামনার বিশাল ইশারা !

৩) এখানে রাজনীতি শুধু পরনিন্দা, পরচর্চা, বুড়োর ঝামেলা

হে পাঠক ! আপনি সম্ভবত অনুমান করতে পারছেন পঞ্চাশের অতিখ্যাত বেপরোয়া স্মার্টনেস ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য অতঃপর একটি সুগম পথ খুঁজে পাবে। 'চার অধ্যায়ে' সমর সেন যেখানে লেখেন—

'জানো, কাল রাত্রে মিলির বিয়ে হয়ে গেছে ?'
অন্ধকারের দীঘিতে সে শব্দ পাথরের মতো !
ও কিছুই নয় ; কদিনই বা মনে থাকবে ;
তবে হয়তো কোন রাত্রে রতিবিহারের সময়
হঠাৎ তোমাকে মনে পড়বে,
আর সেদিন সমস্ত রাত
চোখে আর ঘুম আসবে না।

সেখান থেকেই ঐতিহাসিক তর্থে আটাশ বছরের সুনীল প্ররোচিত হন পত্নীর স্তনের বোঁটা থেকে ঠোঁট তুলে এনে মধ্যরাতে পুরনো বন্ধুর মুখ দেখার অনুরোধ জানাতে। সমর সেনের যে যুবক ও বেকার প্রেমিক মদির মধ্যরাত্রে মৃতুহীন প্রেম থেকে মুক্তি আকাঙ্খা করে : যার সকাল শুরু হয় কলতলায় গণিকার ক্লান্ত কোলাহলে সেই পরবর্তীকালে "আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি"তে নিখিলেশের প্রতি প্রশ্নার্ত হয়ে ওঠে। ও হ্যাঁ, আমরা উল্লেখ করতে ভুলে যাচ্ছি কিছু ঝলসে ওঠা ইয়ার্কির প্রসঙ্গ যা নস্যাৎ করে দেয় আমাদের ব্রাহ্ম গাম্ভীর্য :

১। নইলে হে হরি
এ বয়সে মন্দ লাগত না আর একটি কিশোরী।

২। যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে।
বছর দশেক পরে যাব কাশীধামে।।

আর দুজনেই শিকড় পর্যন্ত রোমান্টিক বলেই ছদ্মবেশ মোচন করে সহসা যন্ত্রণা উত্তীর্ণ সৌন্দর্যের বন্দনা করেন। যেমন "মদনভস্মের প্রার্থনা" (সমর সেন) ও "দেখা হবে" (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)।

সমর সেন ও তাঁর "রাগী" উত্তরসূরীরা সকলেই স্বতঃপ্রমাণিত আজ যে বিপ্লব নয় মধ্যবিত্ত যুবকের বিক্ষোভ; বিকল্প কোন নন্দনতত্ব নির্মাণ করতে চান না বা পারেন না যেমন পেরেছিলেন জীবনানন্দ দাশ এবং অংশত বিষ্ণু দে। সমর সেন ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠ করে আমরা স্বচ্ছন্দে দেখতে পাই প্রচলিত সরস্বতীই কমবেশি পরিবর্তিত প্রসাধনসম্ভারে সজ্জিত হয়ে তাদের অঙ্কশায়িনী। লাবণ্যটুকু ঢাকা আছে আপাত নিষ্ঠুরতার আড়ালে। এই নিষ্ঠুরতার অভিঘাতই সমরবাবু ও সুনীলের পাঠকের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। তবে সমর সেনের সততা এইখানে যে আজ যখন পঞ্চাশের মহারথীরা তাদের ছদ্ম-নৈরাজ্য মোচন করে প্রেম বা বাতানুকুল অন্য কোন বিজ্ঞাপনের নিরাপদ স্বর্গকে উজ্জ্বল উদ্ধার বলে মেনে নিয়েছেন তিনি তখন ব্যক্তির নিঃসঙ্গ অমঙ্গলকে সমগ্রের মহাভারতে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। হয়ত বয়ঃকনিষ্ঠ সহকর্মীদের মতন তেলেঙ্গানা অভ্যুত্থানের ব্যর্থতা, নিস্তালিনীকরণ, সীমান্ত সংঘর্ষ এবং অন্য অন্য দ্বিধা তার সামনে ছিল না কিন্তু যে প্রখর ইতিহাসবোধ তাঁকে কৃষ্ণস্বস্তিকার অপচ্ছায়াটিকে প্রতিহত করতে উপদেশ দিয়েছিল তাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে উপায় থাকে না। বক্রোক্তিমুখরতার দিন শেষ হয়ে এলো; আমাদের মনে পড়ে যায় সহজীবীদের সকলের হয়ে তাঁর সেই আলোকিত প্রার্থনা:

> কিন্তু আগামীকাল আসুক ঘর-ফিরতি মজুরের গানে
>
> কুমারীর আত্মদানের প্রথম বেদনায়
> নবজাত শিশুর সহজ কান্নায়;
> শতাব্দীর যন্ত্রণার পর
> নতুন দিন আসুক সভ্যতার পরম চিত্তশুদ্ধিতে।

দুর্ভাগ্য যে এই মার্কসীয় শাপমুক্তি স্বভাবসন্দিগ্ধ সমর সেনকে অন্য কোন সিদ্ধি দেয় নি। না রক্তে, না মর্মে, ইতিবাচনের ঐশ্বর্য তাঁর চরিত্রে ছিল না। ফলে তাঁর লেখা রহস্যহীন হতে হতে বিবৃতিধর্মী, ঘটনার সাবলীল প্রতিবেদনে পর্যবসিত হল। চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে জীবনানন্দ দাশ "উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য" নামের মূল্যবান নিবন্ধটিতে অবশ্য এই বিপত্তির সম্ভাবনা অনুমান করেছিলেন—

"একজন আধুনিক কবির 'উটপাখি' ও অপর আধুনিকের 'নাগরিক' পড়ে মনে হয় যে তাঁরা যা লিখেছেন সবই প্রায় বক্তব্য হিসেবে মনে রাখবার মত জিনিস; কিন্তু আমার মতে প্রথমটিতে পাওয়া যাবে স্মরণীয়তর বাণী এবং দ্বিতীয় কবিতার লাইন ক'টি স্মরণযোগ্য বাক্যের সমষ্টিমাত্র—জীবনসমালোচক এখানে হয়তো নিরেট সাংবাদিকতার দেয়াল টপকে যেতে পেরেছেন; কিন্তু প্রজ্ঞাদৃষ্টি দিয়ে ভাবপ্রতিভাকে শুদ্ধ করে নিয়ে তেমন কোন জীবনদর্শন সৃষ্টি করতে পারেন নি, যাকে কবিতা বলতে পারা যায়।"

আসলে সমরবাবুর উত্থান ও পতনের সূচনা একই বিন্দু থেকে—সচেতন সমসাময়িকতা। সাময়িকতার সংস্কারমুক্ত নিজস্ব দার্শনিক উপলব্ধি দিয়ে শিল্পকে পুনর্গঠিত করার জন্য তেমন ক্লেশ সহ্য করেননি তিনি। ফলে আজকের নিরাসক্ত ও দূরত্বময় পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখলে সেই কবিতাবলী এমন প্রগাঢ়ভাবে একটি বিশেষ সময়চিহ্ন ও বয়োধর্মের প্রতি নিবেদিত যে সীমাতিক্রমের কোন আগ্রহই বোধ করে না। কবিতার সঙ্গে সাংবাদিকী ও প্রচারমর্মী রচনার অন্যতম পার্থক্য যে প্রথমটিতে সত্যের একটি দিব্যতা থাকে যা দ্বিতীয়োক্তদের পক্ষে অচিন্ত্যনীয়। উজ্জ্বল বুদ্ধির দ্বারা আজন্মশাসিত ছিলেন বলে সমর সেন আতঙ্কিত হয়েছিলেন তাঁর সম্ভাব্য বন্ধ্যাত্বে এবং প্রকৃত কবি ছিলেন বলেই সচরাচর দৃষ্ট সেই নির্লজ্জ দুঃশাসনসঙ্ঘের সদস্য হতে চাইলেন না যারা দ্রৌপদীর শেষ বস্ত্রখণ্ডটুকু লুণ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত বাকচাতুর্য বজায় রাখে। তিনি নীরব হয়ে গেলেন।

অতঃপর একদা "কবিতা" পত্রিকার সহসম্পাদককে আমরা অনুবাদক, নাউ ও ফ্রন্টিয়ার পত্রিকার সম্পাদক এবং একজন বিবেকবান বুদ্ধিজীবী হিসেবে দেখব। কিন্তু কবিতার জন্য আর কোন পুনর্মিলনের আবেদন রাখেন নি। এই সংযম, এই নিঃশব্দতাকে আমি সম্মান করি। বাংলা কবিতার সমস্ত সৎ মূল্যায়ণ কবি সমর সেনকে নিবিড় বিস্ময়ে অবলোকন করে যেতে থাকবে আরও বেশ কিছুদিন—আপাতত এই সিদ্ধান্তের সর্বস্বত্ব সংরক্ষণ করলাম।

সে সন্ন্যাস তবে ছদ্মবেশ

তিয়াত্তর বছর বয়সে বিষ্ণু দে প্রয়াত হলেন। অবশ্য প্রবাদে পরিণত তাঁর স্নায়ুতন্ত্র পরাভব মেনেছিলো আগেই। আর আমাদের, কবিতার পাঠকদের, কাছ থেকে তাঁর প্রস্থান তারও দীর্ঘদিন আগে ; একটু দায়িত্ব নিয়েই আমি বলতে চাই তাঁর শেষ ভালো কবিতা—প্রকৃত বিষ্ণু দের মহিমাপ্রকাশক—সেই অন্ধকার চাই (১৯৫৮)। ইতিবাচনের বাণপ্রস্থ থেকে মুহূর্তের জন্যে ফিরেছিলেন তিমিরলিপ্ত সৃষ্টির অরণ্যে। সজীব এক অন্ধকার ; মানিকবাবুর প্রাগৈতিহাসিকের থেকে ঈষৎ ভিন্ন ; 'দয়াল' ও 'ভয়াল' জাতীয় দুটি শব্দের আপত্তিকর অন্ত্যমিল সত্ত্বেও বিষ্ণুবাবু আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন। সে-ই শেষ। তার পরে তাঁর নামে যা ছাপা হয়েছে তা বিখ্যাত উৎসব শেষে পড়ে থাকা ভুক্তাবশেষ। সম্পাদক বা প্রকাশক বা পুরস্কারপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রীতিবর্ধক কিন্তু পাঠকের কি এসে যায় তাতে বিশেষতঃ যে পড়তে চায় বিষ্ণু দের কবিতা ?

আমরা প্রচলিত শোকপ্রস্তাব লিখতে বসিনি। উপরন্তু লোকে যাদের কবি বলে ও যারা মারা গেলে খবরের কাগজ নামের আগে উক্ত বিশেষণটি বসায়, বিষ্ণু দে তাদের অতিরিক্ত ছিলেন। বাংলা কবিতার ইতিহাস তাঁকে নিজের প্রয়োজনে প্রসব করেছিলো। অতএব, বিষ্ণু দের বিপর্যয় কাব্যরচনা বিষয়ে একটি মূল প্রশ্নের দিকে আমাদের চালিত করে—কবিতা ম্যাজিক না মননশীলতা ? তা বিস্ময় থেকে জাগ্রত হয় না ধীশক্তি থেকে উৎপন্ন হয় ? মুগ্ধতা ও চৈতন্যের মধ্যবর্তী সেতুটি কি ? যদিচ মান্য ইত্যাকার প্রশ্ন শুধু কবিতার নয় আজ ; অন্যান্য শিল্প-মাধ্যমগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন কিছুদিন আগে পরপর বার্গমানের থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি ও উইণ্টার লাইট আমাকে অনুরূপ ভাবায়। প্রথমটিতে আছে দৃষ্টির হিম নীল অবয়ব। দ্বিতীয়টিতে চিন্তার সংহতি। কিন্তু আপাতত বার্গমান ও সিনেমার বদলে বিষ্ণু দে ও কবিতাই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করুক।

তখন নিতান্ত কিশোর। একদা এক সান্ধ্যআলাপে স্বয়ং বিষ্ণু দে আমাকে বোঝান কেন তিনি লুই আরাগঁ কথিত কবিতার ইতিহাস তার টেকনিকের ইতিহাস—বাক্যটিকে সমর্থন করেন। এবং এখন উক্ত মন্তব্যের সারবত্তা মেনে নিয়ে আমার মনে হয় বিষ্ণুবাবুই, আন্তর্জাতিক অর্থে, বাংলা ভাষার প্রথম অ-ফিউডাল কবি।

বিষ্ণু দে যখন লেখেন—

ডলু যদি আজ ন্যাকামি করে, প্রায়ই করে
আগেকার মতো—তার মানে এই দুমাস আগের
মতো আর মন বাহবা দেয় না
প্রেম জিনিসটা কি নির্বোধের ?

তখন মুক্ত মাত্রাবৃত্তের তৎপরতার চাইতে যা বড় হয়ে ওঠে তা হল লাবণ্যের বিরুদ্ধে চেতনাচালিত এক দ্রোহ। অথবা যখন চোখে পড়ে সেই বিখ্যাত লঘুকথন :

লেকে আজকাল সকলেই যায়
সকলেরই মত ম্লান সন্ধ্যায়
তুমিও যাচ্ছ ! কী বুর্জোয়া !

তখন কৌতুকের অন্তরালে বুদ্ধির প্ররোচনা ধরা পড়ে। এই স্বাদ ঈশ্বর গুপ্ত বা ভারতচন্দ্রের লেখায়, সমাজতত্ত্বের নিয়মেই ছিল না। সামন্তপ্রথা ক্ষিপ্র ও আয়স্ত হতে জানে না। কিংবা ধরা যেতে পারে আরেকটি উপমা :

বাইশটি বসন্তের সঞ্চিত সঙ্গীত
আমার স্নায়ুতে এসে কাঁপে থরোথরো
দুয়ারে প্রতীক্ষারত উদ্যত ট্যাক্সির মতো।

'চোরাবালি' থেকে নেওয়া তিনটি হালকা দৃষ্টান্ত। ১৯২৬—৩৭। এই এগারো বছরের মধ্যে লেখা হয়েছিল উর্বশী ও আর্টেমিস আর চোরাবালি। এতে প্রমাণিত হতে পারে আজন্ম বিষ্ণুবাবু আশিরপদনখে একজন শাহরিক মানুষ বা বড়োজোর মস্তিষ্কচালনা কাব্যরচনার প্রতিবন্ধকতা করে না। তবু উত্তররবীন্দ্র শ্রান্তিহারক রমণীয়তার মধ্যে শয়নরতা আমাদের কবিতা যে যতীন সেনগুপ্ত প্রমুখের "প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশি রাতি'—জাতীয় প্রণয় নিবেদনে প্রসন্ন হয় নি ; এমন কি নজরুলের প্রায় বর্বর শাব্দিক উচ্ছ্বাস যাকে ক্ষণিকের চিত্ত-চঞ্চলতার অধিক কিছু দান করে নি ; সে—চোরাবালি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া,/এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া ?'—এই প্রশ্ন শুনেই বিষ্ণু দের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করল তার কারণ রবীন্দ্রানুসারীরা, সকলেই ছিলেন কমবেশি নির্মনন। আর বিষ্ণুবাবু ভাষায় প্রয়োগ করলেন চিন্তা ও শুদ্ধ চিন্তার কঠিন ভাস্কর্য। প্রখর ধীশক্তি কবিতা লেখার প্রতিকূল নয় বরং সক্রিয় প্রেরণা—একথা বুঝিয়ে দিয়ে চোরাবালি আজ

যাকে আমরা আধুনিকতা বলি তার প্রবর্তন করল। যে চৈতন্য-জ্যাবদ্ধ টান প্রকৃত শিল্পের চিরকালীন অভিজ্ঞান, তা আশ্চর্য হলেও সত্য জীবনানন্দে নয়, প্রথম উৎকীর্ণ দেখলাম ক্রেসিডা, ওফেলিয়া ঘোড়সওয়ার কবিতার ললাটে।

যেমন শব্দ। কবিতা তো শেষ পর্যন্ত শব্দের শিল্প। আর কোন কবি, আর কিছু না হোক, সারা জীবনে একটি শব্দেরও যদি জন্ম দেন তবে ওইটুকুই তার স্থায়িত্বের পক্ষে যথেষ্ট নয়? আমি ঘোড়সওয়ার কবিতায় সেই বহুনন্দিত চরণদ্বয়ের কথা স্মরণে আনি:

কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরোথরো।
কামনার টানে সংহত গ্লেসিয়ার।

পল ভালেরি, বলাই বাহুল্য যে কবি, দাবি করেছিলেন শব্দের যোনি পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে পারে না। হে পাঠক, সহর্ষে লক্ষ্য করুন গ্লেসিয়ার শব্দটি এখানে পেরিনিয়ম থেকে শুরু করে আমূল প্রজননতন্ত্র পর্যন্ত দর্শিয়েছে। নজরুল-সত্যেন দত্তের আরবি-ফারসীর দখল এ নয়; পৃথিবী নামের এই গ্রহে মানুষ নামের দ্বিপদ প্রাণীটি যে সমস্ত ভাষায় কবিতা নামের শিল্পটির ব্যবহার করে তার কোনটিতেই "গ্লেসিয়ার' শব্দটি প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা শব্দটি বিষ্ণুবাবুর। উক্ত শব্দের সর্বসত্ত্ব বিষ্ণু দের দ্বারাই সংরক্ষিত। এবং এরকম শব্দ, আজ আমাদের যে সব সহকর্মী মাতৃভাষার ইতিহাস-ভূগোল প্রায়ই ভুলে যান তাদের সবিনয়ে জানানোর, অবশ্যই একাধিক বিষ্ণু দের কবিতাবলীতে।

সুধীন্দ্রনাথ চোরাবালির সমালোচনায় দেখিয়েছেন মাত্রাবৃত্তের মতো রাবীন্দ্রিক যন্ত্রকেও নিজের সুরে বাজানোতে বিষ্ণুদের উৎকর্ষ কি স্বতঃপ্রমাণ। উৎসাহী পাঠক 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থটির শরণাপন্ন হতে পারেন। এ বিষয়ে আমার নিজের তদতিরিক্ত কিছু বলার নেই। তাঁর মধ্যমিলও ডক্টরেটমদির অধ্যাপকের চিন্তনীয়; আমার নয়। কিম্বদন্তীমৃগয়া প্রসঙ্গেও এই ছোট নিবন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয় কেননা ইতিমধ্যেই তা কুড়িশতকীয় আধুনিকতার একটি শীর্ষলক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু ওফেলিয়া ও ক্রেসিডা সম্পর্কে, সেই অর্থে বিষ্ণু দে সংক্রান্ত, আমার মূল বক্তব্যটি এখনোও রাখা হয়নি।

ওফেলিয়া, অধিকতর ভাবে ক্রেসিডা, বাংলা সাহিত্যে একটি বিপ্লব। কেন? এতদিন পর্যন্ত আমাদের কবিতায় একটি স্বরসঙ্গতি ছিল; ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের মতই তা বিশ্লেষণধর্মী ও ডিফারেনসিয়াল। বিষ্ণুবাবু প্রথম আপাত অসঙ্গত পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার নানা স্তরে ভ্রমণ করে জানালেন কবিতা ইউরোপীয়

ধ্রুপদী সংগীতের মতো সমন্বয়ধর্মী ও ইনটিগ্রাল হতে পারে। ইংরেজিতে যাকে বলে সেমাণ্টিক ডিসটারবেন্স তার প্রচলন হল ওফেলিয়াতে—প্রথম অরমনীয়তা; বাংলা কবিতা বুর্জোয়া যুগে প্রবেশ করল। বিষ্ণু দে যে প্রথম নাগরিক তা এ কারণে নয় যে শহরের কথা বলেছেন শহরের ভঙ্গীতে। তা ইতিপূর্বে অমার্জিত ভাবে ঈশ্বরগুপ্ত ও মার্জিতভাবে ভারতচন্দ্র রায় লিখেছেন। এবারের প্রভেদ দুটি। ১. এই শহর সামন্ততন্ত্রের নয়, পুঁজিতন্ত্রের। ২. বিষ্ণু দের কাব্যে পূর্বজদের মত শুধু শহরের রীতি নয়, আত্মার জটিল স্বরলিপিটিও দৃষ্টি গোচর হয়।

১৯২৬—৩৭ এই কালপর্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বিষ্ণু দেকে উত্তররৈবিক বাংলা কাব্যের প্রবর্তক বলেছি। ১৯৩৫-এর খসড়া ও ১৯৩৭-এর কঙ্কাবতী দেখলে বোঝা যায় অমিয় চক্রবর্তী বা বুদ্ধদেব বসু তখনও বয়ঃসন্ধির গ্লানিতে, শরীরে নয় কাব্যের গঠনে, ভুগছেন। এমনকি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো আন্তরিকভাবে শিক্ষিত পুরুষও, যদিও রচিত হয়ে গেছে অর্কেস্ট্রা ক্রন্দসী উত্তর ফাল্গুনীর কবিতাসমূহ—'কাব্যের মুক্তি'র মত স্মরণীয় প্রবন্ধ, জেনে উঠতে পারেন নি আধুনিক কাব্যের আঙ্গিকসম্ভাবনার পরিণাম। উটপাখীতে চূড়ান্ত সিদ্ধি তাঁর আয়ত্তে এসেছিল; তবু আজ খুব স্বচ্ছ হয়ে এসেছে তারপরেও সুধীন্দ্রনাথ দার্শনিক বিশ্বাস ও কাব্যপ্রকরণের ভেতরে কিছু দুর্মর কুসংস্কার পোষণ করে গেছেন। ও হ্যাঁ, আমাদের কি মনে পড়ছে না জীবনানন্দের কথা? পড়ছে; এও আমরা জানি এর মধ্যেই ১৯৩৬-এ ধূসর পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয়। অন্তত তিনটি মহৎ কবিতার দেখা পাচ্ছি তাতে। ১. মৃত্যুর আগে। ২. অবসরের গান; ৩ বোধ।

ছায়ার রঙ তিনি দেখেছেন; এরকম লিখেছিলেন শ্রীযুক্ত ইউজিন দ্যলাক্রোয়া তাঁর দিনপঞ্জীতে। জীবনানন্দ 'মৃত্যুর আগে'তে ছায়া ও শব্দ দুইয়েরই রঙ দেখলেন; স্বীকার্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই দেখা সম্ভব ছিল না। তবু শেষ অনুচ্ছেদটি না থাকলে, বা থাকার পরেও, এই রচনা ইন্দ্রিয়পরায়ণতারই চূড়ান্ত প্রকাশ। 'অবসরের গান' নিশ্চিতভাবেই অনাস্বাদিত জগৎ। কিন্তু কোন জন কীটস কি বিশশতকের বরিশাল দেখে ও ফ্যানি ব্রনের প্রতি সামান্য অমনোযোগী হয়ে one who has long been in city pent কবিতাটিকে পুনর্লিখনের মাধ্যমে দীর্ঘরূপ দিলে অবসরের গান লিখতে পারতেন না? যা বলতে চাইছি তা হচ্ছে মৃত্যুর আগে অবসরের গান নতুন কবিতা কিন্তু আর্বান নয়; ইতিহাস-চেতনা তার মর্মে প্রবেশ করে নি। 'বোধ' প্রসঙ্গে লাজুকভাবে মেনে নিচ্ছি যে আমার উপরোক্ত বক্তব্য খাটছে না। আমি নিজেই এখনও নিশ্চিত নই যে

বোধের প্রবন্ধধর্মী আধুনিকতা জীবনানন্দ অত আগে আয়ত্ত করলেন কিভাবে। আর যদি বা করলেন তবে তাঁকে মহাকবি হিসেবে চিহ্নিত করতে আমাদের— মহাপৃথিবী তো বটেই—সাতটি তারার তিমির পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল কেন। আর বোধেও "হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়"—জাতীয় আলগা অন্যমনস্ক উচ্চারণ পাচ্ছি, ক্রেসিডা বা ওফেলিয়ার ছিল টানটান সপ্রতিভতার কাছে যা নিতান্ত বাঙাল! তথাপি বোধ—মধুসূদনের আত্মবিলাপের বিপরীত আবর্তে প্রযুক্ত হয়ে—পূর্বাভাস দিয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের অবস্থান অনুযায়ী বিষ্ণুবাবু বড় জোর বামপন্থী হেগেলিয়ান; মার্কস হয়ে ওঠবার বিধিলিপি একমাত্র জীবনানন্দেরই।

এবং যেহেতু জীবনানন্দ প্রবীণ হতে সময় নিয়েছিলেন, অনতিপরবর্তী সমর সেন বা সুভাষ যা চল্লিশ দশকের কবিতা বুদ্ধিবৃত্তি ও নাগরিকতা বিষয়ে হাতে খড়ি নেয় বিষ্ণু দের পরিশীলিত উদাহরণ থেকে।

অবিস্মরণীয় কূটাভাষটি হচ্ছে যে বিষ্ণু দের কবিতার গোপন বিপর্যয়ের শুরুও চল্লিশ দশকের সূচনা থেকেই প্রায়। লক্ষণীয় এ সময় থেকেই তিনি মার্কসবাদের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁর কবিতার দিগন্ত, দেশ ও কাল উভয় অর্থেই আরও প্রসারিত ও বিদগ্ধ হয়েছে। অথচ "আলেখ্য" থেকেই রোগ প্রকাশ্য হল। আমরা বুঝতে পারলাম বিষ্ণু দে কাব্যগুণ হারাচ্ছেন। পরের বহুখ্যাত স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ তো অপাঠ্য কবিতা।

কেন এমন হল? মার্কসবাদ বা যে কোন দার্শনিক বৈদগ্ধই কি কাব্যসৃজনের পরিপন্থী? বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিষয়ে এ প্রশ্ন বারবার উত্থাপিত হতে দেখেছি। পাণ্ডিত্য ও মনন নয়, এক দৈবী উন্মাদনাই কি কবিতার শেষ আশ্রয়স্থল?

না, তা নয়। সেক্ষেত্রে সত্যেন দত্তের খুব বড় কবি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। জীবনানন্দ সঠিকভাবেই তাঁর মধ্যে মননধর্মের শোকাবহ অভাব অনুভব করেছিলেন। শেকসপীয়ার ও লোরকা খুব নির্বোধ ছিলেন না। গ্রীকদের কাছ থেকে ধার করে যারা এনথিওসমস-এর তত্ত্ব চালাতে চান তারা ভুলে যান স্বয়ং র‍্যাঁবো স্নায়ুর বিপর্যয় চেয়েছিলেন। কিন্তু "সচেতন" বিপর্যয়। সচেতন বিশেষণটি না থাকলে র‍্যাঁবো যে কোন পাগলের সঙ্গেই অনুমিত হতেন; ঈশ্বরপ্রেরিত উন্মাদ হিসেবে নির্দিষ্ট হতেন না। পরাবাস্তবতারও একটি সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক জরায়ু ছিল। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস আসলে তার বুদ্ধির ক্রম-উদ্বোধনেরই

ইতিহাস। কবিতা, যা শুদ্ধতম লিখনশিল্প, সেরিব্রাল প্রদাহ ভিন্ন জন্ম নেয় না। তাহলে কি ক্ষীণস্বাস্থ্য কলমচীদের সঙ্গে সায় দিয়ে বলতে হবে সাম্যবাদী দর্শনের প্রতি আনুগত্যই তাঁর ট্র্যাজেডির উৎস? না, মোটেই নয়। একজন প্রকৃত কবির মতই বিষ্ণু দে বুঝেছিলেন তাঁর খণ্ড অস্তিত্বের সমস্যা কোন ব্যক্তিগত সমস্যা নয় বরং সমাজ ও ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। সেই সূত্রে তিনি যদি শতাব্দীর সর্বাধিকভাবে সাকার দর্শন মার্কসবাদের প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়েন তবে তা বরং সুবিবেচনাপ্রসূতই হয়। আর লালফৌজ যখন সমগ্র পূর্ব ইউরোপে বসন্ত ডেকে আনে, বিষ্ণুবাবুর চূড়ান্ত মানবিক মূল্যবোধ থেকেই মনে হয়—তাই রাজনীতিতেই গতি। মনে রাখতে হবে সাতটি তারার তিমিরের কবিও কোন লিরিক্যাল গৃহস্থ অথবা দরদী বোহেমিয়ান কিংবা অনুমোদিত অ্যানার্কিস্ট ছিলেন না। একটি প্রবন্ধে তিনি দ্ব্যর্থহীন বলেন—কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান (উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য)। জীবনানন্দ নিজেও যে, স্পষ্ট আস্থা না থাকুক, ক্রমশই আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন "সৌরকরময় চীন রুশের হৃদয়" বিষয়ে তা আজ তাঁর সমগ্র কবিতাবলী পড়ে নিঃসংশয় হচ্ছি।

সমস্যাটা তাহলে অন্যত্র। এতক্ষণ পর্যন্ত ইচ্ছে করেই উহ্য রেখেছি সেই সর্বজন পরিচিত তথ্য যে বিষ্ণু দে অযোনিসম্ভূত নন; নেতির সংযমে তাঁর শিক্ষার শুরু এলিয়টের পাঠশালাতেই। সেটা দোষের নয়। ছোট কবিরা অনুকরণ করে; বড় কবিরা চুরি করে। বিষ্ণুবাবুও যথারীতি চৌর্যবৃত্তিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এবং যেহেতু না শেকসপীয়ার, না দান্তে, কেউই মৌলিক চিন্তা করেন নি সুতরাং বিষ্ণু দেরও এলিয়টের অধমর্ণ হয়ে স্বায়ত্তশাসনের সূচনা স্বাভাবিক ন্যায়। কিন্তু এলিয়টের পতন হল। মনে ছিল না অধ্যাত্মজীবীর ঐশ্বর্য, পরিত্রাণ পেতে চাইলেন বাইবেলের মত হাস্যকর গ্রন্থে; পোড়ো জমির সেই দুর্দান্ত সম্রাটকে নতজানু হতে দেখলাম বাকিংহাম প্যালেসের সামনে। তাতে তাঁর কবিতা কতটা স্থির কেন্দ্রে পৌঁছল জানি না তবে তিনি কবিতা থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন। বিষ্ণু দে'র বিপত্তিও এ ধরণের। দেখা যাবে যতদিন বিষ্ণুবাবু সন্দিগ্ধ, সমালোচনায় অভ্যস্ত, রবীন্দ্রনাথের পঙক্তিকে বিরোধাভাষের প্রয়োজনে ব্যবহার করেন, আত্মসচেতন ও অহঙ্কারী, ততদিন পর্যন্ত তিনি সফল কবি। এলিয়টের পরাজয়ে শিক্ষা নিয়ে তিনি যে ধর্মের চাইতে রাজনীতি, বাইবেলের বদলে ক্যাপিটালকে শ্রেয়তর ভাবলেন, তাতে বরং আধুনিক মানুষ

হিসেবে আমি তাঁর বুদ্ধির প্রশংসা করব। মিছিলকারী কমিউনিস্টদের মত একথাও বলব না যে বিষ্ণু দে'র তত্ত্বে ও কর্মে যখন এত বিরোধ, তার ব্যর্থতা তো অবশ্যম্ভাবী ইত্যাদি ও ইত্যাদি। মার্কস, বা ধরা যাক নেরুদা কেউই বস্তিতে থেকে লেদ চালান নি; তাঁরা স্বভূমিতে সার্থকও। বিষ্ণু দে'র আসল সংকট শুরু হল যখন তিনি রাবীন্দ্রিক ইতিবাচনের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক ইতিবাচন মেলাতে গেলেন। তিনি ভুলে গেলেন ১৯৪১ সাল পর্যন্ত জীবিত থাকলেও রবীন্দ্রনাথ বাস্তবিক, অনাধুনিক; অধিবিদ্যার দ্বারস্থ; তাঁর জগতে একটি পরম (absolute) সতত অস্তিমান। আর মার্কসের জগতটিই আপেক্ষিক এবং আধুনিক মানসিকতার অঙ্গাঙ্গী। এই অলীক, অবান্তর, অবাস্তব মিলনের কল্পনাই তাঁর কাল হল। মার্কসবাদের গায়ত্রী মন্ত্র যে দ্বন্দ্ব, তা আর বিষ্ণু দে'র রচনায় রইল না। অধীত অভিজ্ঞতার কথা বিষ্ণু দে যে এরপর থেকে অক্লেশে পয়ারে, গদ্যে লিখে যেতে থাকলেন সেই নির্দ্বন্দ্ব ব্যর্থতার জন্য, অতএব, মার্কস দায়ী নন; দায়ী বিষ্ণু দে ও তাঁর ভাবের ঘরে চুরি।

স্বভাবের বিরোধিতা শুরু করলেন। কবিতা, বলাই বাহুল্য, প্রথমে সহজ, পরে সরল, শেষে তরল হল। যে রবীন্দ্রনাথকে একদা তিনি অসংলগ্ন মুহূর্তে বক্রোক্তি বা বিরোধের জন্য আরোপ করতেন, এখন তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কারণে খুঁজে নেওয়া হল। পাঠকের অসুবিধের কথা ভেবে দুটি দৃষ্টান্ত দিলাম:

১। হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল।
দ্যুলোকে ভূলোকে দিশাহারা দেবদেবী।

কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনী গন্ধাবনে।

(ক্রেসিডা: চোরাবালি)

২। কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধাবনে?
মোহিনী তোমাকে মন্দারে বাঁধি সমুদ্র মন্থনে।

(বারোমাস্যা: নাম রেখেছি কোমল গান্ধার)

সেইজন্যই বিষ্ণু দে কখনও, হয়ত প্রতিভাবান বলেই, লিখে ফেলেন পদধ্বনির মত ইতিহাসসচেতন দৈববাণী বা সাত ভাই চম্পার মত নিরুপম জাতীয় মুক্তির ব্যালাড কিন্তু আনুপাতিক হারে অধিকতর ক্ষেত্রে অসফল হন। মার্কসীয় বিনয়ে যত তিনি শান্ত হয়ে আসেন তত ধরা পড়ে যে সে সন্ন্যাস বস্তুত ছদ্মবেশ। তাও যখন 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' তাঁর শেষ ভালো বইয়ের 'পাঁচ প্রহর'

কবিতায় হঠাৎই পেয়ে যাই 'অপরাজেয় গ্রোস ফুগের গান', তখন আমরা সমর্থনের হাত তুলি। ইনি-ই প্রকৃত বিষ্ণু দে; এই-ই তাঁর অহঙ্কৃত সফিস্টিকেশন। 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন:

তাই ভাবি জীবনের দুঃখ সুখ থাক—
যতদিন থাকি।
তারপর যবে হব নিশ্চল নির্বাক
থেকে যাবে বাকী
সমস্ত দেশের আর বিশ্বের জীবন।
আরেক অভাবে
মানুষের দুঃখ সুখ পাবে উত্তরণ
আপন স্বভাবে।

এই আপ্তবাক্য সংকলনে সামাজিক মানুষ হয়ত আনন্দ পায়। কিন্তু কবিতার পাঠক—তার অনুতাপ ও দুঃখবোধ বেড়ে যায় নাকি?
কবিতার উৎস ম্যাজিক না মেধা এ জিজ্ঞাসার উত্তর আমার জানা নেই। হয়ত কারুরই নেই। আপাতত দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের মধ্যেও আমি নিশ্চিত যে হ্যামলেটের মতই তারও একটা মেথড ইন ম্যাডনেস আছে। তার থেকেও বড় কথা জীবনানন্দের 'কবিতার কথা' নামের প্রবন্ধটির অন্তিম অনুচ্ছেদের প্রথম অসমাপ্ত বাক্যটি—তার প্রতিভার কাছে কবিকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে। মর্মান্তিক হলেও সত্য যে বিষ্ণু দে তা ছিলেন না। রক্তের স্বভাবকে অবিশ্বাস করে তিনি মুক্তির উপায় খুঁজে ছিলেন সরল জ্যামিতিতে। আর জীবনানন্দ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের প্রতিভাকে প্রতারণা করেননি বলেই আজও পাগলামির একটি সুশৃঙ্খল সংবিধানের সাহায্যে শাসন করে যাচ্ছেন আমাদের। বিষ্ণু দে'র অতীত ও ভবিষ্যত বর্তমানে অবিচ্ছিন্ন। সেইজন্যেই বলব তিনি প্রথম শ্রেণীতে অগ্রগণ্য; কিন্তু মহত্ত্বের তোরণটি উন্মোচিত হয় শুধু তথাকথিতভাবে নিরাশাকরোজ্জ্বল অবক্ষয়ের শিকার জীবনানন্দ দাশের জন্যই। আমরা উপলব্ধি করি অন্তর্গত সামাজিক দায়িত্ব জীবনানন্দ এবং যথার্থ বিচারে জীবনানন্দ একাই অদ্যাবধি বহন করে চলেছেন। মনে পড়ে যায় শার্ল বোদলেয়ারের প্রতি নিবেদিত ত্যেওফিল গোতিয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি:
This poet......loved what one wrongly calls the style of

decadence, which is no other thing than the arrival of art at this extreme point of maturity that determined in their oblique suns the civilization that aged.

পুনশ্চ :

১। এই প্রবন্ধ লেখবার পর আবার বিষ্ণু দে পড়ে পূর্ব সিদ্ধান্তেই ফিরে গেলাম যে দ্বিতীয় গ্রন্থ চোরাবালিই তাঁর সেরা বই।

২। আপাতত আমার রুচি অনুযায়ী বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ দশটি কবিতার নাম : ক) ঘোড়সওয়ার (চোরাবালি) খ) ওফেলিয়া (ঐ) গ) ক্রেসিডা (ঐ) ঘ) পদধ্বনি (পূর্বলেখ) ঙ) জন্মাষ্টমী (ঐ) চ) সাত ভাই চম্পা (সাত ভাই চম্পা) ছ) শালবন (সন্দীপের চর) জ) জল দাও (অন্বিষ্ট) ঝ) ক্লান্তি নেই (নাম রেখেছি কোমল গান্ধার) ঞ) সেই অন্ধকার চাই (সেই অন্ধকার চাই)।

বুঝতে পারছি পাঠক একটু অবাক হবেন, এমনকি আমার দিক থেকেও আজ তাঁর মৃত্যুর এতদিন পরে, আলোচনার সুযোগ পাওয়াও হয়ত অস্বাভাবিক। সম্ভবত গ্যেটে শতবর্ষেই এলিয়ট স্পেণ্ডারকে একটি চিঠি লেখেন, তাতে ছিল যে শতবর্ষের সময়ে সকলকেই তাঁর অপছন্দ। কথাটায় খুব কিন্তু সাহেবিআনা নেই। হয় কি, ভিড়ের হৃদয় শিল্পের দীপটিকে আবছা করে দেবেই। আমি জানি মধুসূদন গৃহীত হয়েছেন। শুধু গৃহীত কেন, এখন হয়ত জন্মদিনে মন্ত্রীগিন্নী, সেক্রেটারিতনয় প্রমুখদের মাননীয় উপস্থিতিতে লোয়ার সারকুলার রোডে ট্র্যাফিক জ্যাম। বিচিত্রানুষ্ঠান, প্রভৃত হৈ-হল্লা, হোমরা-চোমড়াদের ভাষণ সকলই অক্ষত থাকে, এ সময় নিস্তব্ধতাই—শব্দহীনতা আমাদের বিনীত করে যেহেতু—সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ভাষা। নয় কি?

তবু স্মরণ করতে চাই আধুনিকতার প্রথম পুরুষকে এবং একজন শিল্পীকে যখন শরৎকাল আগতপ্রায়—বাজারে বাজারে বিজ্ঞাপন যে আটটি উপন্যাস মাত্র ছ' টাকায়—টেকনোক্র্যাসির কি অপার মহিমা। যখন আধুনিকতা সিফন জর্জেটেই লিপ্ত শুধু—আমাদের নাবালক ফ্যাসানচর্চা অন্তত লজ্জিত হতে পারে, ধ্রুবপদে অন্য এক আলো আছে, অন্তত মনে হতে পারে গণিকার উচ্চকণ্ঠ প্রগলভতার তুলনায় রূপসীর কৃপণ হাস মহনীয়।

আসলে আমি "আত্মবিলাপ" পড়ছিলাম। অবাক হয়ে যাই, কবিতা যখন বিষয়কেন্দ্রীক, আখ্যানমূলক, অধিকাংশ কবিই যখন মধুসূদনের ব্যবহৃত অভিধান অনুযায়ী ব্যারেন রাস্কেল, তখন কি অলৌকিক প্রতিভাবশত কবিতাকে আত্মজৈবনিক করে তুলতে পেরেছিলেন! কবিতা তা শোকের বিষয় ও জীবনযাপনপ্রণালী থেকে নির্গত; একথা বারবার আমরা বুঝতে পারি মেঘনাদবধ কাব্য থেকে, সনেট থেকে। আজ বলা খুবই সহজ হয়ে গেছে যে "আত্মবিলাপ"ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবিতা।

তিনি বিয়োগান্ত নাটকের প্রবর্তক; প্রহসনের সূচনাকারী; সনেটের জনক অথবা অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবয়িতা—এসব সাহিত্যের অধ্যাপকদের পক্ষে খুবই মূল্যবান, কিন্তু আমার মত সামান্য উত্তরপুরুষের যে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় তা

আপন শিরা ও ধমনীর রক্ত চলাচল কবিতায় প্রথম উৎকীর্ণ করে দিতে পেরেছিলেন বলে। ঈশ্বর গুপ্তও চেয়েছিলেন; তাঁর ক্ষেত্রে যতটা পোক্ত সাংবাদিকতা ও অশিক্ষা, কবিতা ততটা নয়। অপরদিকে মধুসূদন চিনেছিলেন শব্দের কটাক্ষের অন্তরালবর্তী শিরা-উপশিরা।

যে প্রসঙ্গ আমরা প্রায়ই ভুলে যাই তা হল এই যে মানুষের ভাষাও নশ্বর, কোন অমর চিরজীবী পদার্থ নয়। লেখক তার প্রধানতম সামাজিক কর্তব্য পালন করেন ভাষার নবীকরণে। মধুসূদন তো লিখতেই পারতেন সেকালে চালু কাব্য ভাষায়। অথচ মাইকেলের নিজস্ব দ্রোহ ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়েছে; পদ্ধতিকে মেনে নিতে চায়নি। মহাভারতের কথা অমৃত সমান—ছ্যাকড়া গাড়ীর মত বাসী পয়ার আর ত্রিপদীর বদলে অমিত্রাক্ষরের যথেচ্ছ যতিপাত, সংস্কৃত ছন্দের মতো স্বরের দীর্ঘতা-হ্রস্বতা ও যুক্ত অক্ষরের বাহুল্যে সংগীতময়। ইচ্ছামত নামধাতুর সাহসী প্রয়োগ; শব্দের রাজকীয় পৌরুষ—আমি ক্র্যাফটসম্যানশিপের কথা বলছি না, ভারতচন্দ্র রায় তার একশেষ করে ছেড়েছেন, বলছি ভাষার প্রতি তাঁর দায়িত্বের কথা যে ঘোমটা-পরা ন্যাকামি আর স্যাঁৎসেতে ভাবটা যে শিল্পের জলবায়ু নয়, তা মধুসূদনের আগে প্রমাণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি কেউই। প্রথম মানুষ তিনি কবি; আর কবিতা ব্যাকরণের খবর করে না বরং কবিই যে শব্দের জন্ম দেয় ও অস্বীকৃতি জানানোর নৈতিক অধিকার তার আছে—এ খবর মধুসূদন দত্তের জীবনে এত উৎকৃষ্টভাবে লিখিত যে সময়ের গতি তাঁর উজ্জ্বল মুখচ্ছবিকে ম্লান করতে পারে নি।

বস্তুত সবাই জানেন যে মাইকেল অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই অগ্রণী ভূমিকাটা কি? মেঘনাদবধ কাব্য পরাধীনতার প্রথম পর্যায়ে দেশপ্রেমের উদাহরণ বা তাঁর প্রহসন দুটি তখনকার ভণ্ডামির মুখে থুথু দিয়েছে এ রকম উপরিতলের শিল্পবিচার আমাদের নয়। ইতিহাসের ছাত্ররা জানে যে ইংরাজদের রেল লাইন পাতা এ দেশে এক কালান্তরের সূচনা, মধুসূদনের শিল্পচেতনাও সেই রকম বিপ্লব—তা দীর্ঘস্থায়ী ও অন্তঃশীলা। না, রুগ্ন বাস-ভূমিতে পশ্চিমের জানালা থেকে আলো আসা দরকার এটা উপলব্ধিতে এনেছিলেন বলেই নয়, বরং আরও বেশীভাবে এজন্য যে শিল্প তাঁর মধ্যেই প্রথম যথার্থ মূল্য পেল: কবিতা-নাটক-গদ্য অর্থাৎ শিল্পে ঈসথেটিক কমিটমেণ্ট যুগপৎ কনফ্রণ্ট ও অতিক্রম করবে নৈতিকতার সমস্যা। এবং মধুসূদন দত্ত এ সত্য আয়ত্তে আনেন কখন? যখন ফিউডালদের আসন অক্ষত। মাইকেল

কি কালাতিক্রমণ দোষ? আমরা তো অ্যাকাডেমিসিয়ান নই যে বলব তিনি খৃষ্টান; তিনি সাহেব। প্রথম দেখলাম ঈশ্বর শব্দমূল্যের অধিক কিছু পাচ্ছেন না তাঁর জীবনে। আর সৃষ্টিতে? রামচন্দ্রের অবমূল্যায়ন মানে শুধু এ নয় যে মানবিকতার স্বপক্ষে একজন মহাকাব্যিক নায়কের বিরুদ্ধতা করা হল। ধর্মানুগত বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহ, যুগ যুগ সঞ্চিত যে বিশ্বাস বাঙালীর শিকড়ে নেমে গেছে—তাকে আঘাত করার অকল্পনীয় দুঃসাহস আমাদের স্তম্ভিত করে। এজন্যই বলছি বিপ্লবী মধুসূদন সাময়িক নন; দূরবিস্তৃত অস্ত্র তাঁর প্রসারিত প্রাথমিক ভিত্তিগুলির দিকে। আমার বক্তব্য আরও জোর পায় বীরাঙ্গনা কাব্যে। তারার চিঠি পড়ে একবারও কি মনে হয় সে পাপপ্রবণা—অর্থাৎ মাইকেল প্রকৃতই নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যবোধে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। শিল্পের যে একটি আলাদা সংবিধান আছে—অবশ্যই অলিখিত—শাস্ত্রীয় আইন সমূহের তোয়াক্কা সে করে না: বাংলা কবিতার পাঠক আমরা প্রথমে শিখতে শুরু করি তাঁর রচনার থেকেই।

এর পরেও সেইসব হলুদচঞ্চু পক্ষীশাবক যারা সবে বুর্জোয়া ডিমের খোলস ছেড়ে বেরিয়েছে বলবে, বিধবা-বিবাহ নিয়ে কেন কাব্য করেন নি মধুসূদন; কেন সিপাহী বিদ্রোহ তাঁকে উত্তেজিত করতে পারেনি ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। হেসে এদের সম্বন্ধে বলার যে ডায়লেকটিকস শিশুপাঠ্য নয়। ইতিহাস কখনোই এখানে কাজ সেখানে ফলাফলের বিবরণ নয়। শিল্পেরও দেশকালপাত্র রয়েছে। মেঘনাদের চিতাশয্যায় প্রমীলাকে না শুইয়ে সতীদাহের বিরুদ্ধে ওজস্বিনী বক্তৃতা রাখলে অনেক কিছুই পাওয়া যেত ঠিকই, কিন্তু প্রমীলাকে মনে হত কাষ্ঠপুত্তলিকা; মনে হত না যে তারও মাংসে উত্তাপ আছে, মনে হত না যে বিষাদ সে তো দশমীরই অপরাহ্ন।

যে দেশের সাহিত্যে দিনগুজরানিটাই স্বাভাবিক, যেখানে প্রত্যেকেই হাতে হাতে পাওনা বুঝে নিতে চান, সেখানে মাইকেল মধুসূদন দত্ত দুর্ঘটনাবিশেষ—অর্থহীনভাবে সম্ভব করে তুলেছিলেন সময়ের ব্যয়, এবং জীবনেরও। প্রখর আত্মহননকামিতা তাঁকে অনুসরণ করেছে—সে ঘাতক, বিপন্ন রেখেছে আমরণ। আসলে আমাদের তেল চকচকে গার্হস্থ্যপনার মধ্যে তিনি বড় বেশী অমিতাচারী, ঝুঁকিপ্রিয়, বড় অসঙ্গতভাবে বেমানান। কোন প্রাক্-নির্দিষ্ট নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। লিখেছিলেন অনাগত পাঠকদের জন্যে, বরং মহান শিল্পীদের যেমন স্বভাব—প্রসব করতে চেয়েছিলেন রুচি। সমকালে তিনি খ্যাতিমান, famous

for his talent, তবু জনপ্রিয় নন। অবশ্য গণ অভিনন্দন পেলে সংশয় আসত আমাদেরই, বলা যেত না আর But a genious only to posterity। আজও তিনি আমার প্রিয়—মাত্রই মিউজিয়ামপিস নন—কেননা সর্বজনমান্য নন। কেননা সে যুগের মত আজও কেউ ধর্মতত্ত্বের অভাবে ক্ষুব্ধ, কেউ স্বাদু, জিহ্বানন্দন রোমান্টিকতার অভাবে রুষ্ট। শেষ করার আগে বলি আমরা আধুনিকেরা শিল্প থেকে রম্যতাকে নির্বাসন দিতে চাই, পরিকল্পিত হিংস্রতায় তছনছ করে দিতে চাই পাঠককে। এ চাওয়ারও উৎস কবি শ্রীমধুসূদন: জীবনে ও রচনায় সর্বতোভাবে আধুনিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋত্বিক ঘটক ছাড়া আর কে তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে নিজেকে পরিচিত করার দুঃসাহস দেখাতে পারে? মাইকেল-মানিক-ঋত্বিক, The invincible trio, এক বিসমবাহু ত্রিভুজ যা বিস্ময়েরও অধিক কিছু স্তব্ধতা দান করে আসমুদ্র হিমাচলকে।

প্রাচীন মৃগয়া

I am Lazarus, come from the dead
Come back to tell you all, 1 shall tell you all

প্রুফ্রকের প্রেমগীতি

the sense of mystery, of a real danger to be won,
were of the essential nature of the tale

From Ritual to Romance.

পুনর্বার দ্বিতীয় পৃথিবীর সন্ধান। যেহেতু নরকের চাইতেও কঠোর এই কালরাত্রি। আমাদের পুরুষেরা ইন্দ্রিয়পরবশ আমাদের নারীরাও কেউ ঋতুমতী হল না। মৃত্যু বুঝি অনিন্দিত শুধু! আমাদের অভিশাপ আমাদের বন্দীত্ব স্নায়ুতন্ত্রে জলপ্লাবন শিল্পের সন্ধানে তাই কাটে দিনমান। এই অপ্রাকৃত জনপদ। এই বিধ্বস্ত শবযাত্রা! এমন প্রেতপ্রতিম নিশাচর তবু দৃষ্টি যেন প্রার্থনার মতো। গভীরে আমার তুমি ফুটে ওঠো ক্রমে বহ্নিমান। আত্মবিকলন অতন্দ্র প্রহরী, যেন অনুমান করতেও পারি না, কি করে উৎসরণের মুখ খুঁজে পেয়েছিলেন। উত্তমর্ণ নন বোদলেয়র কিংবা ল্যফর্গ, এমন কি আর্থার সাইমন্সের ঈষৎ মন্ত্রণাও নয়, অথবা স্বীকার্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তরুণ ছাত্র সান্ধ্য ভাষাই আবিষ্কার করেছেন ; সৃষ্টির সমীপে কবি টমাস স্টার্নস এলিয়টের অমলিন অভিযান অনিঃশেষ প্রাকৃতিক বিস্ময়েরই মতো সাতীর্থ্যে সেই অনাস্রব ধ্যানের যা যে কোন মহান্ কবিরই উপজীব্য।

নিজের স্বীকারোক্তিতেই এলিয়ট জুল ল্যফর্গ অংশতঃ করবিয়ের ও মার্লো প্রমুখ বিলম্বিত এলিজাবেথীয়দের প্রতি বিনীত প্রণাম রেখেছেন। যদিচ প্রতীকীবাদী বলেই মান্য, তবু যে আকস্মিক বৈপরীত্য, উল্লম্ফন এবং বাক্‌চাতুর্যের জন্য তিনি বিদিত তা মালার্মের থেকে জাত নয়, বরং অন্তঃশীলা একটি প্রশাখাকে আশ্রয় করেছে। শ্রীযুক্ত এলিয়টের রবিবাসরীয় প্রাতঃকৃত্য কি সম্পন্ন হত rapsodie foraine-এর অনুপস্থিতিতে? কিম্বদন্তী প্রবণতা আমার আলোচ্য কিন্তু তাঁর পৃথিবীতে অনুভবের জন্য পাঠকের প্রয়োজন আছে বোদলেয়র-ল্যফর্গ করবিয়েরে

শিক্ষিত হওয়ার।

গারট্রুড স্টাইন বলেছেন লস্ট জেনারেশন, টি. এস. এলিয়ট পোড়ো জমি। সময়ের শিলাপট ধর্ষণের চিহ্ন সংরক্ষণে অনলস, অস্তিত্বে নিয়তই হিম অগ্নির দহন, মৃত্যুর মায়াবী আমন্ত্রণ অন্যদিকে প্রশ্নেচ্ছু বিংশ শতকীয় মননে যৌক্তিকতার সমাবেশ—এই বিষম সংঘর্ষ এলিয়টকে গ্রীসের বন্ধুর এবং উপলাকীর্ণ সৈকতে স্বাগত জানিয়েছিল। অমার্জিত রিরংসাকীর্ণ অচীর দুঃসময়ের বিকল্পে চিরায়ত কাল এবং সময়গ্রন্থির উন্মীলন, ফ্লবেয়র সুলভ দ্বন্দ্বসৃষ্টি মহনীয় মনে হল, জয়েস প্রসঙ্গে মনে হল প্রাচীন মৃগয়াই স্ব-কালের ব্যর্থতাপ্রসূত অমেয় নৈরাজ্যের শ্রেষ্ঠ পটভূমি। কাহিনী গঠন অযথা বর্ণনা নয়, রোমান্টিক বা তথাকথিত কাব্যিক ঐতিহ্যের প্রতি হিংস্র কবি পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন; অশনিসংকেতের মত প্রবল তবু দ্রুত বিলীয়মান, বেদনা বিধুর আমার এই নশ্বর ধরাতলে স্মৃতির জট উন্মোচিত হতে থাকে। পরিবেশ আহরণ, তার আধুনিকীকরণ, অবশেষে মূল ধ্রুবপদের প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক কাব্যলোক: রুগ্নতা এবং শ্লেষ, লৌকিক এবং আবহমানে মর্মরিত। একমাত্র শিল্পীরই থাকতে পারে আদিমতম অভিজ্ঞান, অথচ সাম্প্রতিকতম সভ্যতার প্রথম পথিক তিনি কেননা শিল্পেরই তো করতলে ত্রিকাল লীলাময়, সে কারণে যখন মধুরীমা দেবযানী······পৃথিবীর যাবতীয় সুন্দরী অনূঢ়া কাফকা পাঠান্তে রমণসুখে লিপ্ত হয়:

"In the room the women come and go

Talking of Michelangelo"

তা সত্তেও ক্লান্তিকর টাইপিস্টটি রূপান্তরিত হতে পারে ফিলোমেলে, অপদার্থ প্রুফ্রক ভালোবাসার নামে যার সঙ্গম কখনও হ্যামলেট কখনও ল্যাজারাস। অর্থাৎ বলতে চাই কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক উপলব্ধির ফলে (যেন বা দ্বিতল গবাক্ষ থেকে চলমান জীবন নিরীক্ষণ) এক শিল্পীর ইতিহাসচেতনা মূলতঃ অবিচ্ছিন্ন। ব্যক্তি হিসেবে আমার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গান শোনা ও মিছিলে যোগদান দুটি ভিন্নমুখী কার্যক্রম। কিন্তু কবির দৃষ্টিতে অবিভাজ্য সময়স্রোতের অধ্যায় মাত্র। নাটকীয় বৈসাদৃশ্যের ইচ্ছা: ইচ্ছানুযায়ী ক্রমপরম্পরাহীন কালপর্যায়ের ক্ষণিক অবতারণা —যার মাধ্যমে এলিয়ট উপনীত হয়েছেন সমন্বিত অনুভবের (unified sensibility) অন্বিষ্টে; ইংরেজীতে হয়ত এই মনোভঙ্গীকেই বলা হয় sacramental। কি দুর্ভাগ্য! এ রহস্য হৃদয়ঙ্গম না করার ফলে উইণ্টার লিভিস, স্পেণ্ডার, রিচার্ড চেসের মত কিম্বদন্তীয় আলোচনার প্রবর্তক পর্যন্ত, এলিয়টে

অসঙ্গতি ও স্ব-বিরোধ প্রতিধ্বনিত দেখেছেন।

প্রথম জীবনে তিনি যে কটি গ্রন্থে পৌরাণিক উল্লেখ-উদ্ধৃতির প্রতি গাঢ় আস্থা জ্ঞাপন করেছেন তারা যথাক্রমে :

প্রুফ্রক এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষণ (১৯১৭)

কবিতাবলী (১৯২০)

পোড়ো জমি (১৯২২)

স্যুইনি অ্যাগোনিসটিস (১৯৩২)

প্রুফ্রকে বাঙালী ভাবাবেগের যথেষ্ট উপাদান সঞ্চিত ছিল। প্রুফ্রক : যুগক্ষুব্ধ পরিণামের ফলভোগী কোন অযোগ্য নায়ক, হতাশ প্রেমিক স্বভাবতঃ করুণার পাত্র, নির্দয় আত্মসমীক্ষা ও ব্যঙ্গ, মৌহূর্ত্তিক আবির্ভাব জন দি ব্যাপটিস্ট বা ল্যাজারাসের, তাকে তবু নির্লিপ্ত ঋত্বিকের সন্মান দেয়। আর একটি মহিলার প্রতিকৃতি : কি অনন্যতাতেই যে জুলিয়েটের সমাধি খনন! যদিবা প্রুফ্রক পরাভূত হয়েছেন, শ্রীযুক্ত অ্যাপোলিন্যাক্স কিন্তু একেবারেই দাসত্ব করেননি পরিস্থিতির। মৃদু টুং টাং শব্দ, বোস্টনের সেই সান্ধ্য চা পানের মনোরম আসরে বিদেশীটি স্মৃতিময় হয়ে ওঠে, মনে পড়ে প্রায়াপাসকে : প্রবালদ্বীপের অন্তরালবর্তী বৃদ্ধকে। এলিয়ট-প্রতিভার স্থানাঙ্ক নির্ণয়ে স্যুইনীর ভূমিকা অপরিসীম। উচ্চরোল জ্যাজের অসহ্য ঐকতান, ইঙ্গো-মার্কিন হীনমনস্কতায় বিশিষ্ট স্যুইনি ও ডোরিসের স্থূল সম্ভাষণ : এই তো মালার্মের হেরোডিয়াস বা ভালেরির চূর্ণীত নার্সিসাস-এর মত আরেক অসম্পূর্ণতা, fragments of an aristophanic melodrama, স্যুইনি অ্যাগোনিসটিস—উজ্জ্বল অতীত ও ম্লান সাম্প্রতিকের সমীকরণে করুন বিদ্রূপে মূর্চ্ছিত। তাঁর নিজস্ব অভিধানে ব্যাপৃত হয়ে দেখতে পাই বণিকনিয়ন্ত্রিত সভ্যতার চরম প্রতীক স্যুইনি নির্মনন, পাশবিক, প্রহর যাপন জন্মমৃত্যুমৈথুনে। তবে স্যুইনির কণ্ঠস্বর আরও আগেই শ্রুত হয়েছে। Sweeny Erect কবিতায় গণিকালয়ে নিদ্রোত্থিত সে পলিফেমাস হিসেবে অনুকম্পিত।

The nitingales are singing near
The Convent of the Sacred Heart
And sang within the bloody wood
When Agamemnon cried aloud,
And let their liquid sifftings fall
To stain the stiff dishonoured shroud.

আমার পাঠক ক্ষণতরে অনুমান করুন Sweeny Among the Nitingales-এর সেই রোদনভরা মুহূর্ত্তগুলি! অর্থগৃধ্নু নৃসংশতায় .জাত মানবপুত্র সুইনি কফিপানে রত, পণ্যা নারী পরিবেষ্টিত লঘু বাক্যালাপে সরব। নিশ্চিন্ত এই সুখী পুরুষের সঙ্গে কবি যোজনা করলেন পানাহার সমাপ্তীতে স্ব-পত্নী নিহত হতভাগ্য অ্যাগামেমননের। শেষ অনুচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত কবিতাটি সংশয় শিহরিত আদিম শীৎকার হয়ত। সহসা দীপ নির্বাপিত হয়; মুখশ্রীর পরিবর্ত্তন : সূর্যাস্ত মসৃণ গৃহতলে রক্তলেখা রেখে যায়। এলিয়ট, আমি আগেই বলেছি, পূর্ণাঙ্গ বর্ণনায় কালক্ষেপ করেন না বরং কালান্তক দামিনী উদ্ভাসেরই পক্ষপাতী। উদ্ধৃতির প্রথম চারটি পঙতির জন্য পাঠকের চারটি উপাখ্যানের সান্নিধ্যে আসতে হবে—ফিলোমেলের ধর্ষণ কাহিনী, খ্রীস্টের ক্রুশিফিকেশন, নেমির পবিত্র অরণ্যে পুরোহিত হত্যা এবং অ্যাগামেমননের মৃত্যু। খ্রীস্টধর্মের মর্মান্তিক পরিণতি নিরূপণ করার জন্য মানুষের ব্যভিচার ও আত্মহনন সমাধা হল একটি কনভেন্টের সন্নিকটে (একটি পঙতিই যথেষ্ট) আর রোমান্টিকতায় উদ্দাম ব্রাউনিং প্রায় সমরেখ ফলশ্রুতি অর্জনের প্রয়াসে কি অমিতব্যয়ীই না হয়েছেন Fra Lippo Lippi তে!

যে কবিতার প্রকাশে একদা দ্যুলোক ও ভূলোকে হাহাকার, আমাদের ধমনীতে খেলা করেছিল সর্বনাশ, সর্বনাশ তাই জাগরণ; আমি ওয়েস্টল্যাণ্ডে প্রবেশ করছি। এখানে এপ্রিলে যোজন যোজন বঞ্চনা; অন্ধকার বড়ো অন্ধকার। মানুষের হৃদয়ের স্বাদ, সমস্ত প্রজ্ঞান মানুষেরই মূঢ় রক্তে মুছে যায় অবিরল। কবি—তাঁর অন্তর্বীক্ষায় প্রতিফলিত হয়েছিল যেন এক নিশীথচারিণী মেরীমাতা, প্রতিদিন আত্মহত্যা; পিতৃপরিচয়হীন অব্রাহ্মণদের যন্ত্রণায় বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে। বুঝতে পারি কেন From Ritual to Romance-এর বীজ অঙ্কুরিত হল কবিতায়। জেমস ফ্রেজার ও জেন হ্যারিসন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করেন যে কিম্বদন্তী আদিম লৌকিক প্রথারই উত্তরাধিকার। তাদেরই অনুসরণে শ্রীমতী ওয়েস্টন উপরোক্ত গ্রন্থে গ্রেইলের কাহিনীটি বিশ্লেষণ করেছেন; উর্বরতা বৃদ্ধির সংকল্পে কোন অনুষ্ঠানই সম্ভবতঃ কিম্বদন্তীটির উৎস। উপাখ্যানটি তাৎপর্যে বস্তুতঃ যৌন। বীর্যবানতায় ব্যর্থ ধীবর-রাজ জীবন প্রবাহেরই প্রতীক। তার উরুদেশের ক্ষত নির্বীর্যকরণের অবগুণ্ঠন। এই কাব্যের অজস্র পৌরাণিক উল্লেখের কেন্দ্র বিন্দু এই মিথটি এবং মূল উপাখ্যান অনুযায়ী মৃত্যু নবজন্মের ইঙ্গিত। এলিয়টের

মিথচর্চায় বিনাশ ও সম্ভাবনার কারুকৃতি সর্বত্রই সাধারণ সত্য (এমন নিষ্ঠুর কবিতারও দ্বিতীয় পাতায় হায়াসিনথ তরুণীর মুখভাসে !) শ্রীযুক্ত অ্যাপ্লো-লিন্যাক্স যেমন করে প্রবাল দ্বীপের স্বপ্ন দেখে, জলকন্যা সাহচর্যে প্রফ্রকের সন্তরণ, বিশুষ্ক অধরের জিরোন্‌শন বৃষ্টিতে সংগ্রামী যুবাকে ভাবে তেমন করেই এলিয়ট লণ্ডনের নিষ্প্রাণ জনারণ্য থেকে কখন পুরাকালে অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারেন। তৃতীয় সর্গের টাইরেসিয়াসকে আমার নিজস্ব বিবেচনা, এলিয়টের শ্রেষ্ঠ প্রজনন মনে করে। টাইরেসিয়াস অন্ধ, নারীত্বে অসহায় এবং বৃদ্ধ ফলতঃ নিষ্ফল। তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা এলিয়টের অবচেতনায় যেহেতু তিনিও বিশ্বাস করেন একজন কবি অর্থাৎ দ্রষ্টা পার্থিব এই হেমন্ত গোধূলীতে নিরালম্ব, অন্তরেন্দ্রীয়বান, প্রবীণতার দ্বারস্থ। দুটি সরিস্থপের আশ্লেষে হস্তক্ষেপের জন্য নারীত্ব বরণ করতে বাধ্য ছিলেন ; জুনোর অভিশাপে অন্ধ তিনি আবার জুনোরই বরদানে ভবিষ্যতজ্ঞও। এ জন্যই তার স্বগত ভাষণ :

I Tirresias, though blind, throbing between two lives
Old man with wrinkled female breasts, Can see

প্রাগ্‌ভাষ করেছেন টাইপিস্ট ও কেরানীটির দিনগত পাপক্ষয় :

"I Tirresias, old man with wrinkled dugs
Perceived the scene, and foretold the rest

মিলন মুহূর্তে ম্রিয়মান টাইরেসিয়াস বলে চলে :

And I Tirresias have foresuffered all
Enacted on this same divan or bed ;
I who have set by Thebes below the wall
And walked among the lowest of the dead.

ভয়াবহ অবতারণা : একজন অতিলৌকিক পুরুষ যিনি যৌনতার দ্বারা বিপর্যস্ত ও মহিমান্বিত অথচ প্রত্যক্ষ করলেন একটি যান্ত্রিক অনুষ্ঠানকে ; হয়ত বিরক্তিকরও (well now that's done : and I'm glad it's over)। আমাদের ইচ্ছারা মরে যায়। এ কোন কীটের সংসার ?

Above the antique mantel was displayed
As though a window gave upon the sylvan scene
The change of philomel, by the barbarous king

So rudely forced ; yet there is the nitingale
Filled all the desert with inviolable voice
And still she cried and still the world persues,
'jug' 'jug' to dirty ears.

আবার মুহ্যমান হয়ে পড়ি। ব্যথায় দীপ্যমান ফিলোমেল, ওভিদের উত্তরসূরীত্ব, মিল্টনের অনুষঙ্গ (Sylvan Scene) ডুবে গেল চটুল গানের সুরে।

নিজের ইতিহাসবোধ ও বৈপরীত্য, নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃজনে ধ্রুপদী সাহিত্য ও পরিত্যক্ত জনপদে পর্যটন এলিয়টের আজীবন স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী-কালের কবিতা ও কাব্যনাটক আপাতত উহ্য রইল। বিচ্ছিন্ন উদ্ধারেই শিল্পের মিথুন; বৈশিষ্ট্য যে একটি কাহিনীর পূর্ণাবয়বকে ব্যবহার করেননি। বিলুপ্ত স্বর্গের জন্য রাবীন্দ্রিক বন্দনা নয়, আরও তীব্রতম উপলব্ধি ধ্বংসকালীন অপরাহ্নের। রোমান্টিকদের কালচেতনা অনেকাংশেই সর্গবদ্ধ। বর্তমানকে বিস্মরণের উদ্দেশ্যে স্বপ্নলোকে তাদের অজ্ঞাতবাস। এলিয়ট অপরদিকে জানেন অতীত বাসভূমি নয় আর; তাই মানচিত্রে স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত একাকার; কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ভ্রমণ মাত্র।

আজকে এপ্রিল। আর বিরহ অনুভব করি না। আর প্রথম মুগ্ধতা নেই। ইতিমধ্যে জেনেছি, দ্বিতীয় ঈশ্বরের মতো যাকে মনে হয়েছিল, তিনিও পরাজিত পৌরুষ। অনিবার্য প্রলয় বিশ্বাস করেও পরিত্রাণের পথ খোঁজেন মহামান্য সম্রাটের দম্ভিত প্রতাপে; জীবনভিক্ষা করেন বাইবেলের মত হাস্যকর গ্রন্থে। সাতটি তারার তিমির তাঁর প্রতিকৃতি সরিয়ে দিলো খুব সহজেই। কেমন করে ভুলব তবু এক ষোড়শ বর্ষীয় কিশোরের কি অবিশ্বাস্য ঋত মনে হয়েছিল তাঁকে শিল্পের শরীরে! ঐতিহ্য ও প্রাতিস্বিক প্রতিভার কাছে তো আমার ঋণ। ঋণ আমার জন্মের।

আমার দুঃখ শূন্যতায় ছড়িয়ে দিলেন কবি।

ছবি দেখা বই পড়া

Give to the theater and to the novel that which is theirs and to the Cinema that which can never belong elsewhere.

আঁদ্রে বাজাঁ।

প্রয়াত বুদ্ধদেব বসু যখন তাঁর কোন রচনায় চার্লস্ চ্যাপলিন প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে বুদ্ধদেব আসলে সাহিত্য-সমালোচক, মঁসিয় ভের্দু তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের সেতু-প্রান্তে। প্রথম পর্বের শেষ বাক্যটিই তো তার নিশ্চিত অভিজ্ঞান—কেননা চ্যাপলিনই একমাত্র, যিনি ঔপন্যাসিকের মন ও অভিপ্রায় নিয়ে চলচ্চিত্র রচনা করেছেন।

চ্যাপলিন ধ্রুপদী যুগের প্রতিনিধি এবং অবশ্যমান্য—যদিও বুদ্ধদেব উক্ত প্রবন্ধেই অবগত যে জয়েস থেকে আধুনিক উপন্যাসের নানাবিধ রূপান্তর ও সম্প্রসারণ ঘটেছে তবু তিনিও দাবি করেননি যে গঠনপ্রক্রিয়ার দিক থেকে চার্লি চ্যাপলিন কাফকা কিংবা জিদ অথবা আরও পিছিয়ে নোটস্ ফ্রম দি আণ্ডারগ্রাউণ্ডের জনয়িতার আত্মীয়—তাঁর প্রকরণগত ঋণ উনিশ শতকের সাধারণ উপন্যাসের কাছে। চার্লি তখন সক্রিয় সম্রাট, সিনেমা তখন কৈশোরে; বুদ্ধদেবের রচনাবর্ষ ১৯৪৯-এ।

ইতিমধ্যে অনেকবার সূর্যের উদয় ও অস্ত হল। সিনেমা কি স্বাধীন হল? এখনও কি একজন পাসোলিনি বা কোন বুনুএলকে প্রণতি জানাতে গেলে আমাদের বলতে হবে তাঁরা মূলত উপন্যাসকার: কলমের বদলে ক্যামেরাকে ব্যবহার করেছেন শুধু? আমি স্পষ্ট করেই বলতে চাইছি ছবিতে এখনো কি একটি গল্প বা কাহিনী (ন্যারেটিভ)-কে উনিশ শতকীয় রীতিতে নিখুঁত, নিটোল, নরম, সাদা থাকতেই হবে? আর তাহলে চলচ্ছবিকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও স্বয়ম্ভর একটি শিল্পমাধ্যম বলার চাইতে আলোকিত কথকতা মনে করাই বোধ হয় সঠিক। তাই কি?

সংবাদ বা অনুরূপ প্রতিবেদন শিল্প হয় না। কিন্তু কয়েক বছর আগে চুন্নীর

প্রহরে উষ্ণ হতে হতে আমরা অনুভব করেছিলাম খবরের কাগজও কতখানি জ্যান্ত ও বাঙ্ময় হতে পারে। এই তো হিংস্রতার নন্দনতত্ত্ব; ইনি ফার্নান্দো সোলানাসই আইজেনস্টাইনের প্রকৃত উত্তরসূরী : তাঁর আরব্ধ প্রকল্প ক্যাপিটালকে রূপ দেবেন। আর গোদার তো আছেনই, জঁা-লুক গোদার, আশিরপদনখে ছন্নছাড়া এক প্রাবন্ধিক। কি আর অবশিষ্ট থেকে যায় একজন ঔপন্যাসিকের জন্য যদি শব্দহীনভাবেই একটি করিডোর উন্মুক্ত হয়ে ওঠে ও সামান্য একটি দৃশ্যানুভূতি বর্ণনা করে যায় নারীবাহুর সৌন্দর্য—বার্গমানের 'সাইলেন্স' দেখার পর এক বিদেশী লেখক মন্তব্য করেন। কর্ডেলিয়ার মৃত্যুর পর কিং লিয়ারের ক্যামেরা শূন্যতা ও সমুদ্রকে হৃদয়ঙ্গম করলে শেক্সপীয়রের সঙ্গে অন্তত অনুচ্চস্বরেও কথা বলে ওঠেন কোজিনেৎসেভ। জঁা ককতোর কবি পুরুষ যুগপৎ মৃত্যু ও কবিতার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে পারির রেস্তোরাঁতে। আন্তোনিওনির বিখ্যাত নৈঃশব্দসমূহের কোন গদ্যরূপ হয় কিনা আমাদের জানা নেই। সুবর্ণরেখা কি উপন্যাস বা গল্প আকারে প্রকাশিত হতে পারে? মনে হয় না। লা দলচে ভিতা অথবা উগেৎসু মনোগাতারি এবং অপরাজিতর মতো ছবি যে ভাষায় কথা বলে তা নিশ্চয়ই অন্যান্য শিল্পমাধ্যমগুলির পক্ষে অনুচ্চার্য কিন্তু সিনেমার মাতৃভাষা।

এসব কথা উঠছে, বলাই বাহুল্য, তার প্রসঙ্গ চলচ্চিত্রের স্বায়ত্তশাসন। সমস্যাটা তত সহজ নয় অন্তত এত সহজ নয় যে চট করে কোন রায় দিয়ে দেওয়া যাবে। যেমন বলা যায় নাটকের ক্ষেত্রে। বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে। কিন্তু নাটকের সঙ্গে যার হর-গৌরী সম্পর্ক এবং উপন্যাস যার কাছে আদৌ পরপুরুষ নয় সেই সিনেমা আমাদের অস্বস্তিমুক্ত হতে দিচ্ছে না কিছুতেই। কেউ কেউ, যেমন রব গ্রিয়ে, উপন্যাস ও চলচ্চিত্রে সব্যসাচী। ভাবা যেতে পারে ট্রায়ালের মত আধুনিক মহাকাব্যকে নিয়ে অরসন ওয়েলসের প্রয়াসের কথাও। তবু উপন্যাস ও সিনেমার এইসব প্রণয়কূজন এখনও পর্যন্ত কোন সুস্থ অথবা স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়নি।

চলচ্চিত্র আলোচনার সংকট হচ্ছে যে সে কবিতা নাটক গদ্য শিল্পের তুলনায় অভিজ্ঞতায় অত্যন্ত নবীন ও প্রায় সে-কারণেই অদ্যাবধি তার কোন পরিচ্ছন্ন নন্দনতত্ত্ব নেই। এলিয়ট বা কডওয়েল পাঠকের কাছ থেকে যতখানি সমীহ ও মনোসংযোগ আদায় করতে পারেন, রবিনউড বা টম মিলনে তা সঙ্গতভাবেই পারেন না। ফলে সহসা কোন পলিন কায়েলের সমুদ্রোত্থিতা ভেনাসের মত

নগ্ন ও চিক্কণ মন্তব্য দেখে মনে হয় ইমপ্রোভাইজেসন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চমকপ্রদ তবু গভীরতা কিংবা দিক্‌-নিরূপণের সহায়ক নয়। পার্কার টাইলারের মতন কেউ আন্তোনিওনি-বার্গমান নিয়ে ভাবতে গিয়ে যখন আক্ষেপ করেন যে সিনেমাকে এখনও পর্যন্ত কল্পনা-মনীষার সন্তান না ভেবে নাটক ও উপন্যাসের তর্জমা ভাবা হয় ও ফিল্ম সমালোচনা এখনও সমালোচনার পরিবারে সতীন-পুত্রের বেশী কিছু নয় তা না মেনে নিয়ে আমাদের উপায় থাকে না। মহৎ চলচ্চিত্র অনেক হয়েছে, তা নিয়ে লেখালেখিও হয়েছে বেশ কিছু, কিন্তু প্রায় নগণ্য ক্ষেত্রেই তা মেধার ছোঁয়া পেয়ে উজ্জ্বল।

বাস্তবিক উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রের পৃথকীকরণ জরুরী। উপন্যাসের সমস্যা কোথায়? বাস্তবতা নির্মাণে। শুধু শব্দ, গদ্যের আর কোন রঙ নেই। ফিল্ম সে তুলনায় নাটকের চাইতেও অনেক স্বাধীন। স্বাধীনতার অনাহুত স্বচ্ছলতা প্রকৃত ছবিকে মারাত্মক সমস্যার দিকে টেনে নেয়। এখানে বাস্তবতা এত বেশী, এত দ্রুতলভ্য যে চলচ্চিত্রকার মর্মে মর্মে জেনে যান যে বিনষ্ট বাস্তবতাতেই তার মুক্তি। সিনেমা আর বই আলাদা হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই মান্য যে শিল্পের বাস্তবতা কখনোই প্রথম স্তরের নয়। একটি প্রকল্প থেকে জাত। সেই অর্থে কৃত্রিম।

আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু কতটা? চলচ্চিত্র, ও সাহিত্যের দূরত্ব প্রায় গুহাচিত্র ও গানের মতই—নরমান মেইলারের এ জাতীয় মন্তব্য অবশ্যই বাড়াবাড়ি রকমের ইয়াঙ্কিপনা; আমরা বরং অধিকতর আগ্রহে বিশ্বাস করব বার্গমানকে যিনি অবশ্যই মহৎ চলচ্চিত্রের জনয়িতা অথচ তাদের গোপন সুরঙ্গলালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ সাহিত্যের সঙ্গে। তাঁরও ধারণা—গ্রন্থভিত্তিক চলচ্চিত্র রচনা আমাদের পরিহার করতে হবে। কোন সাহিত্যকর্মের পরাযৌক্তিক মাত্রা, তার অস্তিত্বের অঙ্কুর, প্রায়শই চোখের ভাষায় অনুবাদের অতীত এবং এই বর্ণান্তরণ ফিল্মের বিশিষ্ট পরাযৌক্তিক মাত্রাসমূহকেও নাশ করে। জনৈক বার্গ-মান চরিত্র তো একবার পিকউইক পেপারস্‌ পড়তে পড়তে ঘুমিয়েই পড়ে। অপরদিকে শ্রীমতা ভার্জিনিয়া উলফ, দেখতে পাই, শব্দের দ্বারা যা গম্য সেই জগতে প্রবেশ না করতে চলচ্চিত্রকে নির্দেশ দিচ্ছেন। আর এই নির্দেশে চলচ্চিত্রকার যে অসহায় বোধ করেন তাও নয়। না হলে আর আলঁ্যা রেনে সফল উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়নের সম্ভাবনাকে খাদ্যবস্তুকে পুনর্বার গরম করার সঙ্গে তুলনায় তাচ্ছিল্য করবেন কেন? মতামতের তালিকা রচনার চেষ্টা থেকে

সরে এসে, আমার মনে হয়, ইর‍্যাশনাল মাত্রা কথাটিকে একটু পরীক্ষা করা দরকার। ইর‍্যাশনাল বলতে কি বোঝান হচ্ছে? আমরা মনে আনতে পারি মানিকবাবুর পুতুলনাচের ইতিকথা। হে পাঠক, আপনি যদি বাংলাদেশের আকাশ, মৃত্তিকা, আলো ও নারীকে একবারও ভালবেসে থাকেন তবে আপনি বোধ হয় অনুমতি দেবেন না "শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম!" অংশটির চিত্রনাট্যে রূপান্তরে। উল্টোদিকে স্বয়ং বার্গমানেরই হিমরশ্মি (উইণ্টার লাইট) দেখে আমাদের উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না যে ধর্মযাজক টোমাসের যন্ত্রণার সারাৎসার ততটা ষ্ট্রিণ্ডবার্গ বা কিয়ের্কেগার্দে নয় যতটা কারামাজভ পরিবারের মধ্যম ভ্রাতা কথিত গ্র্যাণ্ড ইনকুইজিটর পর্বে সংহত হয়ে আছে। তবু অন্য পরে কা কথা, দস্তয়েভস্কি নিজেও বোধ হয় সেই গম্ভীর মৃত্যু, লংশট ও প্রপাতধ্বনির অনুষঙ্গ চিন্তা করতেন না; এই অংশটুকু সিনেমাকে স্বগুণে উত্তীর্ণ করে। কাম্যুর আউটসাইডারের চলচ্চিত্রায়নের সময় উপন্যাসটির আক্ষরিক অনুবাদের অযথা দায়িত্ব নিয়ে ভিসকন্তির বিপত্তি একটি সমীচীন দৃষ্টান্ত হত; উপন্যাসটি কুড়ি শতকের একটি ধর্মগ্রন্থসদৃশ অথচ ফিল্মটি নির্জন রৌদ্রে ও গাঢ় নীলিমায় আমাদের মৌহূর্তিক অন্যমনস্কতাও দেয় না। তবু ভয় হচ্ছে পাঠক আমাকে ভুল বুঝতে শুরু করেছেন। আমি বলতে চাই না যে ফিল্ম অযোনিসম্ভূত—উপন্যাসের সঙ্গে চলচ্চিত্রের কোন সম্বন্ধ নেই। অবশ্যই রয়েছে—সম্বন্ধ রয়েছে—কিন্তু প্রসিদ্ধ, প্রকটভাবে নেই। পদার্থবিদ্যা প্রসূত প্রকৌশলের বিচিত্র উদ্ভাবনসমূহের ঋণ স্বীকার করেও ফিল্ম আজও সাহিত্যকে আদিমজননী হিসেবে প্রণাম করে কেননা ফিল্ম শেষপর্যন্ত ক্র্যাফ্‌ট নয় এবং পরিচালককে কারিগর মনে করার ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি বরং স্মরণে আনব আইজেনস্টাইনের ডিকেন্স গ্রিফিথ ও আজকের চলচ্চিত্র নামের প্রবন্ধটিকে। চলচ্চিত্রের পোয়েটিকস্‌কার এই অসামান্য স্রষ্টা ছাড়া কে দেখাবেন যে গ্রিফিথ মন্তাজ প্রণালী আয়ত্ত করেছিলেন প্যারালাল অ্যাকশনের তত্ত্বের মধ্য দিয়ে ও তাঁর প্রেরণা ছিল ডিকেন্স। তাঁর কাছে পাঠ নিয়েই আমরা শিক্ষিত হই যে চরিত্রসমূহও কত প্লাষ্টিক ও অপটিক্যাল হতে পারে। তবু একই সঙ্গে, যুদ্ধজাহাজ পটেমকিনে ওডেসা সিঁড়ির সিকোয়েন্স দেখে কি মনে হয় নি শিল্প এই প্রথম আরেকরকম উৎসারণের মুখ পেল?

আমি একটু আগেই বলবার চেষ্টা করেছি যে ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্রের সহজ ও অতিরিক্ত অবজেকটিভিটি চলচ্চিত্রের পক্ষে শিল্পে উত্তরণের অন্যতম প্রধান

প্রতিবন্ধক; অন্যদিকে শব্দ, রঙ, কণ্ঠস্বর ও দেহভঙ্গী কখনোই তত বস্তুনিষ্ঠ নয়। এ বিষয়ে মতান্তর থাকার কথা নয় যদি বলি একজন চিত্রকরের কোন চিত্র, যেমন দ্যলাক্রোয়ার ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অশ্ব, অনুরূপ একটি ফটোগ্রাফের তুলনায় অনেক বেশী শিল্পিত। সেদিক থেকে প্রায় মেরুপ্রমাণ পার্থক্য থেকে লক্ষ্যমুখে শরযোজনা ফিল্ম ও উপন্যাসের। এবার তাহলে উভয় শিল্পকর্মের শরীরে আরেকটু তদন্ত চালানো যাক। উপন্যাস ও চলচ্ছবি, দুই-ই, সময়ভিত্তিক শিল্প। কিন্তু উপন্যাসের গঠনসূত্র যেখানে কাল; চলচ্চিত্রের সেখানে দেশ। কেন আমরা এরকম দাবি করছি? গণিতের সাহায্য নিয়ে বলা যাক দেশকে ধ্রুবক হিসেবে ব্যবহার করে উপন্যাস সময়ের মানসমূহের নিয়ন্ত্রিত বিন্যাসে আখ্যান নির্মাণ করে। অপরদিকে কালকে ধ্রুবক মেনে চলচ্চিত্র দেশের মান-সমূহের বিন্যাসে নিজের অবয়ব রচনা করে। দুটি শিল্পরূপই মানসিকভাবে স্থান কাল চূর্ণ করার ভ্রম বিস্তার করে। ভ্রমই বলবো কেননা প্রকৃত অর্থে কেউই স্থান ও কালের বিকার ঘটায় না। উপন্যাস যেখানে কালনির্ণায়ক স্থানাঙ্কসমূহের চলাচলে দেশের ভ্রম প্রস্তুত করে, চলচ্চিত্র সেখানে দেশনির্ণায়ক স্থানাঙ্কসমূহের পরিক্রমায় সময়ের ভ্রম প্রসব করে। আমরা, অতএব, সিদ্ধান্ত নিতে পারি উপন্যাস ও চলচ্চিত্র যথাক্রমে মনস্তাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক বিধিগুলির প্রতিপালন ও সম্প্রসারণ ঘটায়।

এরকম খটোমটো অনুচ্ছেদ! খুবই লজ্জা লাগছে। হয়তো একটি উদাহরণ দিতে পারলে পাঠকের ভ্রূ-কুঞ্চন থেকে এ যাত্রা উদ্ধার পাওয়া যাবে। অভিজ্ঞতাটা আলঁ্যা রব গ্রিয়ে, খুবই নামী জনৈক ফরাসী ঔপন্যাসিকের। আলঁ্যা রেনের মারিয়েনবাদে গত বছরের চিত্রনাট্য সমাপ্ত করার পর তাঁর মনে হয়েছে সাহিত্যের তুলনায় ইমেজের সীমাবদ্ধতা এইখানে যে তা কালের তিনটি স্তরকে প্রয়োগ করতে পারে না; বর্তমানকালের পরিধিতেই বন্দী থাকে।

না বললেও চলে, ফিল্ম বিশেষভাবেই একটি কুড়ি শতকীয় ঘটনা কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা খেয়াল করিনি বা এড়িয়ে গিয়েছি চলতি শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই গদ্যশিল্পের অভ্যুত্থান শুরু হয়ে গিয়েছে। ইউলিসিস প্রকাশিত হওয়ার পর বিপ্লবের জয় সুনিশ্চিত হল। প্রমাণ পাওয়া গেল উপন্যাসেরও কোন দায় নেই প্লট বা চরিত্র ও প্রচলিত কালজ্ঞানের দাসত্ব করার। এই তাৎক্ষণিক উপপাদ্যকে অতিক্রম করে অনতিকালের মধ্যেই আমরা জয়েস, কাফকা ও অন্যান্য মহারথীদের সৃজনকর্ম থেকে যে দুটি পরাক্রান্ত অনুসিদ্ধান্তে উপনীত

হই, তা-ই এই শতকের শিল্পের ইতিহাসে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অবদান। প্রথমত দেখা গেল শিল্প আজ বিষয় নয়, রূপ নয়, প্রধানত বক্তব্য নিয়ে চিন্তিত। স্ব-প্রয়োজনেই সে প্রবন্ধধর্মী, সমালোচনামূলক, ডায়লেকটিক্যাল। যেমন কাফ্‌কা। এবং দ্বিতীয়ত তাঁর সম্প্রসারণেচ্ছা। জয়েসের লেখা থেকেই বুঝতে পারছি গদ্য কি ভাবে কথ্যধ্বনি ও সংগীতের হাতছানিতে সাড়া দিচ্ছে। অর্থাৎ উপন্যাস আর নেহাৎ উপন্যাস নয়, অন্যান্য শিল্প-মাধ্যমের পরিকল্পিত আত্মসাতে মিশ্ররীতির ও সমন্বয়ধর্মী। কি চমৎকার ভাবেই না দীর্ঘদিন পরে আত্ম-পক্ষের বিবৃতি দিয়েছেন ঋত্বিক ঘটক: "ছবিতে গল্পের যুগ শেষ হয়ে গেছে; এখন এসেছে বক্তব্যের যুগ। শুধু ছবির কথা কেন বলব, সব শিল্পেই এই বিবর্তন ঘটেছে। বহু আগে জেমস জয়েস তাঁর ইউলিসিস উপন্যাসে এই ধারা এনেছিলেন; বেরটল্ড ব্রেশ্‌ট তাঁর ড্রামস ইন দি নাইট নাটকে এই ধারার প্রবর্তন করেন ১৯১৮ সালে।" ঋত্বিকের সঙ্গে একমত হয়েও আমি বিনীতভাবে যুক্ত করতে চাই ছবিতে পিকাসো এই চেতনায় আগেই জারিত ছিলেন। আপলিনেয়ার সে যুগেই 'আধুনিক চিত্রকলার বিষয়' নামের একটি নিবন্ধে পিকাসোকে পরীক্ষণীয় ভেবে মন্তব্য করেন—বিষয়ের আর কোন মূল্য নেই। আমার মনে হয় এই বাক্যটি আমাদের আধুনিকতার যোনিমূলে পৌঁছে দেয়। আপলিনেয়ার নিজেও কাব্যে প্রসারণেচ্ছু ছিলেন; দুর্ভাগ্যজনকভাবে শুধু প্রকরণগত দিক থেকে। আধুনিক কবিতার বক্তব্যধর্মী প্রবণতা বরং উজ্জ্বল হয়ে থাকে মায়াকোভসকির পাৎলুনপরা মেঘ, এলিয়টের পোড়ো জমি, লোরকার নিউইয়র্কের কবিতা ও জীবনানন্দের সাতটি তারার তিমিরে। জ্যাকোমেত্তি যেমন ভাস্কর্যকেও সমালোচনামূলক করে তোলেন, আর সংগীতে জন কোলট্রেনের মতন কারুর ক্রোধই বক্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক শিল্পচেতনার উত্তরণের ইতিহাস তথাপি অনুমেয়ভাবেই আমাদের অনুচ্ছেদের মতন সংক্ষিপ্ত ও নিশ্চিত নয়।

তথ্যগতভাবে আকর্ষণীয় মনে হতে পারে উপরোক্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে জয়েস সিনেমার প্রকৌশল সম্বন্ধে উৎসুক হয়েছিলেন; তাঁর আশা ছিল ইউলিসিসের চলচ্চিত্রায়ণ আইজেনস্টাইনের পক্ষে সম্ভবপর, যদিও পরে এই মহান পরিচালকের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় তিনি এ প্রচেষ্টার সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন। চলচ্চিত্রবিষয়ে কাফ্‌কার অনীহা সুপরিজ্ঞাত। মায়াকোভসকিকৃত কতিপয় চিত্রনাট্যে প্রতিভার বিচ্ছুরণ হয়েছিলো এবং আপলিনেয়ার নবাগত ফিল্ম-মাধ্যমের দ্বারা

কবিতার গর্ভাধান সম্ভাবনায় যে কি পরিমাণ উৎফুল্ল ছিলেন তার স্বাক্ষর উৎকীর্ণ আছে কবির 'নতুন চেতনা ও কবি-সমাজ' নামীয় প্রবন্ধে। অনেক শিবের গীত গাওয়া হল, এবার আবার ধানভানার কাজ শুরু করি।

ইতিহাসের বিচারে চলচ্চিত্র তরুণতমা; সুতরাং তার যৌবনচিহ্ন ফুটে উঠল আরও পরে উত্তরপঞ্চাশে। যুদ্ধের ঠিক পরের নব-বাস্তবতা ও এদেশে অতিখ্যাত বাইসাইকেল চোর যেন বয়ঃসন্ধিকাল, চিন্তাগত দিক থেকে কৃশতনু, কাহিনীর স্নেহাঞ্চলের প্রতি শেষবারের মত মমতাপ্রবণ, মনোরম। ততক্ষণে সিনেমা নিজেকেও আরও বড় অভিজ্ঞতার দ্বারা স্পৃষ্ট হতে প্রস্তুত করে নিয়েছে। পাঁচ ও পরবর্তী ছয়ের দশকটি যেন তার স্বয়ংবর সভা। উপস্থিত রাজকুমারদের মধ্যে আছেন প্রায় প্রৌঢ় ককতো, পুনরুত্থিত বুনুএল, দার্শনিক বার্গমান, সিনেমার খাতার পঞ্চ-পাণ্ডব বিশেষত গোদার ও ক্রুফো, বুদ্ধিজীবী রেনে, ইতালীর নক্ষত্রত্রয়ী ফেলিনি-আন্তোনিওনি-পাসোলিনি, তুলনায় ম্লান ভাইদা ও একবিন্দু উৎকর্ষের মতো পোলানস্কি প্রমুখ। আমাদের মেনে নিতে হল গতানুগতিক পন্থায় আর জীবনের তর্জমা সম্ভব নয়; ভগ্নাংশে বিভাজিত আধুনিক মননকে রূপ দিতে চাইলে, চিত্রকলা ও সাহিত্যের মতই চলচ্ছবিকেও ছকে বাঁধা রৈখিক অগ্রস্থতির ধ্রুপদী স্বভাব বিস্মৃত হতে হবে। আজ চলচ্চিত্রের স্বকীয়তা এমনই স্বাভাবিক যে এই তো সেদিন বার্গমানের বুনো স্ট্রবেরী (-তে কাঁটাহীন ঘড়িটি আবার দেখে আমার নিজেরও মনে পড়লো না মাত্র এই একটি উপলব্ধিতে পৌঁছবার জন্য ফিল্মকে বরণ করে নিতে হয়েছে পঁয়তিরিশ বছরের সংগ্রাম; ঠিক ১৯২২ সালে ইউলিসিস গ্রন্থবদ্ধ হয়। অবশ্য রেনের কথাও বলা যেতে পারত। কিন্তু হিরোশিমা মন আমুর ও মারিয়েনবাদ জয়েসের বহিরঙ্গের যতিবিন্যাসের অনিয়মে যতখানি মগ্ন হয়েছে, আত্মার রহস্য ততখানি বিদ্ধ করতে পারেনি। বারে বারে আমি জয়েসের নাম করছি তাতে এ রকম ধারণা হওয়ার কারণ নেই যে উপন্যাসে জয়েসই এক ও একমাত্র পূজনীয়। অন্যান্যরাও আছেন দিন ও রাত্রির মত সত্য হয়ে। কিন্তু এই শতকে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে এই স্বেচ্ছা-প্রবাসী ডাবলিনরাই সর্বাধিক তীব্র অগ্ন্যুৎপাত; অন্যান্য বিপ্লবগুলি সমান প্রভাবশালী হলেও অনেক অন্তঃশীলা। যেমন কাফকা, কাম্যু, ফকনার। আধুনিক গল্পশিল্পের ক্রমবিকাশ আমাদের আলোচ্য নয়। আর মনে রাখা জরুরী যে উপন্যাস সিনেমার উত্তমর্ণ, এ ধারণার অবসান ঘটিয়ে দিয়েছিলেন যদিও জয়েস স্বয়ং, পরবর্তীকালে

বারোজ-রীতি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সিনেমা কি প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যকে ধার দিতে শুরু করেছে।

সাগর পারের উপাখ্যান আপাতত অসমাপ্ত রেখে স্বদেশে ফিরে আসি। ইংরেজরা উহ্য কথাটি যে ভাবে ব্যবহার করে থাকেন সেভাবে ও দৈবক্রমে প্রথম স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় ছিলেন প্রতিভাবান। আজ পর্যন্ত সত্যজিৎ বাবুর ছবি আদিমধ্য-অন্তযুক্ত সাহিত্যের কাঁধে ভর দিয়েই চলেছে, তবু তাঁর চেতনা ও জিজ্ঞাসা এত মহান ও অনমুকরণীয় ছিল চারুলতা পর্যন্ত, যে এ আলোচনায় তাঁর অন্তর্ভুক্তি ঘটতে পারে না। তাঁর উত্তরাধিকারের দিকটিই বিপদের; রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে যা ঘটেছিল। 'অঙ্কুর' এবং 'দূরত্ব', 'ঘটশ্রাদ্ধ' বা '৩৬, চৌরঙ্গী লেন' কিংবা 'মালঞ্চ' এবং 'অন্তর্জলী যাত্রা' দেখে কি মনে হয় না তথাকথিত নব প্রজন্মের নন্দনতত্ত্ব তাঁর বন্দনা করেই পরিতৃপ্ত? পথের পাঁচালির সুর শুনে যে ঘুম ভেঙেছিল সেই ঘুমই তাদের রমনীয় হয়েছে, জন্ম নিয়েছে এক পরিচ্ছন্ন মতিভ্রম যে একটি সুন্দর কাহিনীকে সুন্দরতর চিত্রনাট্যে সাজিয়ে সুন্দরতমভাবে বলতে পারলেই বোধহয় শিল্প নামের প্রণয়িনী ধরা দেবে নিশ্চিত বাহুবন্ধে। অথচ যে কোন নির্বুদ্ধিজীবীর পক্ষেও যা জলের মতো সরল তা হচ্ছে সত্যজিত রায়ের উত্থানের পরে ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র নির্মাণ যতটা সহজ, তার চাইতে অনেক বেশী কঠিন ও দায়িত্বনির্ভর হয়ে গিয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে সত্যজিৎউত্তর যুগে আমাদের চলচ্চিত্রের যে বিস্তৃতি তা নিতান্তই আয়তনের, অঙ্কের ভাষায় হরাইজনটাল কিন্তু গভীরতার অর্থাৎ ভার্টিকাল নয়।

আমি মনে করি আকাশে যে তারাটি আরও জলজল করছে তাকে ঋত্বিক কুমার ঘটক নামে চিহ্নিত করা যায়। সত্যজিৎ সেখানে মুগ্ধ করেন, ঋত্বিক সেখানে বিব্রত করেন। তাঁর শীর্ষদেশে প্রথমজন রক্তস্রোতে বেজে ওঠেন সুদূর গীতিকবিতার অব্যক্ত চরণবন্ধের মতন কিন্তু চিন্তিত করেন না। একজন আধুনিকের পক্ষে তাঁর প্রেমে না পড়ার এর থেকে বড় কি কারণ থাকতে পারে? ঋত্বিক কিন্তু প্রথমত ও প্রধানত মননশীল, বস্তুত দর্শনমদির। একটু সাহস করেই আমি বলতে চাই চলচ্চিত্রীয় সম্প্রসারিত বক্তব্যের রাজসিক মহিমা প্রথম ঋত্বিকনাট্যেই উদ্‌ঘাটিত হল। গল্প যেহেতু গৌণ, চিন্তাটাই আসল—এমন কি উপলক্ষ; সুতরাং সাহিত্যাশ্রয়ী প্রবণতা ঋতুস্তব্ধা মহিলার মতোই ব্যর্থ মনে হল তাঁর। এখানে অবশ্য ঋত্বিক প্রণীত "বাংলা ছবি ও

বাংলা সাহিত্য" থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারত। স্থান সংক্ষেপ, দরকার নেই। মেঘে ঢাকা তারা বা সুবর্ণরেখায় গল্পাংশ অত্যন্ত দুর্বল। কোমল-গান্ধারে তো গল্পই নেই প্রায়। অধিকন্তু পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র বলতে যদি "ফিল্ম ফর্মটির অবকাশ বাড়িয়ে নতুন আয়তনের পরিধিতে ব্যাপ্ত করে দেওয়ার প্রচেষ্টা" বোঝায় তবে কোমলগান্ধারই অদ্যাবধি এদেশে সম্পন্ন একমাত্র পরীক্ষা। আর এই প্রসঙ্গে ঋত্বিকই পথিকৃৎ, গোদার নন। মুখে যাই বলুন না কেন, খুব সহজেই প্রমাণ করা যায় নিছক সিনেমার মোহমুক্ত হতে গোদারকে তেষট্টি সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে আর ঋত্বিক ষাট সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মেঘে ঢাকা তারাতে মুদ্রিত করেন অতিরঞ্জনের বর্ণমালা ও একষট্টির কোমলগান্ধারে চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে সার্বভৌম প্রবন্ধ রচনা করেন।

পল ভালেরি, আমাদের পক্ষে মান্য এক কবি, একদা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন চলচ্চিত্র, এমন এক শিল্পকর্ম যা শুধু বাস্তবতার উপরের স্তরকেই আঁচড়াতে পারে তার পক্ষে প্রকৃতই শাশ্বত হওয়া সম্ভব কিনা—সে প্রসঙ্গে। আমার মনে হয় ঋত্বিকের বিপ্লবের সঠিক তাৎপর্য নিরূপণ করতে হলে এই উদ্বেগটুকু ভিত্তি-ভূমির সম্মান পাবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আজও তিনি আমাদের রক্ত ও চেতনায় প্রবেশ করেননি। মণি কাউল, কুমার সাহনি, সঈদ মির্জা ও জন আব্রাহাম প্রমুখ পরিচালক যারা ঋত্বিক ঘটকের শিষ্য হিসেবে পরিচয় দিয়ে অহঙ্কার বোধ করেন তারা এমন কোন চলচ্চিত্রের জনয়িতা নন যাকে যথার্থ গুরুদক্ষিণা বলা যায়।

বাকী থাকছে আমাদের সমালোচনা। এই লেখার শুরুতে বুদ্ধদেব বসুর কথা শুধু এ কারনে স্মরণ করিনি যে স্খলিতদন্ত অধ্যাপকসঙ্কুল এই দেশে তিনি এক বিরল দৃষ্টান্তের শিল্প সমালোচক, এবং এ কারণেও নয় যে চার্লস চ্যাপলিন নামের ছোট লেখাটিই বাংলা ভাষায় উপন্যাস ও চলচ্ছবির সম্পর্ক সন্ধানে প্রথম মূল্যবান ভিত্তি কিন্তু মুখ্যত এটা বোঝাতেই যে লেখাটির গুণ ও ত্রুটি তরলিত হয়ে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, আজ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করেছে আমাদের চলচ্চিত্রবোধের সীমারেখা। সাহিত্যের দীপ থেকেই নতুন প্রদীপ জ্বালিয়ে নেওয়া যায়—চ্যাপলিন পেরেছিলেন, সত্যজিৎবাবুও পারেন। বিপদ দেখা দেয় সাহিত্য কম বেশী নিরঙ্কুশ নিক্তি হয়ে উঠতে থাকলে। পৃথিবীর অনেক ছবিরই স্বাদ ও মর্ম অবোধ্য ও পরিত্যাজ্য বলে মনে হতে থাকে। জাঁ-লুক গোদার হয়ত বেঁচে যান সাহেব বলে, কিন্তু সঙ্গতিহীনতা, অতিনাটকীয়তা, সমাপতন, বিবৃতি-

প্রবণতা, মাত্রাবোধের অভাব—ইত্যাকার মূঢ় ও ম্লান শব্দাবলী আড়াল করে রাখে ঋত্বিক ঘটককে। এরা অনেকেই শ্রদ্ধেয় নানা কারণে, তবু প্রায়ই শিল্পের ভেতরে নিজেদের সংস্কারের জট দেখেন বেশী—শিল্পী, একজন মহৎ শিল্পী কিভাবে তার উপকরণ প্রয়োগ করেছেন সেটাকে ততটা নয়। এমনকি চারুলতা জনসাধারণ্যে প্রদর্শিত হওয়ার পর বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে যে অসম্মতি ফেনিল হয়ে উঠেছিল তার কারণ ততটা নয় যে মূল গল্পের মানবিক সম্পর্কের বিষণ্ণ গভীরতাটুকু লঘু হয়ে এসেছে যতটা নষ্টনীড় সম্পাদিত হয়েছে বলে। এই ধরণের সমালোচনা যে হীন রুচির জন্ম দেয় তাতে "অমুক বাবুর তমুক বইটা দেখা যায় না"—জাতীয় ক্রুদ্ধ বাক্যে রেস্তোরাঁ বিদীর্ণ হতে পারে কিন্তু খারাপ ছবির থেকে মহৎ ছবিটি আলাদা করে চিনে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশিত হয় না।

হ্যাঁ, আমরা বলছিলাম উপন্যাস ও সিনেমার সম্বন্ধের কথা। এবং আমরা বলছিলাম মিশ্ররীতি—সমন্বয়ধর্মীতা আধুনিকতার একমাত্র বৈশিষ্ট্য না হলেও গণনীয় অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের আঁতুড় ঘরেই তার জন্ম; তবু সিনেমা বড় হল, আত্মনির্ভরশীল হল, পরজীবী রইল না ও এখন তার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই কেননা সে শুষে নিতে জানে ও পারে। অন্যদের তুলনায় সে অনেক আগে বুঝে ফেলেছিল শিল্প-বিপ্লবের অ্যালজেব্রা কি ভাবে কাজ করে। অধ্যাপক হ্যারি লেভিন প্রতীচ্যের দিকে তাকিয়ে ভেবেছেন মহাকাব্য, রোমান্স ও উপন্যাস পরম্পরাক্রমে সামরিক, দরবারী ও বণিকী সভ্যতা ও জীবনযাপনের ফলশ্রুতি। সেই সূত্রটুকুর সাহায্য নিয়ে বলা যাক মেসিন ও মেসিনের দেবতার কাছে সমর্পিত হৃদয় বর্তমান সভ্যতা যে জটিলতর সমীকরণসমৃদ্ধ স্ফিংকস্‌টিকে উপস্থিত করেছে তার পূর্ণাঙ্গ সমাধান বোধহয় চলচ্চিত্রের ঈদিপাসদের পক্ষেই করা সম্ভব। সিনেমার মৌলিকতা যাদের চিন্তিত করে এমন অনেকে মিশ্রশিল্প অভিধাটিতে অস্বস্তি প্রকাশ করেন। এই অস্বস্তি, বাস্তবিক, অর্থহীন। আদি যুগের মহাকাব্যও কি এখনকার ধ্যানধারণার ভিত্তিতে ইতিহাস দর্শন থেকে শুরু করে নাটক ও কাব্যকে জড়িয়ে নিয়ে মিশ্র মাধ্যম নয়? সিনেমাও বিজ্ঞান-সভ্যতার নতুন মহাকাব্য, মিশ্ররীতির চাবিকাঠি তার সম্ভাবনাকে ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশ থেকে আকাশে, দিগন্ত থেকে দিগন্তে। আশ্চর্যের কথা, চলচ্চিত্রের এই অপার সম্ভাবনা দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যারা প্রথম মগজে আনেন তাঁরা কেউই চলচ্চিত্রকার নন। প্রথমজন কবি ও দ্বিতীয়জন রাজ-

নীতিক; আপলিনেয়ার ও লেনিন। বরং ফিল্মের পরাবাস্তব সম্ভাবনা নিয়ে অত্যন্ত ভাবিত ছিলেন বলেই বিশেষভাবে আপলিনেয়ার সম্বন্ধে আমাদের আক্ষেপ থাকে যে আঁদ্রে বিলির সহযোগিতায় করা তাঁর চিত্রনাট্যটি এমন বাণিজ্য, নিছক বাণিজ্য হয়ে দাঁড়ালো কেন!

কয়েক বছর আগে একটি ছবি দেখেছিলাম। সত্যজিৎ রায়-কৃত শতরঞ্জ কে খিলাড়ি। কোন স্মরণীয় প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। আজ বিশেষ কিছু মনেও নেই। তবু স্মৃতিতে বারে বারে হানা দেয় রঙের অনির্বচনীয় প্রয়োগ, নবাব ওয়াজেদ আলি শাহর পশ্চাদভূমিতে লাল এবং আকাশ। আমার মনে হয়েছিল রঙই এখানে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ নায়ক। যেন অঁরি মাতিসের ছবি কিন্তু নিরানন্দ ও মন্থর। ফিল্ম ছাড়া অন্য কোন পন্থায় কি এত দ্রুত, তীব্র, চকিত, অবান্তরভাবে শৃঙ্জয়ের ইতিবৃত্ত লেখা যায়? মনে হয় না। জয়েস সত্যই বলেছিলেন যে সাহিত্য সর্বাপেক্ষা মননশীল শিল্পরূপ অর্থাৎ, কোন মননশীল বক্তব্যের যথাযোগ্য স্থায়ী বাহন একমাত্র সাহিত্যই হতে পারে—বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রবন্ধে ছেদ টেনেছেন ধর্মবিশ্বাসীর নিবিড় নিরাপত্তাসহ। জয়েস মারা যান ১৯৪১ সালের ১৩ই জানুয়ারী, তিনি অনুমানও করতে পারেননি অদূরবর্তী গোকুলে—স্টকহোম বা দূরবাংলায় ইতিমধ্যেই বেড়ে উঠেছেন ইংগমার বার্গমান বা ঋত্বিক কুমার ঘটক যারা অনতিকাল পরেই আত্মার পথ্য ও পানীয় হিসেবে বরণ করে নেবেন চলচ্চিত্রকে। আমরা সকলেই জানি জয়েস আজীবন চক্ষুপীড়ায় ক্ষীণদৃষ্টি ছিলেন কিন্তু দৃষ্টিহীন তো ছিলেন না। যদি এমন হত যে সাহিত্যিক জয়েস সুযোগ পেয়েছেন সেভেন্থ সীল বা সুবর্ণরেখা দেখার, কি ঘটত? যেহেতু শিল্পী, নির্বাক ও স্তব্ধ থাকতেন কিছুক্ষণ, বুদ্ধদেব-উদ্ধৃত মন্তব্য প্রত্যাহার করতেন কিনা বলা যায় না তবে দ্বিধাগ্রস্ত হতেন অন্তত। পুনর্বিবেচনা করতেন হয়তো বা তারও এক পক্ষকাল পরে।

আশ্বিন বুঝি ! আশ্বিনে কাঁপে ঘর

১.

ঋতুর দল, বলো দুর্গদল
কোথায় সে হৃদয় যা অবিকল ?

এই অসামান্য কবিতার র‍্যাঁবো কিন্তু কোন প্রশ্নই করেন নি। এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। জঁা-পল-সার্ত্রকে সরাসরি উদ্ধৃত করা যাক :

He conferred upon the beautiful word "soul" an interrogative existence. The interrogation has become a thing as the anguish of Tintoretto become a yellow sky. It is no longer a signification, but a substance.

ভেনিশীয় চিত্রকর তিনতোরেৎতোর সঙ্গে স্ব-দেশীয় কবি র‍্যাঁবোর তুলনায় আমরা বুঝতে পারছি সার্ত্র চাইছেন কাব্যের সঙ্গে অঙ্কন শিল্পের একটি সেতু রচনা করতে। সার্ত্রীয় চিন্তাস্রোতে অল্পবিস্তর গা ডোবালেই আমরা লক্ষ্য করি যে তিনি কবিতা আর ছবিকে একই বন্ধনীভুক্ত করেছেন এই ভেবে যে তাঁরা তুলনায় মূক ; কোন অর্থ সূচীত করে না ; বরং প্রতিমার জন্ম দেয়।
আবার র‍্যাঁবো স্বরবর্ণের অর্থ বিচ্ছুরিত দেখেছিলেন নানা রঙের মধ্যে। ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে সমীকরণ সন্ধানের সে প্রয়াস যদি বা সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত ব্যক্তিগত অনুষঙ্গের বলে মনে হয়, তাহলে অনেক সহজ হবে কবিদের অঙ্কন পদ্ধতিতে রঙের ব্যবহার অনুধাবন করা। এলিয়ট এঁকে চলেন জনৈকা ভদ্র-মহিলার প্রতিকৃতি :

> Well ! and what if she should die some afternoon,
> Afternoon grey and smoky, evening yellow and rose...

এবং আমাদের জীবনানন্দ : তাঁর সেই বিখ্যাত কমলা রঙের রোদ যা অনতিকাল পরেই গালিচায় রক্তাভ হয়ে যায়। অথবা আরও ধ্রুপদী উদাহরণ মনে হয় সেক্সপীয়র :

> ...with a green and yellow melancholy...

জানি এইসব প্রসঙ্গ তোলা বিপজ্জনক। আমরা যারা চলচ্চিত্রস্রষ্টা আইজেন-স্টাইনের "হলুদের সঙ্গীতে" মুগ্ধ, তারা জানি রঙের অনুষঙ্গ অনেক সুদূর ও যোজনবিস্তৃত।

ভয় হচ্ছে, এক নিশ্বাসে এত বিদেশী রেফারেন্স!—পণ্ডিত সাজার সস্তা পদ্ধতিটি নিচ্ছি নাতো? আসলে নিরুপায় হয়ে অল্প জলের পুঁটিমাছ বনে গেলাম; আমার প্রকৃত অন্বিষ্ট কবিতার সঙ্গে চিত্রকর্মের যোগাযোগ বর্ণনা করা।

ছবি শেষ পর্যন্ত সঙ্গীতে মিশে যাবে—ভানগখের অন্তিমপর্ব—না স্তব্ধ ঋজুতা—পিকাসো—পাবে তা অন্য কথা কিন্তু ছবি একটি গতিময়তাকে চিরায়ত স্থিতিতে পুর্নবাসিত করে। আর কবিতার কোন বাক্‌প্রতিমাও হঠাৎ থেমে অনন্তের সঙ্গে যুক্ত হয়। কে না আমাদের মধ্যে তৃপ্তিহীনভাবে অবলোকন করেছে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন-চারিণীকে:

দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগর গুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়।

আবার ভানগখের বায়সসমূহ; ড্রইং-এর মৌনসংহতি ছিঁড়ে ফেলে তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলে; আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেয় কান্নার উৎক্ষিপ্ত ও রুধিরাক্ত প্রতিকৃতি।

বস্তুত কবিতার সঙ্গে ছবির নৈকট্য গভীর বলেই বারবার কবি ও শিল্পীর সম্পর্ক কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছে। দ্যলাক্রোয়ার "ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অশ্ব" আর্ত করেছে বোদলেয়ারকে, আর পিকাসোকে নিয়ে এ শতকের অন্যতম মহার্ঘ কবি আপলিনেয়ার লিখেছেন—এই মালাগা দেশীয়টি আমাদের আহত করে গেলেন ক্ষণিক হিমের মতো।

সাগরপারের কথা তো হল অনেক। আমরা এবার ঘরে ফিরে আসি। সর্বজনমান্য নীরদ মজুমদারের চিত্রকলার দিকে চোখ ফেরালেই বোঝা যাবে কবিতার গ্রন্থনা কি নিবিড় ভাবে তিনি সম্ভব করেছেন পটে।

"ত্রিপুরা সুন্দরী" সিরিজ নিয়ে তাঁর একটি বক্তব্য আমাকে মুগ্ধ করে: একটা স্থির বিন্দুকে ঘিরে জ্যামিতিক ভাবে অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে পরিবর্তিত হয়েই গড়ে ওঠে সম্পূর্ণ আর্কিটাইপাল চিত্রকথা। এই হচ্ছে মৌল প্রতীক; আদি প্রতিমা। এখানেই তিনি দাবী করবেন দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় অর্থের ক্রমবিন্যাস। কবিতায় এই স্থির বিন্দুই তো এলিয়ট কথিত still point of the turning world.

—আবার তিনি যেমন মহাজাগতিক রহস্যের সামনে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, রামপ্রসাদী—ও মা, তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি-পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরে মরি, পঙতিটিকে করে তোলেন ছবির উপজীব্য, তেমন ভাবেই কবি বিষ্ণু দে রচনা করেন সেই অসামান্য চিত্রকল্প :

তারই মাঝে তুমি মুদ্রিত অঙ্গুলি
বরাভয়ে, আনি কৈলাসে দিনগুলি।

অন্যদিকে চলচ্চিত্রস্রষ্টা ঋত্বিকও 'মেঘে ঢাকা তারা' থেকে শুরু করে জীবনের শেষ পর্যন্ত নিমগ্ন রইলেন একই সাধনায়। অর্থাৎ মহিয়সী মাতার মাধ্যমে দেশজ ঐতিহ্যের পুনঃনির্মাণে পাশাপাশি হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল তিনটি শিল্পরূপ।
ছবির ভাষা, নিঃশব্দতার। সেজন্য নীরদ মজুমদার কবিতার ক্ষেত্রে ঝুঁকে পড়েন প্রতীকীবাদের প্রতি। ফরাসী সিম্বলিস্ট স্তেফান মালার্মে তাঁকে যতটা প্রভাবিত করেন, রাজনীতিমুখর বিষ্ণু দে ততটা পারেন না। শব্দের সবাক অস্তিত্বের বদলে তিনি বরং মেনে নেবেন তার চিত্রিত ছায়া।
বাংলা ভাষায় যদিচ বিষ্ণু দে'ই আধুনিককালে নীরদ মজুমদারের প্রিয়তম কবি। তবু সে তাঁর লঘুছন্দ গীতিময়তার জন্য। আর এ সত্য হৃদয়ঙ্গম বলেই বোধ হয় বিষ্ণুবাবুও শানু ও নীরু মজুমদারকে নিবেদিত কবিতাটি লিখতে পেরেছিলেন :

আশ্বিন আনে চোখের মুক্তি নীলে,
হৃদয় ছড়ায় ঢলের জলের মিলে।
পায়ের মুক্তি, মুক্তির নিশ্বাস
মাঠে-মাঠে মেলে, শরতের ঘাস, কাশ।
উদার পৃথিবী তারই মাঝে দিল্‌দার
ঘর বেঁধেছিল শিল্পী প্রেমের তার
আশ্বিনে বাঁধা ঘর।
এদিকে পাহাড় ওদিকে চূড়ার সার
এই পার্বতী এই পরমেশ্বর।

প্রকৃতই বিষ্ণু দে ছাড়া আর কে বুঝতে পারবেন, নীরদ মজুমদার : তাঁর আশ্বিনে কাঁপে ঘর।

চিত্রার্পিত যে বিহঙ্গ রথারূঢ়—আর কিভাবে বিশেষিত করব তাঁকে? শিল্পীমাত্রেই সংবাদপত্রীয় সপ্রতিভ এবং সহজগ্রাহ্য চালু রচনারীতির বিকল্পে বহুমাত্রিক (Multi-dimensional) ভাষার প্রেমিক হবেন—আমার এ জাতীয় বিশ্বাসের স্ব-পক্ষে অবনঠাকুরকে স্থাপন করাই বর্তমান আলোচনার প্রধান অন্বিষ্ট।

চিত্রের প্রতি তাঁর আসক্তি সর্বজনস্বীকৃত। খুব অন্যায় হবে রূসেটির The blessed damozelকে তুলনীয় ভাবলে? উৎস সন্ধানে আমার মনে হয়েছে জীবনের প্রারম্ভেই অবনীন্দ্রনাথ ভাবিত ছিলেন যোগাযোগের সমস্যা সম্পর্কে। সংশ্লিষ্ট লেখক একজন চিত্রকর তাই সঙ্গত এবং প্রত্যাশিত এই চিত্রাভিসার, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল গদ্যচর্চায় ব্যাপৃত তিনি জানতেন:

"কথিত ভাষার সঙ্গে চিত্রিত ভাষার পার্থক্য এই যে কথিত ভাষা সার্বজনীন নয়, চিত্রিত ভাষা সার্বজনীন।" (শিল্পায়ণ)

নিজেকে সার্বজনীন করাই কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। (অন্য অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন ছড়ার ছন্দ ও লৌকিক কথকতা) হয়তো সেজন্যই 'আলোর ফুলকিতে' মানবিক শব্দ সঞ্চয় পক্ষীকুলের অনুকৃতিতে দীপ্যমান। আসলে অবনীন্দ্রনাথের মর্মে প্রোথিত ছিল চিত্রভাষা প্রবর্তনার প্রলোভন। প্রথম বই শকুন্তলা। পিতৃব্যের অনুরোধে লিখিত এক নিরভিমান আলোকপ্রাপ্তি। তারপর রাজকাহিনী—নিশ্চিত হচ্ছি রচয়িতা নিশ্চয়ই ছবির স্থানাঙ্ক নির্ণয় করেছেন। তুলিকা ক্রমশই পরিণত, ইঙ্গিত-সঙ্কুল, প্রায়শ একাধিক অর্থদ্যোতনায় বিচ্ছুরিত। শিল্পে যে বর্ণিকা ভঙ্গীকে আশ্রয় দিতেন তাকে সম্বর্ধনা জানাল নালক। অবশেষে উচ্চারণের তাৎপর্যকেও সহায়ক শক্তি হিসেবে বরণ করে 'আলোর ফুলকি' প্রাণবান। এই স্বরবিন্যাসের মধ্যেই সাজিয়ে নিতে হবে বুড়ো আংলা বা অন্যান্য বইকে।

এবার ভাবা যাক চিত্রী আপন স্বভাবের কি কি বৈশিষ্ট্যের সংবাহন সম্ভব করেছিলেন সাহিত্যে। তাঁর ছবি স্পষ্ট, নির্দ্বন্দ্ব, অল্পবিস্তর অকৃত্রিম এবং আধুনিক অর্থে রহস্যহীন। শকুন্তলার প্রথম পঙক্তিগুলি যেমন:

"এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল—ছোট নদী মালিনী। মালিনীর জল বড়ো স্থির

আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতকগুলি কুটিরের ছায়া।"
কোথাও সংশয় নেই। উজ্জ্বল এবং ঋজু। পাঠকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত প্রায় স্থির সলিলস্থ বস্তুচ্ছায়ার মতো। অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ বা খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথের ম্লান বিভাবরী তাঁর শিল্পকলাকে প্রকারান্তরেও প্রভাবিত করেনি। এই অর্থেই অবন ঠাকুরের বাণীবন্দনা সরল। যে সারল্য বর্ণিকাভঙ্গীতে অতি গুরুত্ব আরোপে, এ প্রসঙ্গে চৈনিক চিত্রের আত্মীয়তা মূল্যবান। ইঙ্ক স্কেচ বুঝি!
"রাত আসছে—বসন্তকালের পূর্ণিমার রাত। পশ্চিমে সূর্য ডুবছেন, পূর্বে চাঁদ উঠি উঠি করছেন। পৃথিবীর একপারে সোনার শিখা, আর একপারে রূপার রেখা দেখা যাচ্ছে" (নালক)। চিত্ররূপময় তরুণ জীবনানন্দের পরিবর্তে রঙের প্রাধান্য। কালারড্ পেইন্টিং—পাঠক ভাবতে পারেন মৃত্যুর আগের কথা।
অবশ্যই এলিয়টীয় ডি-পার্সোনালাইজেসন নয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজ্ঞানমনস্ক নৈর্ব্যক্তিকতার থেকেও ভিন্ন তবু বাংলা ভাষায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্নতা প্রয়োগ করেন। অবন ঠাকুর নিরাবেগ নন বরং রূপের কথা নির্মাণে অসামান্য স্ব-চেতন। কেমন অবলীলায় স্ব-চরিত্রের পৃথকীকরণ : ভাষার প্রতি তাঁর স্নেহ যেন শুধু কাহিনী বর্ণনার জন্যই। আশ্চর্য হই, বাংলা গদ্যভাষার সাধারণত অনুসৃত পন্থাকে সশ্রদ্ধ বিনয় অর্পণ করে, প্রবল প্রতাপ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমান্তরাল ব্যবধান রেখে এই উদাসীন নির্লিপ্ত দৃষ্টিপাতে। অনিবার্যভাবে স্মৃতিপটে জাগ্রত হয় মুণ্ডক উপনিষদের বহু-খ্যাত শ্লোকটি :

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্য পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

আমাদের মাতৃভাষায় সেই দ্বিতীয় সুপর্ণের অনন্য উপমা অবনীন্দ্রনাথ। ভাবছি রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' (প্রাচীন সাহিত্য) আর অবনীন্দ্রনাথের সিন্ধুতীরে (পথে বিপথে); উভয়েই ধ্রুপদী বাক্-প্রতিমার অশনিসংকেত। অথচ প্রথম ক্ষেত্রে বারংবার অনুভূত হয় কবির আলেখ্য। দ্বিতীয়টি প্রকৃতির সারূপ্যে অত্যন্ত আপন মহিমায় প্রকাশিত। বলতে চাই উপস্থাপন ভঙ্গীমা রবীন্দ্রনাথে যদি (এবং অন্যান্য চরিত্রেরও) হৃদয়ের বিস্তার তবে অবনীন্দ্রনাথের তা প্রাকৃতিক গিরি শিখর বা অরণ্য গহনের মতই স্বয়ম্ভূসদৃশ।
সার্বজনীনতা যেখানে মৌল প্রতিজ্ঞা, চিত্রধর্ম যেখানে প্রধান মাধ্যম, ব্যক্তিরূপ যেখানে অনভিক্ষিপ্ত, সেখানে এ প্রতীতির জন্ম বিস্ময়কর নয় যে তিনি আপাতভাবে

সহজ পদাতিক মাত্র। কিন্তু একটু মনোযোগ সঞ্চারেই দেখা যাবে গদ্যভাষার সৃজনে তার অতিলৌকিক শ্রম। গ্রাম্যতামুক্ত কথকতার প্রণয়নে, গদ্য ও স্বরবৃত্ত ছন্দের সমীকরণে, ধ্বনিবৈচিত্র্যে, এমন কি বাক্যক্রীড়ায়, আকস্মিক নাটকীয়তায় তো নিরুল্লেখ্য ভাবেই। বিস্তৃত ব্যাখ্যা নিরর্থক; আমার পাঠক অবনঠাকুরের বিখ্যাত লেখাগুলির সঙ্গে পরিচিত। বস্তুত অনুধাবনীয় ছদ্মবেশী সারল্য তাঁর আঙ্গিকের অন্তর্গত। তাঁর সারল্য চেষ্টাকৃত নিরাবরণতার অহঙ্কার। রবীন্দ্রনাথের সাহায্য নিয়ে বলা যেতে পারে পাগলামির কারুশিল্প। পাগলামিটুকু অনর্গল ভাষণে, পরিমিতিহীনতায় আর কারুশিল্প লেখকের পক্ষে মৌখিক ব্যবহারিক ভাষাকে প্রচ্ছন্ন রাখায়, পাঠকের পক্ষে অবিরল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে।

এমন গুণী পুরুষ তাহলে উত্তরকালেও অনমুকৃতই রয়ে যাবেন? অবনীন্দ্র-প্রতিভার জ্যোতিতে স্নাত হয়েও নন্দলাল বসুর সাতীর্থ্যে মানতে আমরা বাধ্য যে সেই জগতে:

"টাটকা ফোটা ফুলের সৌগন্ধ আছে, শুকনো আর পচা ফুলের শুষ্কতা ও দুর্গন্ধ নাই।"

নচেৎ শিল্পে পর্যন্ত গগন ঠাকুর বা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নিশিথ যাপনে অনীহা জ্ঞাপন করবেন কেন? অবনঠাকুরের মানসস্বর্গে বিষাদ নেই, কোন পাপ তাঁকে পীড়ন করে না। শোক নেই, কোন দুঃস্বপ্ন তাকে মথিত করে না। প্রশ্ন নেই তাই প্রজ্ঞান নেই। মাত্রই ইন্দ্রিয়ের কল্পনার পার্শ্বচর তাই জরতপ্ত সভ্যতার শয্যায় পরিত্যাজ্য। তাঁর সুন্দর রোমান্টিক বলে দোষারোপ করি না। অভিযোগ পিউরিটান বলেই।

অথবা আমারই ভ্রম পদ্মপত্র মানুষের অশ্রুকে ধারণ করে না। লুইস ক্যারলের সতীর্থ বোধ হয় ওবিন ঠাকুর। অদ্ভুত! একাকী! সর্বকালের পূজনীয় অলীকের জনক।

ক্লেদজ কুসুম

Why, why do you do tnat ? To me !
I prostrated myself not before you, but
before all human suffering he said wildly
and walked away to the window.

ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট
ফিওদর দস্তয়েভস্কি।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেনকে নিয়ে কোন সম্পূর্ণ আলোচনায় লিপ্ত হওয়ার দায় আমার নয়। তবু তাঁর প্রসঙ্গে যে প্রায় সামগ্রিক ঔদাসীন্য সচরাচর পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, যে নির্মম দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় সাম্প্রতিক ইতিহাসসমূহে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপকেরা অকাতরে তাঁর নাম উল্লেখে বিরত থেকেছেন সে বিষয়ে আমাকে বলতেই হবে যে, রমেশবাবু কোনক্রমেই আমাদের গদ্যসাহিত্যের পক্ষে পরপুরুষ নন কিন্তু ঈষৎ অবেলার পথিক। এও এক নক্ষত্রের দোষ যে অত্যন্ত প্রখর সামাজিকতা ও সংগঠন প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত তিনি সাহিত্যের স্ব-ধর্মেই সমর্পিত ছিলেন, মোসাহেবি রূপ পরোধর্ম তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। বুর্জোয়ার কাছে সবই পণ্য। আজকের এই শারদীয় মানুফ্যাক-চারিং প্রসেস ও 'নির্দেশপ্রাপ্ত' আলোচনা সমষ্টি তাঁকে স্মরণ করবে কেন? তবে যেহেতু শিল্পের ইতিহাস একাকী শুদ্ধতাকে মনে রাখে, আমরা নিশ্চিত যে রমেশ-চন্দ্রের পুনর্মূল্যায়ন প্রত্যাসন্ন।

যে উপন্যাসটি বিষয়ে আমি এই ছোট আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকব তার নাম কাজল। সময়ের বিচারে রমেশবাবুর চতুর্থ উপন্যাস। প্রকাশকাল—১৯৪৯। তথ্যের স্বার্থে উল্লেখ করা জরুরী যে অনতিউত্তর স্বাধীনতা পর্বে প্রকাশিত এই রচনাটিকে শ্রদ্ধেয় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় শুধু 'অমর উপন্যাস' বলেই নিরস্ত হন নি অধিকন্তু দাবি করেছেন যে তা কোনক্রমেই আলেকজাণ্ডার কুপরিন প্রণীত ইয়ামার অধমর্ণ নয় বরং তীব্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সন্তান। লেখাটির সার্থকতা বিষয়ে পবিত্রবাবুর মত উচ্চকণ্ঠ যদিবা আমরা না হতে পারি তবু নিঃসংশয়ে আমাদের

নত হতে হয় রমেশ সেনের উদ্ভাবনী প্রতিভায়। কাজল বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয়ভাবে এক মৌলিক রচনা। "উপন্যাসে তত্ত্ব ও তথ্য" নামে এক নিবন্ধে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন—"তবু এটাও নিশ্চিত যে উপন্যাস রচনায় কেবল উদ্‌ভাবনা শক্তি যথেষ্ট নয়; সেজন্য সত্যনিষ্ঠাও হয়তো অনাবশ্যক; কিন্তু যেটা অপরিহার্য, সে-গুণ হচ্ছে লরেন্স যাকে বলেছিলেন 'থট অ্যাডভেঞ্চার' —অর্থাৎ দুঃসাহসিক ভাবুকতা।" মর্মাহত বিস্ময়ে আমরা লক্ষ্য করি কাজলের শরীরে ও আত্মায়, রক্তে ও মর্মে জড়িয়ে রয়েছে এই দুঃসাহসিক ভাবুকতা।
কাজল ভিন্নঅর্থে এক পাপের ফুল। যেখানে আকাশ নাই, তারা যেথা কখনো ফোটে না সেই কটুগন্ধ অন্ধকারে বিধাতার দেনা শোধ করবার জন্য এই ক্লেদজ কুসুম পরতে পরতে নিজের ঐশ্বর্য উন্মোচিত করেছে আমাদের চোখের সামনে। ওই রমণীর কটিলগ্ন স্বেদের আঘ্রাণে যে বমনেচ্ছা, ওই নিষিদ্ধার উরুসন্ধিদেশে যে হাহাকার তা ইতিপূর্বে অপরিচিত ছিল। সন্দেহ নেই বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্য দিয়েই কুন্দনন্দিনী অথবা রোহিনীর মত বিপথগামিনী নায়িকাদের জন্য আমাদের ভাষায় একটি সমাজ-শাসিত সঞ্চার পথ নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তেমনভাবে নন কিন্তু শরৎচন্দ্র পদস্খলিতাদের জন্য হৃদয় বেদনায় বারে বারে আকুল হয়েছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর গণিকারা যতটা অশ্রুসিক্ত স্নেহের প্রতিমা ততটা আমিষাশী রূপোপজীবিনী নয়। রাজলক্ষ্মী-সাবিত্রীদের জন্য তাঁর মমতা যতটা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে ততটাই অপ্রমাণিত থেকে গেছে তাদের সংবেদনাহীন অকুস্থল পরীক্ষা করায় তাঁর আগ্রহের আন্তরিকতা। অনুরূপ অভিজ্ঞতা থেকেই বোধহয় লেনিন সকৌতুকে শ্রীমতী ক্লারা সেৎকিনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন "এক সাহিত্যিক রেওয়াজের কথা, যাতে প্রত্যেক বারবণিতাকেই দেখানো হত লক্ষ্মীমণি ম্যাডোনা হিসেবে।" অবশ্যমান্য শরৎবাবুর শিকড় ছিল সুস্থ; সামাজিক সমবেদনা—সমাজের প্রচলিত শাস্ত্রবিধির বিরুদ্ধে সাভিমান বিক্ষোপ। কিন্তু এই উত্তরাধিকার কতদূর ক্ষয়প্রাপ্ত ও অধঃপতিত হতে পারে তা সম্প্রতিকালে জনপ্রিয়তাপ্রাপ্ত উপন্যাসগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসমরেশ মজুমদারের 'বারো নম্বরের সুধারাণী'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রমেশবাবুর কাজলের সঙ্গে উল্লিখিত রচনাটির আক্ষরিক অর্থে সাযুজ্য রয়েছে; কাজল হয়তো সুধার প্রমাতামহী। কিন্তু মুখ আর মুখোশের মধ্যে পার্থক্য যে কত সুদূর ও যোজন যোজন তা উপলব্ধি করতে পাঠকের কিছু

মাত্র অসুবিধা হয় না। অবশ্য শরৎবাবুর আগে ও অব্যবহিত পরে কয়েকটি সমাজ-চিত্রে গণিকাপল্লীর অনুষঙ্গ রয়েছে। তথাপি সে সমস্তই দূরাবলোকন। রমেশবাবুই প্রথম দৃষ্টিকে সংহত করলেন; প্রথম close-up.; সামীপ্যের জীবনে ধরা পড়লো জনপদবধূ। এজন্যই আমি রমেশ সেনকে প্রবর্তকের সম্মান দেব। তাঁর সৌজন্যেই মাংসলুব্ধ আমরা প্রথম শহীদ স্তনে ঠোঁট ছোঁয়ালাম।

কবরের মত গভীর বাসরশয্যায় আমাদের জন্য অপেক্ষমানা শুধু কাজল নয়, রীতিমতো সারিবদ্ধ এক মিছিল। কে নেই? গোঁফের প্রতি দুর্বলতাযুক্ত পিরমিল বাড়িউলি, ছোঁয়াছুঁয়ি বাতিকের প্রিয়, খিস্তিপ্রিয় রসবতী, প্রেম-পাগলিনী চারুবালা, ভীরু সুবালা, কোকেনব্যবসায়ী মণিমালা থেকে শুরু করে পটল, হর্তুকি, বেদানা, আমৃতি, চাটনি, আলতা কেউই বাদ যায় নি। সেখানে শুধু গ্রাম্য লম্পট পাঁচু বা পরিশীলিত ও যথার্থ রুচিবান রথীন অথবা কবি সাধনের আনাগোনা নয় তিন নম্বর দালাল বা দিন দালালের সূত্রে সেখানে আসে মঠবাসী মোহান্ত, শঠ ভণ্ডুল, রঘু উকিল, বালতিরাজ, অন্ধ অধ্যাপক, চোর সাংবাদিক, হৃদয়হীন পুলিশ অফিসার, সম্ভ্রান্ত বিধায়ক এমনকি মন্ত্রী। আরও নানা খদ্দের। এমনকি হারাধন ডাক্তারের লঘুচিত্রটি উপস্থিত করে কবিরাজ রমেশ সেন নিজেকেও কি একটু পরীক্ষা করে নেন নি? তিনি যদি মনোযোগ কাজল নাম্নী তরুণীটির দিকেই আরোপ করতেন, যদি উক্ত প্রতিমার চক্ষুদানই তার একমাত্র করণীয় হতো তবেও আমাদের বলার কিছু থাকত না। অথচ রমেশবাবুর প্রেক্ষাপট বিস্তৃত। একটি মহাকাব্যিক মনোপ্রবণতার দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনি অজস্র চরিত্র—প্রায় জনসমাবেশ—সৃষ্টি করেছেন। এক অসামান্য কৃতিত্ব—আমি বলব। কেননা এখানে তুচ্ছতম "রিজেভ বাবুটি" পর্যন্ত প্রতিটি মানুষ বেশ্যাপল্লীর প্রয়াস, সংস্কারে, নিত্যকর্মপদ্ধতিতে এমন জীবন্ত যে তাদের প্রায় স্পর্শ করা যায়। "এপয়েন্টো", "অসৈযোগ", "বিলিতি হাইণ্ড"—তাদের ব্যবহৃত উপভাষা পর্যন্ত রমেশবাবু নিজের কররেখার মত চেনেন। এ বিষয়ে বরং পূর্বসূরী দীনবন্ধু মিত্রের মতই তুলনায় ম্লান রথীন অথবা সাধন কিংবা সন্ত্রাসবাদী স্বদেশীর মত তথাকথিত উচ্চশ্রেণীসম্ভূত চরিত্রগুলি। চরিত্রের প্রতিপালনে রশেমবাবুর অনুপুঙ্খ প্রীতি সাফল্যের এমন দুর্জয় শিখরে আরোহণ করে যে কাজল উপন্যাস পাঠের সময় নিজেদের অজ্ঞাতেই আমরা উত্তর কলকাতার ওই কুখ্যাত পল্লীর বাসিন্দা হয়ে যাই, যেতে বাধ্য হই।

এবার বোধহয় স্বয়ং কাজলের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এতক্ষণ পর্যন্ত আমার বর্ণনায় যারা রমেশবাবুকে নিখুঁত বাস্তববাদী, নাতুরালিজমের ভক্ত ভেবে নিয়েছেন তাদের কিন্তু এবার থমকে দাঁড়াতে হবে। কেননা কাজল চরিত্রটি কৃত্রিম। সামান্য পণ্যা-স্ত্রীলোক হওয়া সত্ত্বেও তলস্তয়ের ওয়ার অ্যাণ্ড পিস সংক্রান্ত আলোচনায় যোগ দেয় বলে ততটা নয় যতটা তার জনয়িতার সংশ্লিষ্ট উপপাদ্যটি প্রমাণের জন্য আশিরপদনখে অবয়বী বলে। একজন প্রকৃত শিল্পী হিসেবে রমেশ সেনের প্রধান অন্বিষ্ট ছিল জনৈকা ভ্রষ্টা নারীর শরীরে যে সব গোপন রন্ধ্র কোন মত্ত নাগর দেখে নি সে সব আবিষ্কার করা। রমেশবাবুর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে অন্য মত হওয়ার স্বাধীনতা আমাদের আছে কিন্তু তাঁর শ্রম ও সততাকে অভিবাদন না জানিয়ে উপায় নেই।

আত্ম-দর্শনের এক বিরল মুহূর্তে কাজল মন্তব্য করে—"আমি লোভী, আমার জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে লোভ।" আসলে এই লোভ সামন্ততান্ত্রিক যৌথ জীবনযাত্রার তরঙ্গবিরলতা থেকে স্রোতমুখর নাগরিক স্বাতন্ত্র্যে উত্তীর্ণ হওয়ার অভিযান। "এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর"—বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষার এই উক্তিতে নারীর প্রাতিস্বিকতা স্বীকৃত হয়েছিল। কাজল তার সম্প্রসারণ। অন্যদিকে প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক পরিবেশে নারীর একাকী বিদ্রোহ সফল হতে পারে না। রমেশবাবু তো আর বাজারচালু চিত্রনাট্যকার নন সুতরাং কাজল বিপর্যস্ত হয়েছে। যা সহজ ছিল, প্রতিষ্ঠা ও ইচ্ছা পূরণের মধ্যবিত্ত বাতাবরণ, সত্যবদ্ধ বলেই রমেশবাবু তা চূর্ণ করে দেন। অখ্যাত পাড়াগাঁর বালবিধবা কাজলকে বৃত্ত পূর্ণ হলে আবার জড়িয়ে ধরে রাত্রির সীমাহীন নিঃসঙ্গতা।

রমেশবাবু যেহেতু প্রথম থেকেই জানতেন, তাঁর উপপাদ্যটিকে কিভাবে প্রমাণ করতে হবে সুতরাং প্রথমস্তরের বাস্তবতা বিস্মৃত হয়ে তাঁর নায়িকাকে সম্ভাব্য পরিণতির জন্য প্রস্তুত করেন। ঋত্বিকের সুবর্ণরেখায় যেমন, কাজল উপন্যাসের প্রতিটি স্তরে আমরা প্রত্যক্ষ করি ক্রমনির্দিষ্ট এবং আপাতভাবে অবিশ্বাস্য কিছু সমাপতন। লম্পট পাঁচুর দ্বারা প্রতারিত কাজল পল্লীর কূপমাণ্ডুক্য অতিক্রম করে স্বপ্নের শহরে আনীত হয়। পাঁচুর পলায়ন কিন্তু অনতিবিলম্বে হৃদয়বান রথীনের আগমন। কন্যার জন্ম; কাজলের এবং সেইসূত্রে আমাদের স্বপ্নগুলি নির্বিঘ্নে সিঁড়ি বেয়ে শীর্ষের দিকে অগ্রসর হয়। রথীনের মৃত্যুও সেই গতি রোধ করতে পারে না। পতনঅভ্যুদয়ময় বন্ধুর পন্থায় তুচ্ছ পল্লীকন্যা কাজল

দেহের বিনিময়ে অর্থ, সুরা, খ্যাতি, অশ্বক্ষুরধূলি পায়, এমন কি মন্ত্রীর প্রণয়ধন্যা হয়। তবু রমেশবাবু উপাখ্যান অন্তে মোহ ছিন্নভিন্ন করে দেন! কোন ও গাড়ি যার করায়ত্ত সে রক্তের ফসল থেকে বঞ্চিতা এবং আরও যা মর্মান্তিক পথকুক্কুরীর মত নিরাশ্রয়।

আমার বক্তব্য যে আলোচ্য উপন্যাসে একমাত্র নায়িকার চরিত্রই শাস্ত্রীয় অর্থে বাস্তব নয়, কেননা লেখকের উদ্দেশ্যপূরণের জন্য নানা উপাদান-ঘটনার ঘনঘটা থেকে উপকরণ সঞ্চয় করে তাকে পরাভূত তিলোত্তমায় রূপান্তরিতা হতে হয়েছে। এই সাধারণীকরণ আমাদের বিব্রত করে না কেননা আমাদের জানা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে যে কাজলের মধ্য দিয়ে রমেশ সেন গণিকাজীবনের যাবতীয় বঞ্চনা, নিগ্রহ ও অসহায়তার সন্ধান করে চলেছেন ; তাঁর চরিত্রে তো প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সকল প্রকার আলেয়া ও মরীচিকা ছাপ রেখে যেতেই পারে। স্বাভাবিকের তুলনায় বিবর্ধিত বলেই মাংসের কারাগার বরং আরও বীভৎস বলে মনে হয়। কাজলই পথিকৃৎ ; বেশ্যাজীবনের প্রামাণ্য না হোক বিশ্বস্ত চিত্র উপস্থিত করে রমেশচন্দ্র সেন আমাদের মেধাকে উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ করেছেন—এই মন্তব্য করার সময়ে কোন দ্বিধা আমাকে স্পর্শ করে না।

স্মরণীয়তর অথবা মহৎ উপন্যাস হয়ে উঠবার পথে কাজলের প্রতিবন্ধক অতএব অতিরঞ্জন নয় ; সমস্যা অন্যত্র এবং তা দর্শনশূন্যতা। জীবনের প্রবীণতা সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হলে যে ভাবপ্রতিভা ও প্রজ্ঞা বহির্মুখী চেতনারাশির উপর কাজ করে ধ্রুপদী শিল্পের জন্ম দেবে—শোকাবহ হলেও রমেশবাবুর মধ্যে তার অভাবই চোখে পড়ে বেশি। যা কিছু প্রত্যক্ষ—এই লেখক তা দেখেছেন। ফলে, আবারও বলি, সখী পরিবেষ্টিতা ও ক্রেতাবন্দিতা কাজল একটি চমৎকার নিরীক্ষা। স্বয়ং কাজলের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় অবশ্য রমেশবাবু সংমিশ্রণের পক্ষপাতী কিন্তু সেখানেও লক্ষ্য করার যে কাজলের যাবতীয় কামনা ও তৃষ্ণা ইহলৌকিক সুখের জন্য। তার শূন্যতা অভাব থেকে আর তাই বিস্তৃত হলেও সীমাহীন নয়। আদি ও অন্তে পার্থিবতা তাকে ছেড়ে যায়নি। দস্তয়েভস্কি যেভাবে ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টে সোনিয়ার মাধ্যমে মানুষের পাপ ও পুণ্যের সমগ্র মূল্যায়ণ করেন রমেশবাবু তাতে পারঙ্গম নন। সুতরাং সোনাবাগানী মৃতের সমাজ এমন কোন "প্রেমের" ছোঁয়া পায় না যাতে পুনরুত্থিত হওয়া সম্ভব। অন্যদিকে রমেশ সেন এমন নিবিড়ভাবে আঞ্চলিক প্রতিচিত্রণের আকাঙ্ক্ষায় নিবেদিত যে আরোহণ-অবরোহণ-পথ শেষ হলে সোনাবাগান ছাড়িয়ে কাজল

গুস্তাভ ফ্লোবেয়রের শ্রীমতী বোভারির মত কোনো মৃন্ময় সর্বজনীনতাও অর্জন করে না। ক্লেশ ও কোলাহলে হিমীভূত হয়ে যায়। আলোচ্য উপন্যাসের সমাপ্তিতে কন্যার বিষয়ে কাজলের সংকল্প, মধ্যবিত্ত রোমান্টিক পঠনাভ্যাস থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বিদ্রোহের শপথবাক্য। বিনীতভাবে বলার যে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন অন্তত তাঁর প্রতিভার কাছে বিশ্বস্ত থেকে ছদ্ম-বিপ্লবের পথ পরিহার করেছিলেন। ওই অন্তিম সঙ্কল্প জননীর বিলাপ মাত্র; উত্তরণের পথ যদি এত মসৃণ হত তবে কাজল উপন্যাস রচনার প্রয়োজনই থাকত না। সমাধানের "মধুরেণ সমাপয়েৎ" না দেখতে পেয়ে লেখকের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা তো বেড়েই যায়।

ছিদ্রান্বেষণ সমালোচকের একমাত্র লক্ষ্য নয় এবং সমমর্মীতা তার পাথেয়। পরবর্তী প্রজন্মের বাঙালী হিসেবে রমেশবাবুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করি যে কলকাতার জনসমুদ্রে যে দ্বীপটি সবচেয়ে রহস্যময় কুয়াশায় ঘেরা তার প্রথম মৌলিক মানচিত্র নির্মাণ করেছিলেন তিনি। আজ রমেশবাবু লুপ্তপ্রায়, অদৃশ্য, মগ্নমৈনাকপ্রতিম কিন্তু তথাপি সাহিত্যের ইতিহাস এতবড় কীর্তিনাশা নয় যে কাজল অনতিদূর ভবিষ্যতে পুনর্বিবেচিতা ও বরণীয়া হয়ে উঠবে না।

সুবর্ণরেখা অভিযান পরিত্যক্ত হয়েছে। আপাতত রক্তের মধ্যে কোন ছোরা চালাচালির প্রস্তাব নেই। সতীর শীতল শব বহুদিন কোলে নিয়ে অত্যন্ত অকপটভাবে উমার প্রেমের গল্প যে পেয়েছে, আমাদের গ্রামগুলি, সেখানে আর গল্প নেই। আমাদের উজ্জ্বল রৌদ্রের এই শহরে আর কথকতা নেই। লাল কমলের দেশে আজ গল্প নেই। এক মায়াবী আপৎকালীন পরিস্থিতি আমাদের কলমকে জানিয়ে গেছে চেম্বার অফ কমার্সের নির্দেশ।

শিল্প রোদনের নিমিত্ত নহে। কিন্তু ইহাতে রোদন।

পাঠকের সঙ্গে আমরা রিরংসাপ্রবণ দাম্পত্য রাখতে চাই।

প্রাপ্ত সমীক্ষায় দেখা যায় উকিল এবং এম এল এ-রাই যথার্থ বুদ্ধিজীবী। শিল্পীর চেয়ে মহান নির্বোধ আর কে?

এস্টাব্লিসমেণ্ট—অর্থাৎ ছানিতাড়িত বুর্জোয়াদের হাসপাতাল। আমরা শত্রুরূপে তাকে ভজনা করব না।

প্রকৃত বিপ্লব অন্তর্বর্তী কাল রাখে। স্থায়ী বিপ্লব ও স্থায়ী ব্যর্থতা সমানুপাতিক। কোন শিল্পের জরায়ুতে যে পাপ ও নির্যাতন তাকে অনুভব করতে হলে আরও নিশীথচারী হওয়া প্রয়োজন।

কতদিন স্বপ্ন দেখেছি বুর্জোয়াদের সমস্ত স্যানাটোরিয়াম লুঠ হয়ে গেছে। আর আজ আমার গণতন্ত্র সংবিধান ছাড়াই শাসিত হয়।

অনাধুনিকতা কি?—যেমন ইয়াংকিপনা যেমন শোধনবাদ।

আধুনিকতা কি? আমি—আমার বহুবাচনিক আত্মা—তার বোধগম্যতার চূড়ান্ত প্রকাশ। এক মর্মন্তুদ পাপবোধ অদৃশ্য ঘাতকের মত; আলোক সংশ্লেষের দিকে টেনে নেয়। যেন পরিত্রাণ নেই। যাত্রা অন্তহীন। মানবপুত্রের বিপর্যস্ত উত্থান, উত্থিত বিপর্যয় অন্যথা।

কার্লমার্কস কেন আধুনিক—ইতিমধ্যে প্রজ্ঞার দ্বারা ঈশ্বরকে প্রতিস্থাপনের স্পর্ধা রেখেছি। 'শাশ্বত' বাহুল্যজ্ঞানে বর্জিত হয়। মুদ্রারাক্ষসের ব্যভিচারে নিসর্গ সকাশে বিপন্নতা, ফলত বুঝি প্রাতিষ্ঠানিক ষড়যন্ত্র গণিকা মন্ডপ প্রভৃতির বিনাশেই শিল্পের মুক্তি। আমি সৌন্দর্যনাশক মাত্র।

শব্দের সহিত যে ধর্ষকামে রত—সেই লেখক। যে ভালবেসেছে কোন দলিত কুসুম—সেই জানে ভাষা ব্যবহার।
অবশ্যমান্ত ক্রোদ মোনে আমাদের থেকে প্রাজ্ঞ ছিলেন, না হ'লে প্রায় একশ বছর আগেই তরুণ অর্ককে অভিবাদন জানিয়ে সাল ঁ স্থ রেফিউজে অন্তরীণ হবেন কেন?
বঙ্গদর্শনের শতবর্ষ। আপৎকালীন অবস্থা স্বভাবত। নিরপেক্ষতা—বঙ্কিমবাবু থেকে কমল মজুমদার পর্যন্ত প্রসারিত হিণ্ট্যারল্যাণ্ড চুরি হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। স্পষ্টভাষায় বলুন কে কে অঘোষিত বিপ্লবের স্বপক্ষে? কে কে মাতৃভাষার সম্ভ্রম রক্ষার্থে অত্যন্ত বিজ্ঞাপনহীনভাবে রক্তদানে প্রস্তুত?
পুতুল নাচের ইতিকথা আর সাতটি তারার তিমির আমাদের প্রধানতম ধর্ম-পুস্তক আপাতত।

ভিনদেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন
লাজরক্ত হইল কন্যা পরথম্ যৌবন।

কে ওই শ্বেতকায় পুরুষ আমাদের উদ্ভিন্নযৌবনা মাতৃভাষা যাকে দেখে নতনয়না—স্ফুরিতধরা। ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিও? পাদ্রি মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ? তার নিবাস শ্রীরামপুর প্রেসে না ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আমরা জানি না। কিন্তু এ বিবাহ যে সুখের হয় সে সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ আছে।

আজিলীয় প্রস্তর কি স্থিতিস্থাপক?
This wasn't the film we'd dreamed of. This wasn't the total film that each of us had carried within himself...the film that we wanted to make, or more secretly, no doubt...that we wanted to live.
(পুরুষ এবং নারী; জাঁ লুক গোদারের চিত্রনাট্য থেকে) মানুষ এভাবেই শুরু করে। ফিরে আসে না আর। গর্গ্যা চলে গেছে···মেলভিলও। কনিষ্ঠ বিপ্লবী পল—সেও আত্মহত্যা করে।
ভ্রমবশত যে ভ্রূণের জন্ম দিয়াছি তাহাই আমাদিগকে পরিচালনা করিবে। অধঃপতিত দিনলিপি—অবশ্য স্বেচ্ছা-নির্বাচিত—আমাদের নিয়তি। নিজের শ্রেণী

পরিচয় অস্বীকার করি। মানব চক্ষু অবলোকন করি। এবং আধুনিকতা বিষয়ে জনসাধারণের অসামান্য তৎপরতা আমাকে ভাবায় বাস্তব কি আরও উৎকৃষ্ট মায়াসভ্যতার চেয়ে গাঢ়…গাঢ়তর? সে ঈশ্বর নয়; বোধহয় এমন কেউ আমরা যার স্বপ্ন হয়ে স্বপ্নের মধ্যে বাস করি। পৃথিবীর সমস্ত পরিসংখ্যানবিদ্‌দের মেধাকে বিসর্জন দিয়ে বরং বলি হৃদয়, সময় হং, রক্ত পরীক্ষার। এই শহর তোমার শরীর…সংসার…সমস্যা?

লেখক কালপুরুষের দিকে তাকায়। পথ নির্জন। পথে স্তব্ধতা। ঋতুচক্রের দায়ভাগী সে শরযোজনা করে।

১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই নবীন বৈশ্যটি কি প্রকারে চক্ষুরুন্মীলন করেছিল তা আমার জানা নেই। আজ সে ইতিহাসকে 'অপরাধ'-কথাটির মর্মার্থ ব্যাখ্যা করে দেয়। কোয়াংত্রি শহরের ঘরে বাইরে যুদ্ধ চলে; কলকাতায় সান্ধ্য-আইন হাতছানি দেয়। স্ব-জাতির পাপ আমাকে পাইলেট-প্রতিম করে। তথাপি এই হাতে আয়স্ত ছুরিকা শোণিতে তপ্ত; প্রেমিক যুবক আমার দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া ছিল। (পাঠক! আদালতে রেজি স্তবরের জবানবন্দী স্মরণ হয়?) অন্তিমে প্রস্তাব আসে বিদ্যুত সরবরাহের র‍্যাশনিং হেতু রাজপথে রক্তের দাগ আর চোখে পড়িবে না! প্রাচীন তূণীর পরিত্যাগ করিয়াছি। তথাপি শতশত ক্ষুধিত দেওয়াললিপি: ওই পরবাসী চক্ষুগুলি আমাকে বিদ্ধ করে। হায়! আমার মুক্তি নাই। বুঝিলাম আমাদিগের মধ্যে ফ্রানজ কাফকাই যথার্থ পুণ্যবান। কাফকাই শ্রেষ্ঠতম অন্তর্ঘাতক।

এবং মধুরিমা দেবযানী পৃথিবীর যাবতীয় সুন্দরী অনূঢ়া কাফকা পাঠান্তে রমণসুখে লিপ্ত হয়। সুন্দরীর অধিষ্ঠান র‍্যাঁবোর জানুতে; শ্রান্তি তবু। বোদলেয়ার শহীদস্তনে মুখ রাখেন। অত্যন্ত অনবধানে স্নানরতা রমণীদের দেখে ফেলি। অন্যমনস্ক এবং উত্তোলিত বাহু; আমাকে ডাকে। (দেগা আমার অপ্রিয় যদ্যপি) পরমুহূর্তে সে এস্টার—বার্গমানের নায়িকা বীর্যগন্ধে রমণস্পৃহা জানায়। মানসপ্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায় আকাশে আকাশে। আমি কি তবে প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক যৌনক্ষোভে চঞ্চল? ভুল, সে সব ব্যাপার মনোপলি প্রেমের! (তথায় পঞ্চবিংশতিবয়স্ক যুবা সতত বালক রূপেই প্রতিভাত; রূপসীর শ্রোণীযুগ তাহার ক্রীড়ার বিষয়।) গগ্যাঁর নির্বোধ নারীরা বড়োজোর আমার প্রণয়িনী হতে পারে।

বুদ্ধিজীবী অধ্যাপকেরা কি করে যে এত সহজে সত্যবাদী হন! অথচ ইউক্লিডীয়

জ্যামিতিতে সত্য বাস্তবসাপেক্ষ। বাস্তব যেমন বিন্দু, তল আবার স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সত্য বা সময়ের আর্যতামুক্ত প্রয়োগ আছে কোথাও? আপেক্ষিকতার শরণ নিতে হয় অতএব। কাল কি তৃতীয় ধর্মে নিহিত? গতি কি চূর্ণীকৃত? দস্তয়েভস্কি সম্ভবতঃ অনুমান করেছিলেন ভবিতব্য না হলে বিবরবাসীর আত্মকথা আবৃত্ত···ক্লান্তিকর হবে কেন? সঙ্গতি···রুটিন ওয়ার্ক হারিয়ে যায়। সীমামোচন অসম্ভব আমি জানি। আমার সামনে একটি দ্বান্দ্বিক মুহূর্ত—তার নিরসন—পুনরায় দ্বন্দ্ব। বিশেষ দেশ কাল প্রভৃতিতে আমার প্রতিবিম্ব। নেই, নৈর্ব্যক্তিক নিরীক্ষণ···অনপেক্ষ প্রজ্ঞা কোথাও নেই। শিল্পমাত্রই নিজস্ব সমর্পণ। হ্যাঁ, সমালোচনাতেও একধরনের অন্তর্ভুক্তি থাকে, ডগমা মনে হবে' হয়ত অন্য কারুর। উপরন্তু সমালোচনা অন্ততঃ আমার বিচারে স্থানাঙ্ক নির্ণয়—আমার বৈধ অবৈধ বিশ্বাস, প্রাপ্ত উত্তরাধিকার, সময়সীমা, শ্রেণীতবস্থান যেখানে অক্ষ বা কোটি।

আগামীকালের শিল্প কি আরও প্রাতিস্বিক, আরও আত্মজৈবনিক দিনযাপনের উপাখ্যান! আর কিই বা হবে? প্রতিরাত্রে মৃত্যু তাকে দেখে যায়। শিল্পকে যে ভালোবাসে শিল্পের কাছে তার ঋণ। তাই জাগরণ। না, শিল্পী, তুমি হতে চেও না আধুনিক। আধুনিকতা তোমাতে স্বয়ংপ্রকাশ। তোমারই অপত্য। দেখ কহিতেছে:

এই আমার শরীর; তোমার ভক্ষ্য হউক। এই আমার রক্ত আমার স্মরণে পান কর।

আধুনিকতাটা শরীরে নয়; মননে। মহিলাদের মৃগনাভি বিতরণে মনোযোগ অর্পণ করা উচিত।

অয়ি পদ্মপলাশলোচনে! তোমার স্তনে লিপ্ত দেখেছি কণ্টকের হার—বোদলেয়ারের পর থেকেই এরকম শুরু হয়েছে।

সৌন্দর্য হচ্ছে কুশ্রীতার যোনি ভ্রমণ, নৈতিকতা হচ্ছে অস্বীকার এই শব্দের প্রয়োগ প্রতিটি রক্ত কণিকায়। কিন্তু আমার রিরংসা আমার অনাচার যেন কোন বিপ্লবীর পাঠ্য না হয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে মদন তাঁতিই যে শিল্পী এবং আমরা ব্রাত্য—এ সত্য আমাদের গোচরে আসে ১৯৫৬র তেসরা ডিসেম্বর।

সব থেকে ঘৃণার যা তা হচ্ছে মিডিয়ক্রিটি। হয় সাম্রাজ্য নয় পতন—লেখকের

আর কোন কররেখা নেই।

নারী, এমনকি আদিমতমাও, শিল্প নয়। গর্গ্যা শিল্প কেন? যেহেতু তা স্বভাবকে প্রতিহত করে।

আমরা শীর্ণকায়। আমরা সংগঠনহীন। তবু পাঠককে কেন অ্যালায়েন্সে ডাকব? আমি প্রণয়ন করতে চাই এক অননুমোদিত গন্থলিপি যাতে আমার যাবতীয় ব্যর্থপ্রেম এবং অরণ্য সন্ধান। আমাদের আবার ফিরে তাকাতে হবে বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে; সেই প্রবল মেরুদণ্ডী পূর্বপুরুষ—তিনি ডমিনেট করেছিলেন পাঠকদের।

পিকাসোর গুয়ের্ণিকা দেখবার পর আমি প্রথম বুঝি আধুনিকতার যে রাশিচক্র নির্দেশিত হয়েছে কবিতায় বোদলেয়ারে; গদ্যে দস্তয়েভস্কিতে—শিল্পে তা আবৃত্তি করে গোইয়ার নাম।

সব সময়েই থাকবে একটি অমিত পরাক্রমশালী পশুরাজ ও কোন নিরীহ মানুষ যাকে শহীদ বলা হবে। একদা কবির জন্য পৃথিবীর অ্যাম্ফিথিয়েটারে দর্শকের একটি স্বর্ণসিংহাসন সংরক্ষিত ছিল। কবি স্বপ্ন দেখতেন সিংহটি ক্রমে জিতেন্দ্রিয় হবে; চিনতে পারবে প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষটি আসলে উপকথাখ্যাত অ্যাণ্ড্রোক্লিস। ফরাসী বিপ্লবের পর থেকেই অবস্থা পালটে গেল। রুশো ও সামাজিক চুক্তি—১৭৬২। মার্কস ও পুঁজি ১৮৬৭। স্বপ্নের উন্মেষ ও স্বপ্নভঙ্গ—মধ্যে একশো পাঁচ বছর।

যা কিছু অসমাপ্ত, যা কিছু অপস্রিয়মান তার বিরুদ্ধে অক্ষরের প্রতিরোধ হচ্ছে কবিতা।

কবি, একজন যিনি ক্রমাগত নিজের সঙ্গে কথা বলেন। গল্পকার, একজন যিনি ক্রমাগত অন্যের সঙ্গে তর্ক করেন।

কবি ও নির্জনতার হর-গৌরী সম্পর্ক প্রসঙ্গে যে কিম্বদন্তী চালু আছে তা আসলে প্রতিক্রিয়াশীল রটনা। বরং কবিতার ইতিহাস খুঁড়লে দেখা যাবে জন্মক্ষণ থেকেই যে-মানুষের হাত থেকে নিঃসঙ্গতার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, সে কবি।

কালিদাস ন্যাকা ছিলেন না; তাঁর রচনা পুরুষের কাব্য। বৈষ্ণব কবিতার পর থেকে বাংলা কবিতা রবীন্দ্রনাথের সৌজন্যে একটি বৃহন্নলা অবয়ব পেল। হয়ত খানিকটা ভুল বোঝাবুঝির ফল তবু তার নন্দনতাত্ত্বিক সমর্থনের কোন অভাব নেই। এ সবের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটা কি?

কালিদাস বোধ হয় হীনমন্যতায় ভুগতেন না। তখন হিন্দু সভ্যতার স্বর্ণ যুগ। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর সময়ে হিন্দুরা পতিত হয়েছে। তারা রাজশক্তি থেকে অপসৃত ও হীনমানস। তাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে পরাজিতের মনোভাব। যার ফলে অক্রিয় সমকামিতা—নিজেকে স্ত্রীলোক রূপে কল্পনা। রবীন্দ্রনাথ, আমার তো মনে হয়—কালিদাস নয়, অনেক বেশী অধমর্ণ বৈষ্ণব কবিদের। তবু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রবীন্দ্রনাথ তাদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রজননক্ষম পুরুষ। কিন্তু তাদের উত্তরাধিকার? অন্তত যা মুখ্যভাবে প্রচলিত সুন্দর কিন্তু পুংচিহ্নহীন।

দেবদূতপ্রতিম পাবলো—তাঁর মৃত্যুর পর বাজারে বাজারে রোদন সহসা শঙ্কা জাগায় ইনি শিল্পী না কামুক?

আমি মানুষের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চাই। এবং আমি চাই শব্দের উপদ্রুত অঞ্চলগুলো থেকেই আমার শিরাসংস্থান নিরূপিত হোক।

নির্যাতিত অভিমান—এই শব্দদ্বয় ক্রমে অবয়ব পাল্টায় ও এক্ষণে কমলকুমার মজুমদার নামক লেখকের বিশেষণ রূপে গৌরব চাহে। সত্য কমলবাবু কখনোও ঈষৎ ক্লান্তিকর তথাপি শিল্প তাঁহার স্থায়ী প্রণয়িণী; বোদলেয়ার দেলাক্রোয়া সম্বন্ধে যেরূপ কহিয়াছেন।

অমিয়ভূষণ মজুমদার—ধূর্জটি প্রসাদের অন্তর্যামী গ্রাহকদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়। বাংলা গদ্যসাহিত্যের শেষ বুদ্ধিজীবী সম্ভবত।

লেখা কেন—এ প্রশ্ন লেখককে বিমূঢ় করবেই কেননা শব্দ মধ্যে শেষপর্যন্ত রক্ত চলাচল ভিন্ন আর কিছুই শ্রবণে আসে না।

Intellectual কথাটির যথার্থ প্রতিশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বুদ্ধিজীবী শব্দটি নানা কারণে আলগা, আমরা বরং সদর্থে মেধাজীবী ও অসদর্থে বুদ্ধিবণিক বেছে নিচ্ছি।

আমরা যা চাই তা হচ্ছে মানুষের মরচে পড়া মুখ এবং নৈতিক বিমর্ষতা এবং গর্ভবতী এক স্তব্ধতা।

ট্র্যাজেডির নায়কদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? হ্যামলেট, ওথেলো বা লিয়ার বা ম্যাকবেথ নয়। এই প্রথম মানুষ এবং শিল্পী যে যন্ত্রণাকে আত্মানুসন্ধানের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে। এই প্রথম মানুষ; সে একাকী বেদনাকে প্রলম্বিত করে যে অন্তর্গত শোণিতক্ষরণ Justified। আর সবাইতে উৎক্ষেপ; তাঁদের মধ্যে প্রতিবাদ। হ্যামলেট স্থমিত, হ্যামলেট আত্মহননকামী। প্রথম আধুনিক।

ধন্য স্বকটুনোভস্কি !

উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের প্রণম্য। তিনিই আমাদের লেখকদের মধ্যে সাত্র কথিত একমাত্র অস্তিত্বচেতন জীবন-প্রণালীর প্রতীক। তাঁর সঙ্কট শুধু আত্মিক নয়, ইচ্ছাকৃত। প্রবল মেরুদণ্ডী তিনি ভবিতব্যকে পুণ্য করেছেন দার্শনিক ভাবে।

বাংলাভাষা স্বরাঘাত প্রধান এবং শব্দ গুণ্ঠনবতী। সুতরাং শ্রেষ্ঠ গদ্য হবে মন্থর, ঈষৎ কবিতা যার শিরা ও ধমনীতে প্রকীর্ণ। তথাপি এ মনে হওয়া অনিশ্চিত ; শব্দের যোনি পর্যন্ত কেউ পৌছতে পারে কি ?

অন্যান্য অনেক কিছু বলবার মুদ্রাদোষে যখন কোন গদ্যলেখক "পাথর" কে পাথর ও "নদী" কে নদী বলতে পারেন না তখন তার ব্যর্থতা স্বতঃপ্রমাণিত। দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বাংলা গদ্যে শব্দ তার ইনস্ট্রুমেণ্টাল ফাংশন হারিয়েছে অনেকদিন।

শিল্প এমন কোন দামি ব্যাপার নয়। আমার তো মনে হয় যে কোন লেখকই কলম ছেড়ে দেবেন, এই শর্তে যে তাতে, নব্বই কোটি তো সংখ্যার দিক থেকে অনেক, এমন কি জনা দশেক মজুরও আলো অন্ন আকাশ ও নারীকে আরও ভালোভাবে খুঁজে পায়।

আমাদের স্পর্শাতুর কন্যাদের মন লিপষ্টিক ও পপ গানের অন্তরালে উলু ও আলতা খুঁজে নিচ্ছে ঠিকই।

আমারে যে জাগতে হবে। কী জানি সে আসবে কবে—খুব অন্তহীনভাবে জেগেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ও হ্যাঁ, শিল্পও এসেছিল তার কাছে।

ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার ইচ্ছা আমাদের নেই কেননা আজ পর্যন্ত বুদ্ধিজীবী ছাড়া আর কেউই তাতে যোগ দেয় নি। আমরা বড়োজোর বলতে পারি হামটি ডামটিরা সচরাচর দেওয়ালের ওপরেই বসে থাকে। জরুরী অবস্থায় তারা হঠাৎ পড়ে যায়। তাদের ব্যথা লাগে। ও তারা ঈষৎ কাঁদে। এখন অবশ্য তারা যথারীতি আবার দেওয়ালের ওপরে উঠে বসেছে।

সমগ্র বাংলা সাহিত্য আজ রামের সুমতি পালা। এবং তার বৌদি পাঠিকা ও দ্যাওর লেখক যাবতীয় ভুলবোঝাবুঝির নিরসন ঘটান এই ভাবে যে রাজনীতি অতীব কদর্য বস্তু।

মেয়েদেরও ঋতুবন্ধ হয়। আশ্চর্য এই সব লেখক এদের কলম স্তব্ধ হয় না

কখনোও।

সেন্টিমেন্ট ও সেন্টিমেন্টালিটি কথাদুটোর অর্থ ও তফাৎ কি অসম্ভব বুঝেছেন চার্লি চ্যাপলিন!

কুড়ি শতকীয় আধুনিকতা মানে ক্রোধ ঘৃণা ও উদ্বেগের রসায়নজাত একটি যৌগ। পাপবোধ বিষয়ক ধারণাটি একান্তভাবেই খ্রীস্টীয় হওয়ায় আমাদের পক্ষে এদেশে কতটা অনারোপিত ভেবে দেখা উচিত।

An ignorant army clashed by night—ম্যাথু আর্ণল্ড থেকে আমার মনে পড়েছে অশনি সঙ্কেত দেখবার ঠিক আগে। দেখা হয়ে গেলে মনে পড়ে পল রুবেন্সের আঁকা স্যাটার্ণ। যেহেতু গোইয়ার ওই নামের ছবিটি দেখবার পর রুবেন্সকে স্থূল artisan মনে হয়।

আমাদের যে সব বন্ধু ভাবেন লেখা হল গোলাপ কিংবা অরাজকতা তাদের বলা দরকার, কোনটাই নয়, কিন্তু তৃতীয় কিছু। আমাদের লেখা-টেখা পড়লে কি বোঝা যায় এটা গ্রীষ্মপ্রধান দেশ—কিছু ট্রপিক্যাল লেখার জন্ম হোক।

ইউ বি আই শহর, লুম্পেন সংস্কৃতি ও বই মেলা—এখানে প্রতিভা ও শিক্ষাই একমাত্র শত্রু এ সত্য জেনে যেতে লেখকের কোন জ্যোতিষির প্রয়োজন হয় না।

গীতগোবিন্দ অতিশয় ইরোটিক কাব্য।

আমরা, যাহারা সচরাচর রৌপ্য শিকারী ও রৌপ্যের অন্তরালে রূপসী তাহারাও বুঝিতেছি আজিকার নিশীথ অন্তঃস্বত্তা।

মধ্যরাত্রির জরায়ু ও সৌরকরময় উত্থান

বার্গমান যেভাবে ছিন্নযোনি বসন্তকুমারীর ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করেছেন ; চতুষ্কোণে রাজকুমার যেভাবে তাকিয়েছিলো বিবসনা সরসীর দিকে—সে ভাবেই আমি দেখতে চাই আমার জীবনযাপন প্রণালী। আমি চাই অস্তিত্ব বিষয়ক অনুসন্ধান আবার নতুন করে শুরু হোক—চিকিৎসকের শবব্যবচ্ছেদ যথা। সমস্যা—এই শব্দটিকে আমি সন্দেহ করি। প্রকাশ্য দিবালোকে আমি তার অস্ত্র পরীক্ষা করি। অর্থাৎ বলতে চাই বিজ্ঞানমনস্ক নৈর্ব্যক্তিক ঈক্ষণের কথা। এ প্রসঙ্গে অবশ্য প্রথমে—তখন কিশোর, মার্কসবাদের ছোঁয়া লাগেনি—ভেবেছিলাম এলিয়ট কথিত ডি-পার্সোনালাইজেসন। কিন্তু আজ ব্রেশ্‌ট্

আমাকে কাছে টেনে নিচ্ছেন আরো। আমরা পরিচিত নক্ষত্র ও অশ্রু মুছে ফেলে নতুন এক প্রদেশে প্রবেশ করছি যেখানে সেই প্রাচীন গ্রীক নন্দন-তাত্ত্বিকটিকে রাজস্ব দিতে হবে না।

Death with illusions! এই আমরা যারা সীমালঙ্ঘন করেছি, ঘুচিয়ে দিতে চাইছি এ মোহ আবরণ যা মায়াসভ্যতার তবু এখনও রয়ে গেছি মধ্যমপথে বিকেলের ছায়ায়, তাদের সকলের হয়ে উত্তর দিয়েছেন ব্রেশ্‌ট্‌। সম্প্রতি ভাইমার ন্যাশনাল আর্ট থিয়েটারের পরিচালক ফ্রিট্‌স্‌ বেনেভিট্‌স্‌-এর কাছ থেকে জানা গেল ব্রেশ্‌ট্‌ বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো'র জন্য এক প্রকল্প রচনা করেছিলেন; মূল নাটকটির অবিকল মঞ্চায়নের সঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন পশ্চাৎপটে মানুষের বৈপ্লবিক প্রগতির প্রোজেকশন্‌। এইরকম ভাবে চলচ্চিত্রের জন্যেও আমরা চিত্রনাট্যের কথা ভাবতে পারি। কাফ্‌কার 'ক্যাসল' উপন্যাসটির সঙ্গে লেনিনের শীতপ্রাসাদ দখল অভিযান মণ্তাজ প্রথায় যুক্ত করতে পারি। যদি এসব পরিকল্পনা সফল হয় তবে তা হবে প্রাক্‌-ইতিহাস যুগে আমাদের ইতিহাস চেতনার মহত্তম দলিল। ব্রেশ্‌ট্‌ আমার প্রিয়তর হ'লেন।

চূড়ান্ত টালমাটাল আরেকদিন জঁা-আর্তুর র‍্যাবো—সেই চক্ষুষ্মান বালক এসে পৌঁছেছিলেন পারিতে। এবার এলেন ব্যের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট্‌। পারিতে নয় বার্লিনে। সময় তখন উত্তাল। কংক্রিট অ্যাসফল্টের শহর আশা নিরাশায় হৃতচক্ষু।

> I, Bertolt Brecht, am from the black forests
> My mother carried me, as in her womb I lay,
> Into the cities. And the chill of the forests
> Will stay within me to my dying day.

তখন বিষণ্ণ পাতা ঝরার দিন। তখন কৃষ্ণ স্বস্তিকার অপচ্ছায়া। কি দেখতে পেলেন তিনি? নপুংসক রাজনীতিকদের নৃত্য। মুদ্রারাক্ষসের ব্যাভিচার। প্রতিশোধ কামনায় ছানিতাড়িত মানুষ।

দক্ষিণ সমীরণে আহা! বিপর্যয় ছিলো।

সায়াহ্নকালীন দিবাকর এবং কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষের পুষ্পসকলে ঋতুরক্ত দেখে সে বিচলিত। সরোবর সমীপে উদ্যান—তাতে বৃদ্ধের স্বাস্থ্য, প্রণয়কূজন ও স্থির প্যারাম্বুলেটর; যেন ঈশ্বরের বসতি নেই কোথাও, যেন পুরকামিনীরা সংস্কৃতি-মেলায় মৃগনাভি বিতরণ ক'রবে না আর অথবা মানবসভ্যতার পত্তনে মৌল

প্ররোচনা অশ্লীলতার—কেননা প্রশস্ত জনপথে একটি মৃত ভিক্ষুক তরুণীর নির্বিকার স্তন তার ভিক্ষাকে অবৈধ প্রমাণিত করে সে সময়।
এই সেই নারী, একে তুমি চেয়েছিলে ; এই সেই বিশুদ্ধ সমাজ—
ব্রেশ্‌ট—কবি হিসেবে যিনি সুস্থ লিরিক্যাল, তিনি নির্জনতার প্রয়াসী হতে পারতেন ; যেমন হয়েছিলেন তাঁরই স্বদেশবাসী রিলকে। কিন্তু মর্মে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞানের প্রহরা তাঁকে সহজলভ্য ভবিতব্যের দিকে যেতে দেয়নি। তাঁর মুক্তি মানবিক প্রদাহর মধ্যেই—

I am a Playwright, I show
What I have seen. At the markets of men
I have seen, how men are bought and sold.
This, I the Playwright show.

সময়গ্রন্থির বিস্তৃত উন্মোচনে তাঁরই পূর্বপুরুষ কার্ল মার্কসকে শিক্ষকতায় বরণ করে নিলেন ব্রেশ্‌ট। তাঁর স্নেহ স্পর্শ করে শ্রমজীবী মানুষের ললাট। তাঁর নাটক ও কবিতা আলোকিত হলো সেই দীপে যা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন লেনিন কোন এক হিমের রাতে। সাধারণ শিল্পী বড়োজোর সময়ের ধারাভাষ্যকার। তাই তিনি সাধারণ। আর আমাদের আলোচ্য এই নাট্যকারের তৃতীয় নয়নে ভবিষ্যত আবিষ্কৃত হ'য়েছে। তাই তিনি মহান। বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট সর্বকালের পক্ষে অবিস্মরণীয় এক কমিউনিস্ট। মানুষের প্রিয় তিনি আমারও প্রিয়। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে মার্কসবাদ, বিশেষ ভাবে নাটকে, কখনই ডগমা নয় তাঁর কাছে ; পুঁথিপড়া যান্ত্রিক কিছু নয়। বরং দ্বান্দ্বিক পন্থায় হ'য়ে ওঠার বিবরণ। সপ্রতিভ বাগ্মীরাই ভ্রমণ সমাপ্ত করে সুনিশ্চিত উত্তর পেয়ে। অজস্র রক্তপাত ও ক্ষয়রোগের মধ্য দিয়ে আমার ব্রেশ্‌ট এগিয়েছেন ; কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার মতান্তরের ইতিকথা মার্টিন এসলিন লিখেওছেন ; কিন্তু বিশ্বাসভ্রষ্ট হন নি, প্রতিনিয়ত ধীর এক আগ্রহে সম্পন্ন হয়ে পৌছেছেন একদিন সত্যের দ্বারমূলে প্রাঞ্জল দিবসে। একজন শিল্পী ; আকাশ তাঁকে কিছু শেখায় না শেষ পর্যন্ত ; গ্রন্থ পরিক্রমাও নয় ; ব্রেশ্‌টের জীবনের প্রতিটি অক্ষর জীবনের পাঠশালা থেকে আহৃত তাঁর প্রতিভার কাছে বিশ্বস্ত থেকে।

বিদায় সফদার

আমাদের প্রজন্মের সর্বতোভাবে উজ্জ্বল এক পুরুষ সফদার হাশমি বিদায় নিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সফদারকে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হতে হয়েছে হিংস্র ঘাতকের

হাতে। আসমুদ্রহিমাচলের নববর্ষ স্তব্ধ হয়ে প্রত্যক্ষ করেছে নক্ষত্র পতন।

পরিচালক, অভিনেতা, নাট্যকার, কবি, সাংবাদিক ও কমিউনিস্ট সফদার হাশমি ব্যক্তিগত জীবনে আমার গভীর বন্ধু ছিলেন। অত্যন্ত তীব্র ও অব্যর্থ ছিল আমাদের সম্পর্ক। কিন্তু সে প্রসঙ্গের অবতারণা অথবা সফদার হাশমির শিল্পকীর্তির মানচিত্ররচনা আপাতত আমার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। দীর্ঘ, নিবিড় পরিচয়ের সূত্রে আমার শুধু মনে হয়েছে এই মৃত্যু সফদার, সেই অর্থে বুর্জোয়া সভ্যতার যে কোন আধুনিক শিল্পীর পক্ষেই অমোঘ ও স্বেচ্ছানির্বাচিত নিয়তি। বীজ যেমন করে মহীরূহকে ধারণ করে থাকে, সফদার তেমনভাবেই বিকশিত করেছিলেন মৃত্যুর ক্রমউন্মোচন।

এক অভিজাত পরিবারের সন্তান সফদার হাশমি যখন সেণ্ট স্টিফেন্সের ঐতিহ্যসম্পন্ন অতীত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে নাট্যকর্মে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত করেন তখন থেকেই তিনি বেছে নেন সমান্তরাল সংস্কৃতির নির্বিকল্প অভিযান যার অন্য অবধারিত অনুসিদ্ধান্ত ছিল মার্কস্‌বাদের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য। মুখ আর মুখোশের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখতে সফদার অস্বীকৃত হয়েছিলেন। আশ্চর্য কি তাঁর প্রিয়তম আদর্শ ছিলেন, আন্তর্জাতিক-ভাবেই, বাঙালী শিল্পী ঋত্বিক কুমার ঘটক। কারেন্সির সুষমা, শ্রীরাম সেণ্টারের বাতানুকূল জ্যামিতি অথবা মাণ্ডি হাউসের নির্দেশপ্রাপ্ত সুসমাচারকে ছিন্ন পাদুকার মত পরিত্যাগ করে সফদার হাশমি ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকেন ফরিদাবাদ বা গাজিয়াবাদের শিল্পাঞ্চল অভিমুখে সন্ন্যাসীপ্রতিম। শেক্সপীয়র ও ব্রেশটের তন্নিষ্ঠ অনুগামী সফদারের প্রিয় বিষয় হয়ে ওঠে শ্রমিকশ্রেণীর মাতৃভাষা সন্ধান ও সেইসূত্রে রক্ত পরীক্ষা অর্থাৎ অন্তর্গত স্বাধীনতার ব্যবহার ও সম্প্রসারণ :

এবং প্রতিষ্ঠান কোন প্রমিথিউসকে সহ্য করে না। দণ্ডাজ্ঞার ছায়া থাকে মাথার ওপরে। সংস্থার পরিকাঠামো কোন না কোনভাবে একদিন প্রতিশোধ নেবেই। আর সফদার তা জানতেন কোলাহলবিরহিতভাবে। পূর্বসূরী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও আচার্য ঋত্বিক ঘটকের অনুসরণে, অবশ্যই ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর ভারতের শিল্পধর্মঘট চলাকালীন, তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন সজ্ঞানে—অনুশোচনাহীন। সম্ভবত সেজন্যই লোরকার বিখ্যাত চরণসমষ্টির মতো "হাল্লাবোল"—তাঁর অন্তিম নাটক—হয়ে ওঠে এক অলৌকিক শুদ্ধতাসম্পন্ন এপিটাফ।

লেখালেখির ব্যাপারটা কবে কিভাবে আপনার মধ্যে শুরু হয়েছিল?

৬৮-'৬৯ থেকে। কিভাবে ঠিক বলতে পারব না। ওই যে আপনাকে বলছিলাম না—বুঝে, না বুঝে প্রচুর পড়বার অভ্যাস। তা থেকেই বোধহয় কোন্‌টা বলবার কথা কোন্‌টা নয় এ রকম কিছু Standard of reference সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়। বলার কায়দাতেও যে প্রশিক্ষণের তারতম্য রয়েছে বুঝতে পারি। দুঃখের কথা আমাদের সমালোচনা এত পশ্চাদ্ধাবন করে, এত ব্যাখ্যা করে, উদাহরণ দেয়, দোষ-গুণ দেখায় যে তার কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু চাওয়ার থাকে না। খুব ইনফিরিয়র কাজ এসব। কিন্তু ধরুন বঙ্কিমবাবুর "কে গায় ওই" বা "একটি গীত" কমলাকান্তর কথা বলছি। পড়লেই বুঝবেন গান কি, গান কেন, গান কোথায়—বাংলার মাস্টারি নয় সে সব। সুতরাং মনে হয় কোন উপলক্ষে কিছু বলা যাক না।

প্রবন্ধ কেন বেছে নিলেন? মূলতঃ সাহিত্য সমালোচনা (চলচ্চিত্র সমালোচনার কথায় পরে আসছি)? কোন মহান সাহিত্য সমালোচককে আপনার আদর্শ বলে মনে হয়?

একটা তর্কের বিস্তারকে ধরে রাখতে গেলে প্রবন্ধ খুব সুসংহত মাধ্যম। সমালোচনা, আমার লেখায় যা—একটি দ্বন্দ্বের অবসান, আবার নতুন দ্বন্দ্ব, এই ভাবে ক্রমআরোহী বাস্তবতার সন্ধান, প্রবন্ধে অনেক কম পরিশ্রমে, অনেক ঝুটঝামেলা বাদ দিয়ে ফর্ম সংক্রান্ত লিমিটেশনকে অনেক সহজে তুচ্ছ করে, করা যায়। সাহিত্য, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা এসব নিয়েই মুখ্যত আমার সমালোচনা। ভেবে দেখবেন আমরা বাঙালীরা বহুদিন ধরেই আমাদের শ্রেষ্ঠ অনুভূতিসমূহ, আমাদের উৎকৃষ্ট মনীষা, আমাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের চিন্তা কাব্য কিংবা শিল্প-কলার মধ্য দিয়েই প্রকাশ করে এসেছি। আমাদের কোন ইতিহাসকার নেই যাকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করব, আমাদের কোন রাজনৈতিক নেতা নেই যে জীবনানন্দর সমপর্যায়ের; আমাদের এমন কোন দার্শনিক নেই যে মানিকবাবুর পাশে দাঁড়াতে পারে; একজন ঋত্বিক ঘটকের উৎকর্ষ সবসময়ই আমাদের সমাজ

কর্মীদের দলবদ্ধতার চাইতে বড় মাপের হয়ে দেখা দেয়। বিবেকানন্দ বা সুভাষবাবুর অবদান তো দেখা গেল শেষপর্যন্ত আমাদের আবেগ, বাগ্মিতা কিংবা সংগঠন শক্তিকে প্রসাধিত করে। সুতরাং আমি আমাদের ঐতিহ্যেতে বিশ্বস্ত থাকতে চাই; আমি যদি আমার জাতির শ্রেষ্ঠ দান পেতে চাই তবে শিল্প সাহিত্যের কাছে প্রসাদপ্রার্থী হওয়া ছাড়া তো উপায়ান্তর থাকে না।

আপনি জানতে চাইতে পারেন কবিতা তো লেখা যেতে পারত সেক্ষেত্রে, অন্তত উপন্যাস বা গল্প।

এখন মেধাবী হিন্দুরা যে প্রতিমা পুজো করে সে কি তারা পৌত্তলিক বলে? তারা কি জানে না যে ব্রহ্ম শেষ বিচারে নিরাকার? উত্তর আমাদের জানা আছে। লেখা বা শিল্পকর্ম যা Secondary Source আমার কাছে, Model বা Material হিসেবেই আসে। প্রাপ্ত অসম্পূর্ণ কিন্তু মূর্ত সত্যকে আমি interpret করে সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করতে চাই, সম্ভাব্যতার মধ্যে সম্প্রসারিত দেখতে চাই। এই যে বার্গমান বা জীবনানন্দ, গোইয়া এবং গোদার, বিষ্ণুবাবু কিংবা ঋত্বিক, কমলবাবু I would like to inject a little bit of reasoning into this apparent absurdity created by them all.

নিন্দা বা প্রশংসা দোষগুণ লোকশিক্ষা—এসব নিয়ে আমি least concerned. অবশ্যই ক্রিস্টোফার কডওয়েল। কডওয়েলের হোলিস্টিক প্যাটার্ন থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ও সমন্বয়ধর্মিতা ছাড়া আধুনিক সমালোচনা অর্থহীন হয়ে পড়ে। শুধু লজিকের কথা বিবেচনা করলে বঙ্কিমচন্দ্র বা এলিয়ট চমৎকার লেখক।

•

অনেক সময়ই আপনার লিখনভঙ্গিমাকে আক্রমণ করা হতো এবং হয়ে থাকে এই জন্যে যে আপনার প্রবন্ধ যথেষ্ট লজিক্যাল নয়; বরং কাব্যিক দ্রবণধর্মী, এটা কি গোদারের 'আমি প্রবন্ধের আঙ্গিকে গল্প লিখি এবং গল্পের আঙ্গিকে প্রবন্ধ,—এই সমস্ত শিল্পের আগামীযুগের দ্রবীভূত Cross fertilisation-এর সংকেতকে লক্ষ্য করে, নাকি গোড়া থেকেই অবৈজ্ঞানিক এবং না-প্রবন্ধধর্মী দৃষ্টিকোণ থেকে?

ভালোই করেছেন এ প্রসঙ্গ টেনে এনে, আধুনিকতার চেহারাটাই দ্রবণধর্মী; এক ধরনের unified sensibility—একধরনের বহুবাচনিক চিন্তার সংশ্লেষণ। কিন্তু তার আগে বলে নেওয়া ভালো যে যারা এই কথাগুলো বেশী বলেন তারা

হয় আমার লেখা, বিটুইন দি লাইন, ধৈর্য ধরে পড়েন না নয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর দান পদ্ধতিকেই সমালোচনার আদর্শ বলে ভুল করেন। সমালোচনা মানেই ধরাবাঁধা ময়না তদন্ত নয়, জীবনানন্দের "সমারূঢ়" নামে কবিতাটার কথা মনে পড়লো সুতরাং শবব্যবচ্ছেদ নয় বরং লক্ষ্য করেছেন আমি জ্যামিতির সাহায্য নিয়েছি—স্থানাঙ্ক নির্ণয়। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট দেশ-কাল পরিসীমায় কোন শিল্পকর্মের অবস্থান নির্ণয়। এবং শুধু অবস্থান নয়, সংশ্লিষ্ট সমীকরণ অর্থাৎ দার্শনিক মনোভঙ্গী প্রয়োজনীয় সম্ভাব্যতা ও সম্প্রসারণ সম্বন্ধেও পাঠককে শিক্ষিত করে তুলবে। আশা করি আমি বোঝাতে পারছি যে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে মেঘদূত পড়ে তাঁর মুগ্ধতা লিপিবদ্ধ করেন, সেই বিস্ময়, সেই বৈধ বিস্ময় সমালোচনার স্বক্ষেত্র নয় অন্তত আধুনিকদের পক্ষে নয়; তাতে সমালোচনা বা নন্দনতত্ত্বকেই একটি গৌণকর্ম বলে ভুল করার অধিকার জন্মায়। আর এই ভুলের ঐতিহ্য আমাদের দীর্ঘদিনের।

গোদারের উদাহরণ দিয়ে আমাকে সাহায্যই করলেন বরং। শুধু গোদার নন, আমার নানা লেখায় বলবার চেষ্টা করেছি যে, আধুনিকতার মৌল প্রতিজ্ঞাটুকু হল বক্তব্যধর্মিতা ও মাধ্যমজনিত সীমাতিক্রমণের ইচ্ছা যার শুরু গোইয়া দস্তয়েভস্কি বোদলেয়ার, চিত্রকলা-গদ্য-কবিতার তিন আলোকস্তম্ভ থেকে। যদি কবিতা, গদ্য, নাটক বা চলচ্চিত্র প্রবন্ধের নিকটবর্তী হতে থাকে তবে প্রবন্ধের নৈতিক অধিকার আছে কাব্য বা উপন্যাসের সংলগ্ন হওয়ার। প্রতিমুখী বিক্রিয়া, reversible reaction। আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার মত interdisciplinary approach তো আধুনিক প্রবন্ধে থাকবেই। আমার লেখাতে যদি কবিতা থাকে তো তা ইচ্ছাকৃতই; উপরন্তু আছে "শতবর্ষের বঙ্গদর্শনের" মত লেখা যা, a way of paying personal tribute, যাতে একই সঙ্গে চলচ্চিত্র গল্প ও কবিতার মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। আগেকার লজিক ছিল ডিফারেনশিয়াল যাকে আপনি বিশ্লেষণধর্মী বলছেন, সেখানে অর্জুন শুধু পাখীর চোখ দেখতে পেত আর সেটাই ছিল তার গৌরব। এখনকার প্রক্রিয়াটাই ইনটিগ্রাল, সংশ্লেষণধর্মী। এখন সমগ্র অরণ্যের পরিপ্রেক্ষিত অনেক জরুরী। এতে যদি পাঠকের আমাকে যথেষ্ট লজিক্যাল বলে না মনে হয় তাতে আমার আর কিই বা করার থাকতে পারে? গোদারের মতন করেই তাহলে বলি—I don't know how to tell stories. I want to cover the whole ground, from all possible angles, saying everything at once.

আপনার রচনা পদ্ধতি, সাধারণতঃ অভিযোগ করা হয়, খুব ল্যাকোনিক ; তার বিশ্লেষণধর্মী ব্যবচ্ছেদ এবং বিস্তার খুবই কম ;—অতএব প্রায়শ ঝাপসা ও দুর্বোধ্য থেকে যায় ; এটা কী ইচ্ছাকৃত ? অর্থাৎ আপনি কি সব পাঠককেই যথার্থ অর্থেই উচ্চশিক্ষিত ভাবেন ; নাকি প্রবন্ধ অতো কবিতাধর্মী কেননা আপনি নিজেই কনফিউজড ?

আপনার এই প্রশ্নটা আগের প্রশ্নেরই ধারাবাহিকতা। এর জবাব কিছুটা আমি আগেই দিয়েছি। আরও বলবার চেষ্টা করছি। কিন্তু পাঠকের প্রসঙ্গ এনেছেন সুতরাং জানাতে হয় আমি সাধারণত সরলতার বিরুদ্ধে ; যে কারণে যুগপৎ কুসুম ও সংবাদপত্রে অনীহা জ্ঞাপন করি। আসলে আমাদের অধিকাংশ লেখার মতই প্রবন্ধেও পাঠক পেয়ে যেতে চায় কমনীয়···মসৃণ·· স্বাদু শব্দগন্ধ ! আর আমার মাথা নীচু হয়ে আসে এই ভেবে যে এমন অনমুমোদিত গদ্যলিপি আমি আজও প্রণয়ন করে উঠতে পারলাম না যাতে আমাদের রক্ত পরীক্ষা ও জীবনের অব্যবহার্য কবিতাসমূহ। গড্ডলিকা প্রবাহের অপাপবিদ্ধ সদস্যদের জানাতে চাই —আমি ভালোবাসি উন্নাসিকতা। আমার লেখাকে যারা জটিল ও দুর্গমপ্রায় বলে অভিযুক্ত করেন—বলা ভালো তাদের—আমার কৃত্রিমতা স্বেচ্ছাকৃত; অর্থাৎ মেয়েলি নমনীয়তার পরিহার, এক ধরণের পরিকল্পিত ভায়োলেন্স যাতে চিন্তা প্রণালীর সমতলীয় এবং সরলরৈখিক অবয়ব আহত হতে পারে। যদি উনিশতকীয় প্রথা থেকে সরে এসে আমরা ১৯৪৬-৪৭-এর মত কবিতায় প্রণিধান করি জীবনানন্দর গুরুভার বক্তব্য, যদি আমরা আয়ত্ত করি কাফকার উপন্যাস, যদি আমাদের চোখে পড়ে বার্গমানের সেই আলোকচিত্রায়িত প্রবন্ধ উইণ্টার লাইট এবং আরও স্তরবিচ্ছুরণসহ তারকোভস্কির স্টকার তবে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না এসব কিছু নেহাৎ কবিতা বা উপন্যাস বা চলচ্চিত্রের compart-mentalisation নয়, আরও অনেক কিছু ; আর এই অনেক কিছু converge করছে সমালোচনাপ্রবৃত্তি ও প্রবন্ধের দিকে। সুতরাং একটা interchangebi-lity-র পরিপ্রেক্ষিতে রয়ে গেছে। তবে নন্দনতত্ত্বও অসূর্যম্পশ্যা সতীলক্ষ্মী থেকে যাবে কেন ? এই যে জাঁ জেনের ফুঁনবুল—সুন্দরীর কটাক্ষের অন্তরালে শিরা উপশিরার মত যার পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে কাব্য—তা থেকেই তো আমাদের তথাকথিত গবেষণাপত্র রচয়িতাদের শেখা উচিত কিভাবে আজকে, ঠিক এই মুহূর্তে সত্য বা সুন্দর বিষয়ে কথা বলতে হবে।

সমস্যা এই যে ঝাপসা থাকা, দুর্বোধ্যতা বা ল্যাকোনিক লেখালেখির অভিযোগ-গুলো আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির সম্পর্কে সুতরাং জবাব দেওয়া খুব অস্বস্তিকর, অন্তত আমার পক্ষে, না হলে বলা যেত পদার্থবিদ্যা বা গণিতের আধুনিক তত্ত্বসমূহ অনেক সময়েই মানসিক অনুশীলনের অভাবে ল্যাকোনিক মনে হতেই পারে। রবীন্দ্রনাথের রূপনারাণের কূলে তো খুব ল্যাকোনিক কবিতা। আসলে কি জানেন শিল্প অনুধাবন করতে গেলে একটা স্তর পর্যন্ত শিক্ষা আপনার থাকতেই হবে। আধুনিক বিজ্ঞানে এই সুবিধাটা রয়েছে। চট করে কেউ নিউট্রিনো বিম নিয়ে মন্তব্য করবে না ; সে জানে পরমাণুতত্ত্বের আঙ্কিক অভিব্যক্তি না জানলে বিষয়টা দুর্বোধ্য থেকে যেতেই পারে। কিন্তু শিল্পের অসুবিধা হল যে কোন সন্দেহজনক স্নাতকও অবলীলায় জানায় কমল মজুমদার ঠিক বোধগম্য নন। আসলে আমাদের পড়বার যে উনিশশতকীয় রীতিটি আছে তাকে পালটাতে হবে। মানুষের মণীষা এই শতকে আমাদের হাত থেকে নিমিত্তবাদের আমলকিটি কেড়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয় আমাদের প্রচলিত ভূমি সংরক্ষণ প্রথাটিই তো বাতিল হয়ে গেছে। এখন কি কেউ বলে এটা ফিজিক্স, ওটা কেমিষ্ট্রি, সেটা জিওলজি। প্রাথমিক স্তরের পরেই আর বলে না। সব কিছু মিশে গেছে। তো সে রকমভাবেই র‍্যাঁদ্যার কাজ দেখতে দেখতে আমরা শ্রাব্য আয়তনের কথা ভাবতে শুরু করেছি। আমার তো মনে হয় ইউলিসিস পড়া অনেক স্বাদু হয়ে উঠবে যদি কোয়ান্টাম মেকানিকস জানা থাকে। এই যুগে আমরা ইউনিটগুলোর বদলে সিস্টেমটাকে ধরতে চাইছি। এখন প্রত্যেকটা ব্যবস্থাই অজস্র ছোট ছোট সম্পর্কযুক্ত উপাদানের সমষ্টি anyone of which can exist in many different states such that selection of the state is influenced by the states of the other compoments of the units. এখন সমালোচক যদি ব্যবস্থা বিশ্লেষণে নিযুক্ত থাকেন তবেও ব্যবস্থার নিজস্ব গতি, সে তো স্থির নয়, তাকে সুগোল সমাপ্তিতে পৌঁছতে দেবে না। আমরা শুধু হাইসেনবার্গের ধরণে একটা প্রদেয় সময়সীমায় তার অবস্থানগত অভিব্যক্তি অনুমান করতে পারি।

এই যখন পরিস্থিতি তখন শিল্পের থেকে কেলাস-স্বচ্ছতা আশা করা সম্ভব নয়। সমালোচনা যদি আমাদের চেতনা পদ্ধতির একটি উৎকৃষ্ট প্রতিফলন হয় তবে সেখানেও তো কিছু দুর্বোধ্যতা, কিছু রহস্য থেকে যাবে। সমালোচনা চিরদিনই

শিল্পকর্ম ও রসগ্রহীতার মধ্যে চটপটে দোভাষীর ভূমিকায় অভিনয় করে যাবে, এরকম মুচলেকা দেওয়ার দায়িত্ব সমালোচক নেবে কেন?

...

অনেক ফিলিস্তাইন পাঠক আপনার লেখায় উদ্ধৃতি দেয়ার ঝোঁককে আপনার লেখনপ্রতিভার দুর্বলতা বলে মনে করেন। এ সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

এলিয়টই তো একবার বলেছিলেন যে না দান্তে, না শেক্সপীয়ার কেউই কোন প্রকৃত চিন্তা করেন নি। এর পরে অবশ্য বলার কিছুই থাকে না। যারা এসব বেশি বলেন তারা পরীক্ষার খাতার অতিরিক্ত আর কিছু পড়েন না বলেই বলেন। আধুনিক সাহিত্যে উদ্ধৃতি ঠিক অন্ধের যষ্ঠী কিংবা পঙ্গুর ক্রাচ নয়। আপনি ওয়েস্টল্যাণ্ড আবার পড়ুন, এলিয়টের শতবর্ষ তো চলছে, দেখবেন উদ্ধৃতির শিল্পরূপ। গোদারের ফিল্ম দেখুন—উদ্ধৃতির ছড়াছড়ি। পিকাসো যখন কোরিয়াতে নৃশংসতা আঁকেন তখন তিনি একটু ঘসেমেজে গোইয়ার মাদ্রিদে গুলিচালনা থেকে বস্তুত উদ্ধৃতই করেন। এ হচ্ছে ঐতিহ্যকে ব্যবহার ও সংযুক্তির প্রশ্ন। তাছাড়া একটা কথা আপনি বলতে চাইছেন কেউ সে কথাটাই আরও ভালোভাবে বলেছে; আপনি প্রসঙ্গক্রমে স্বচ্ছন্দে তুলে দিতে পারেন। বোকা স্বকীয়তার পেছনে দৌড়ে লাভ কি? কোন যোনি থেকে ছিটকে পড়ব না এরকম মনোভাব থেকে খবরের কাগজের সম্পাদকীয় লেখা যায়, আর কিছু লেখা হয় না।

আপনার সমালোচনা সাহিত্যের—তাত্ত্বিক বীক্ষা মূলত প্রাচ্যধর্মী না প্রতীচ্যানুসারী? বলতে চাইছি প্রাচীন ভারতীয় নান্দনিকতার অনুসারী, নাকি আধুনিক পশ্চিমের? বিভিন্ন নান্দনিক ধারার আলোয় আলোকিত অথবা মিশ্র?

হয়ত স্ক্যাণ্ডিনেভীয়, কিন্তু সেকথা নয়। আপনি বলুন তো খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতকের পর থেকে আমাদের দেশে, অঙ্কে বা কাব্যে, শল্যচিকিৎসায় বা স্থাপত্য বিদ্যায় এমন কি কিছু সত্যিই হয়েছে যার জন্য তথাকথিত প্রাচ্যরীতির শরণাপন্ন হতে হবে? বরং মধুসূদন এবং বঙ্কিমবাবু তো ওই প্রতীচ্যরীতির ভাগ্যক্রমে অনুগত ছিলেন বলেই আমরা কিছু কলকাতা দখল করতে আসা মফস্বলী জমিদারদের টপ্পা-গজল চর্চার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছিলাম। অপ্রীতিকর হতে

পারে, তবু বলি আপেক্ষিকতা ও কম্পিউটারের যেমন কোন প্রাচ্যরীতি নেই, একমাত্র আন্তর্জাতিক রীতি আছে তেমনভাবেই আধুনিক সমালোচনা সাহিত্যেরও কোন প্রাচ্য চণ্ডীমণ্ডপ নেই। আসলে কিছু কিছু গুজব তো চালু রাখতেই হবে যেমন প্রাচ্যরীতি, ইয়েতি, দানিকেন এইসব।

বাংলাভাষায় শিল্পসাহিত্যের সমালোচনায় কারা আপনার কাছে পথিকৃৎ বলে মনে হয়?

পথিকৃৎ অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র নিতান্তই সুতার্কিক ছিলেন না। আর্থ-সামাজিক প্রসঙ্গের অবতারণাও তাঁর প্রধান কৃতিত্ব নয়। আমার মনে হয় তিনিই সমালোচনাতে প্রথম দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিত যোগ করেন। যে পরিপ্রেক্ষিত তাঁকে দিয়েছিল হিন্দুধর্ম। উপরন্তু সমালোচ্যের আত্ম-জৈবনিক উপাদান কত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে তা ঈশ্বর গুপ্ত বিষয়ে তাঁর তুলনারহিত বিচার থেকে আমরা মর্মে মর্মে অবহিত হই। বঙ্কিমবাবুর বক্তব্যের থেকে আলাদা হওয়ার স্বাধীনতা আমাদের আছে।
কিন্তু আপনি তুলনামূলক প্রেক্ষাপটে বুদ্ধদেব বসুকে স্থাপন করুন। ব্যর্থ কবি সেকথা স্বতন্ত্র কিন্তু সমালোচনাপ্রতিভা যা ছিল অমর হয়ে যেতে পারতেন অথচ বুদ্ধদেবের সমস্যা তাঁর কোন দর্শন নেই, বিজ্ঞান বা রাজনীতি নেই। বোদলেয়ার বা রবীন্দ্রনাথের ওপর বুদ্ধদেবের ভাষ্য শুনে আমাদের হৃদয় প্রসন্ন হয় কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না তাঁর বিচারভূমির অক্ষরেখা কোথায়। বঙ্কিমবাবুর কিছু কিছু রক্ষণশীল গোঁড়ামি, কিছু ভুল দেখা থাকতে পারে, এলিয়টের তো প্রথম থেকেই ছিল, কিন্তু স্ব-ভূমি আছে। এই নিজ বাসভূমি সমালোচকের পক্ষে জরুরী যদি সেখান থেকে হ্যামলেটকে ব্যর্থ মনে হয় তবুও। এটা অবশ্য এলিয়টের প্রসঙ্গে চলে এলো।
তারপরে রবীন্দ্রনাথ তো আমাদের সমগ্র আলোচনাসাহিত্য আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। পরিতাপজনকভাবে ভাষার সম্মোহনে, তাৎক্ষণিক মুগ্ধতায় ও সংস্কারের জটে। কিন্তু মূল রবীন্দ্রনাথ, আধুনিকতার বিচারে ভুল করলেও, সাহিত্য-শিল্পকে একটা বড় মাপে, বৃহৎ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনুষঙ্গে ওজন করতে চেয়েছিলেন একথা ভুলে গেলে কৃতঘ্নতার পাপ আমাদের ওপর বর্তায়।

চলচ্চিত্র সমালোচনা করার সময়ে কি সাহিত্য-সমালোচনা থেকে আলাদা কোন রীতির আশ্রয় নেন?

সেভাবে আমার কোন রীতি নেই। সিনেমা আমার ভালো লাগে কেননা চেতনার প্রচলিত বিন্যাসকে আক্রমণ করার সম্ভাবনা ও সুযোগ এই মাধ্যমেই আপাতত সর্বাধিক আর চলচ্চিত্রই সবচেয়ে বেশি অধিকার পেয়েছে আমাদের পরমতত্ত্বের মানসমূহতে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠার। অবশ্য এর মানে এই নয় যে চলচ্চিত্রের শিল্পসাফল্য সর্বোত্তম। বরং আজও পৃথিবীতে যত বাজে ফিল্ম হচ্ছে, তত বাজে কবিতা লেখা হচ্ছে না। তবে আমার লেখার যা সাধারণ চরিত্র অর্থাৎ যতটা তাত্ত্বিক ততটা প্রায়োগিক নয় তা চলচ্চিত্রালোচনাতেও সমান সক্রিয়।

ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো : অবিস্মরণীয় প্রস্থান

আত্মজৈবনিক ও প্রাতিস্বিক, স্বীকারোক্তি, অথবা গোপন রোজনামচাপ্রতিম, আগামীদিনের চলচ্ছবি আমার কাছে উপন্যাসের চেয়েও ব্যক্তিগত বলে মনে হয়।

—ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো (১৯৫৭)

শুধু সমুদ্রের স্বর : অন্য কোন শব্দ নেই। শুধু সমুদ্রের গন্ধ : অন্য কোন স্পর্শ নেই। আমাদের আর্ত দিগন্তরেখা জুড়ে বেজে ওঠে একটি বালকের হাহাকার ও পদধ্বনি। তারপর, চরাচরের মৃদুতম অনুনয়ও থেমে গেলে যখন মোমের মত জ্বলে ওঠে হৃদয়, কবিতা জননের স্বাদ পাওয়া যায়। সেই অতিখ্যাত ফ্রিজটিকে নিয়ে আমরা আর আলোচনা করব না। ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোর অতীত ও ভবিষ্যত বর্তমানে অবিচ্ছিন্ন। বাস্তবিক তিনি আজ যখন মৃত্যুর গ্রীবার আড়ালে ওষ্ঠ রেখে স্বয়ং নির্বাক তখন বলা যায় ত্রুফো ছিলেন আমাদের মলিন সায়াহ্নের সবচেয়ে আনন্দময় অতিথি। তাঁর চিত্রনাট্যে ধর্মবিশ্বাসের মত ইন্দ্রিয়ঘন একটি শুদ্ধতার রঙ ছিল ও পারি—তাঁর প্রিয় শহরের পথে ও উদ্যানে ক্যামেরা সঞ্চালনে সেই আভা যা নিদ্রা ও কুসুমে আকীর্ণ থাকে।

নবতরঙ্গে তাঁর প্রধান সহযোগী জাঁ-লুক গোদারের সঙ্গে যদি তুলনা করি তবে দেখব গোদারে যেখানে ধ্বংসের মন্ত্রণা ও উৎক্ষেপ, ত্রুফোতে সেখানে শৃঙ্খলা ও রেখার সংহতি। আমৃত্যু আমাদের আলোচ্য শিল্পী জানতেন চলচ্চিত্র নামক শিল্প-মাধ্যমটির অস্তিত্ব তাঁকে কৃতকর্মের সূত্রে প্রমাণ করে যেতে হবে। অন্তর্ঘাতকের ভূমিকা তাঁর নয়। ত্রুফোর রচনাসমূহে তদন্ত চালিয়ে জাঁ রেনোয়া একদা লেখেন———...the product of one man alone and that man looks with an equal eye on the problems of the actors, the sound system, the camera. There are no small problems, no great problems. There is only film. For Hindus the world is one ; For Truffaut film is one.

সম্ভবত এই বক্তব্য প্রশস্তিসূচক অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছিল কেননা তা ডে ফর নাইট-এর জন্য ওয়ার্নার ব্রাদার্স কৃত প্রচারপত্রে স্থান পায়। তবু, আমি বলব, একজন

আধুনিক শিল্পী যদি তাঁর প্রকাশ মাধ্যমটিকে অখণ্ডমণ্ডলাকার নিয়ত সত্য বলে ভেবে থাকেন তবে তা রক্ষণশীল রুচিরই পরিচয় বহন করে। অন্তত এই একটি ছবিতে ত্রুফো সুযোগ পেয়েছিলেন নিজেকে, নিজের যাবতীয় দিনলিপিকে, অস্ত্রোপচার করার। পরিবর্তে আমরা পেলাম মুগ্ধতার মায়া আবরণ।

We hope everyone who sees the film enjoys seeing it as much as we enjoyed making it.

বুঝতে পারি সন্দেহের অধিকারকে এই শিল্পী প্রতিস্থাপিত করতে চান আচ্ছন্নতার দ্বারা। এক নিবিড় আস্তিক্যবোধ ত্রুফোর শিল্পকর্মের জরায়ু; আস্তিকতাই তাঁকে রক্ষা করে উৎকেন্দ্রিকতা থেকে। তাঁর প্রধান গৌরব এই যে চলতি শতকের দ্বিতীয় ভাগে ইতিবাচনের জন্য যে নৈতিক দর্প প্রয়োজন তা তাঁর ছিল। আর জয়ের এই শিখর থেকেই ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোর পরাভবের সূচনা। প্রখর অনুশীলনে তিনি যে সৌন্দর্যের জন্ম দেন তা আমাদের ক্লান্ত করে না; আমি বলব অতঃপর ত্রুফোর পতনের চিত্রলেখটি মান্য করে চলে উক্ত অক্ষরেখাটিকে। সিনেমার খাতার দুর্বিনীত পুরুষটি যখন সিনেমার পর্দায় নমনীয় হয়ে দেখা দেন তখন ভালো লাগে। কিন্তু এত সহজে এত অনায়াসে ভালো লাগে যে আহত হৃদয়ে মেনে নিতে হয় এ এক মেদবহুল বিপর্যয়ের সঞ্চার পথ। অতীতের প্রতি ঈষৎ মনোনিবেশ করলেই আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করব যে আর্টস পত্রিকার যে উদ্ধত সমালোচক অবলীলায় বাতিল করে দেন জনৈক প্রাচ্যদেশীয় চলচ্চিত্রস্রষ্টার "পথের পাঁচালি" কিংবা বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ওঠেন জন ফোর্ডের প্রতি, তিনিই অনতিকাল পরে নির্মাণ করেন ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ যা আবিশ্বে অভিনন্দিত কিন্তু কোনক্রমেই প্রচলিত নন্দনতত্ত্বের আততায়ী নয়।

এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয় ত্রুফোর অবমূল্যায়ন। তাঁর নির্মাণ সাফল্য নিয়েও আমার কোন সংশয় নেই, তথাপি হুজুগপরায়ণ শোকপ্রস্তাব লিখনেও যেহেতু নিযুক্ত নই, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমাকে যোগ করতে হবে যে ত্রুফোর শিল্পী জীবনের ইতিহাস মূলত কাইয়ে দু সিনেমার নন্দনতত্ত্ব থেকে এক সফল পশ্চাদ পসরণের ধারাবিবরণী। তাহলে এবার নবতরঙ্গ সেই অর্থে সিনেমার খাতার পঞ্চপাণ্ডবের—ত্রুফো, গোদার, রিভেত, রোমার ও শ্যাব্রল—উত্থান পটভূমি নিয়ে আলোচনা ঈষৎ জরুরী হয়ে ওঠে।

The Nouvelle Vague? Pierre Says nice things about Georges who raves about Julien who supervises Popaul who coprodu-

ces Marcel whom claude has already praised—আমিষাশী তরবারের মত উগ্র ফ্রাঁসোয়া ক্রুফোর এই বিদ্রূপ থেকে যদি রীতিকে নস্যাৎ করার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থেকেও যায় তবে আমরা গোদারের সাহায্য নিতে পারি। অনস্তিত্ববান সিনেমার জন্য বিষণ্ণ অনুশোচনা—এই শব্দ ক'টির মধ্য দিয়ে গোদার নবতরঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন : reportage is interesting only when placed in a fictional content, but fiction is interesting only if it is validated by a documentary content. The Nouvelle vague, in fact, may be defined in part by this new relationship between fiction and reality, as well as through nostalgic regret for a cinema which no longer exists.—অর্থাৎ ক্রুফো ও তাঁর বন্ধুচতুষ্টয় কলমের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের জন্য অন্য কোন মেরু পেতে চাইছিলেন। অত্যন্ত সঠিকভাবেই পঞ্চাশের দশকে তাঁদের মনে হওয়া যে গতানুগতিক পন্থায় আর জীবনের অনুবাদ সম্ভব নয়। ভগ্নাংশে বিভাজিত আধুনিক জীবনকে রূপ দিতে চাইলে—চিত্রকলা ও সাহিত্যের মতই—ফিল্মকেও সরলরৈখিক অগ্রস্থিতির ধ্রুপদী স্বভাব বিস্মৃত হতে হবে। তাঁদের সমালোচনা—যা প্রায়শই তিক্ত, নিষ্করুণ, দুর্বোধ্য, উদ্ধৃতিময়, খণ্ডিত, পরিহাসমদির--এক নতুন চলচ্চিত্রের আভাস দিচ্ছিল। একটি সিনেমা ও তার সমালোচনা, এইভাবে নতুন সিনেমায় পৌঁছে যাওয়া : অর্থাৎ থিসিস ও অ্যান্টিথিসিসের যুগপৎ উপস্থিতি—'ম্যাস্কুলাঁ ফেমিনাঁ' অনুবাদের ভূমিকায় আমি দেখাতে চেয়েছি সিনেমার খাতার প্রথম প্রচ্ছদ।

প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র আধুনিকতার মেদ ও মজ্জায় নিহিত আছে এই সমালোচনা প্রবৃত্তি। প্রতীকীবাদের নায়ক কবি স্তেফান মালার্মের সময় থেকেই ফ্রান্সে শিল্প এমন এক যুগে প্রবেশ করেছে যখন সে নিজেই নিজেকে সমালোচনা করে। অবশ্য আধুনিক শিল্পচেতনায় এই সমালোচনা প্রবণতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে আছে অপর দুটি বৈশিষ্ট্য ; সম্প্রসারণেচ্ছা ও বক্তব্যধর্মীতা। বিস্তৃত আলোচনায় দেখানো যায় নবতরঙ্গের তাত্ত্বিকরা উপরিউক্ত লক্ষণদ্বয়কেও আদৌ অবহেলা করেন নি।

কাইয়ে দু সিনেমা ও আর্টসের পাতায় যে সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছিল তার প্রত্যক্ষ পূর্বাভাষ পাওয়া যাচ্ছে '৪৮ সালে প্রকাশিত ঔপন্যাসিক-চলচ্চিত্রকার আলেকজান্দার আস্ত্রুকের একটি প্রবন্ধে। আস্ত্রুকের কামনা ছিল চলচ্চিত্রের একটি স্বয়ম্ভর ও সার্বভৌম ভাষা। আস্ত্রুক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন

ছায়াছবি মেলাপ্রাঙ্গণের অলঙ্কার বা বুলভার নাট্যপ্রতিমবিনোদন বা যুগের প্রতিবিম্ব সঞ্চয়ের স্তর উত্তীর্ণ হয়ে নিজস্ব বর্ণমালার সন্ধান করছে।' মালার্মে যেমন তাঁর যুগকে অভিহিত করেছিলেন "লা পয়েজি ক্রিতিক" হিসেবে; আস্ত্রুক অনুরূপভাবে চলচ্ছবির আসন্ন সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করলেন "লা কামেরা স্তিলো" (ক্যামেরা-লেখনী) আখ্যায়। অতঃপর আঁদ্রে বাজাঁর মানস পুত্র ফ্রাঁসোয়া ক্রুফো বিশেষভাবে অর্জন করলেন মিজঁসেন-এর নৈতিক বাস্তবতা ও ডিপ ফোকাস তত্ত্বের উত্তরাধিকার। বারুদ স্তূপীকৃত ছিল; প্রার্থিত স্ফুলিঙ্গটুকু উপহার দিলেন সিনেমাতেক ফ্রঁসেজের প্রতিষ্ঠাতা আঁরি লাংলোয়া—জঁা ককতো কথিত রত্নভাণ্ডারের সেই ড্রাগন প্রহরী।

অতএব কামনায় থরোথরো, জৈব, উন্মাদ প্রায় 'কাইয়ে দল' আমাদের উল্লসিত করেন। তাঁদের তপ্তস্নায়ুপ্রসূত মন্তব্য যখন পরিকল্পিত হিংস্রতায় দর্শকের ঝিমিয়ে পড়া রুচিকে তছনছ করে দেয় আমরা তখন উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমরা নিশ্চিত থাকি যে প্রতিষ্ঠিত স্থাপত্যকে চূর্ণ করে এঁরা সিনেমার অন্য কোন অবয়ব গড়ে দেবেন। হে পাঠক, আপনার স্মৃতি থেকে উদ্ধার করুন জঁা লুক গোদারের অহঙ্কৃত উচ্চারণসমূহ: কাইয়েতে আমরা সকলেই নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিচালক মনে করতাম। লেখা ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছিলো চলচ্চিত্র নির্মাণে অংশগ্রহণ কেননা লেখা এবং শুটিং-এর মধ্যে যে পার্থক্য তা পরিমাণগত, গুণগত নয়।

আর ক্রুফোর খবর কি? প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধকে আক্রমণ করার পরিণাম তিনি হাতে হাতে পেয়ে যাচ্ছেন। ল'এক্সপ্রেস তাঁকে বর্ণনা করেছে: a hateful enfant terrible who put his foot in his mouth with unbearable self conceit. সাংবাদিকতার তরুণ হুডলাম—এই শিরোপাটি দান করলেন ক্লোদ ও তাঁ-লারা। ক্রুফো স্বাভাবিক প্রত্যুত্তরে ঝলসে উঠলেন—Young hoodlum is an outdated expression that leads straight to the Legion of Honour and a house in the Country. অবশেষে এস্টাব্লিশমেণ্ট চূড়ান্ত প্রত্যাঘাত হানল। চলচ্চিত্র উৎসবগুলির বিরুদ্ধে কয়েক বছরের অবিরত সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে কান উৎসব থেকে নিমন্ত্রণ পেলেন না ক্রুফো।

এভাবেই চলছিল সমালোচনা ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্রনির্মাণ। ১৯৫৯: আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সসম্ভ্রম প্রণতি জানাল ফ্রান্সকে। ক্রুফো কান থেকে গ্রাঁ-প্রি জয়

করলেন ; আলাঁ৷ রেনে ও জাঁ-লুক গোদার—দুই বিপরীতমুখী প্রতিভা সম্ভব করলেন 'হিরোশিমা মন আমুর' ও 'ব্রেথলেস'-এর মত স্থায়ী শিল্পের সৃজন। রেনে অবশ্য কাইয়ে দলের অন্তর্ভুক্ত নন। তবু গোদার ও ত্রুফো তো আত্ম-প্রতিকৃতি খুঁজে পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে উৎসারণের মুখ পেয়েছে নবতরঙ্গ। আমরা, সুতরাং, মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

কিন্তু যেভাবে 'ফোর হাণ্ড্রেড ব্লোজ'—ছবিটির বন্দনা গাওয়া হয়েছে আজ পর্যন্ত নানা দিক থেকে, যেভাবে তা কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছে যে অন্য কোন স্তব নিরর্থক মনে হয় আমার। তথ্যগতভাবে মূল্যবান হতে পারে এই ভেবে '৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কাইয়ে দু সিনেমাতে মুদ্রিত গোদারের ছোট আলোচনাটির প্রতি আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গোদার বলেন—les quatre cents coup will be the proudest, stubbornest, most obstinate, in other words most free film in the world. Morally speaking. Aesthetically too......will be a film signed Frankness. Rapidity. Art. Novelty. Cinematograph. Originality. Impartinence. Seriousness. Tragedy. Renovation. Ubu-Roi Fantasy. Ferocity. Affection. Universality. Tenderness. ঠিক দু'মাস পরে সংস্কৃতি মন্ত্রী আঁদ্রে মালরোকে কৃতজ্ঞতা ও এই ছবির কান অভিযানকে স্বাগত জানিয়ে আর্টসের পাতায় একই লেখক ঘোষণা করলেন যে এই জয় কাইয়ে দলের জয় এবং "যদিও আমরা একটি সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়েছি, যুদ্ধ এখনোও শেষ হয়নি।" গোদারের মূল্যায়নকে আবৃত রেখেছে বন্ধুকৃত্য ও উচ্ছ্বাস ; যুক্তি এখানে প্রবল নয়। বরং পরের মাসে সিনেমার খাতায় জাক রিভেতের মূল্যায়ন "টাইম ফ্রেম" সম্বন্ধে কমরেডের একটি অবদানের দাবি তোলে—It was necessary to have such an obsession about length, about temp morts, such an abundance of cuts, of Jerks, of breaks, that eventually he could get rid of the old clock work time and rediscover real time ...

সন্দেহ নেই সর্বগুণান্বিত এই ছবি ও তাঁর অবিশ্বাস্য বাণিজ্যিক সাফল্য কাইয়ের তরুণ যোদ্ধাদের সাহস ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেয় তবু, ত্রুফোর বন্ধুরা যাই বলুন না কেন, প্রায় পঁচিশ বছর পরে একথাও বিতর্কাতীত যে ছবিটি মোটেই

পরীক্ষামূলক বা বেপরোয়া নয় ; প্রথার শ্রেষ্ঠ অনুবর্তন মাত্র। 'ফোর হাণ্ড্রেড ব্লোজ'-এর মধ্যে, ইতিহাসের এমনি কূটাভাষ যে, নন্দনতাত্ত্বিক আঘাত প্রায় নেই। এই নির্মম সত্য, তাৎক্ষণিক আবেগ কেটে গেলে, আমাদের হতাশ হয়ত করে না কিন্তু বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে। কেন এমন হল ? একজন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী কেন প্রথম আবির্ভাবেই আপোষরফা করে বসলেন ? অথচ প্রায় একই সময়ে বানানো 'ব্রেথলেস' ও 'হিরোশিমা মনামুর' কিন্তু অনেক উচ্চাশা-পরায়ণ। গোদার তাঁর প্রথম ছবিতেই দেখালেন গল্প বলার নিটোল দায় আর চলচ্ছবির নেই ; উন্মোচিত হল জাম্পকাটের রাজসিক মহিমা ; আশির দশকে ছবিটি একটি সকৌতুক তাচ্ছিল্য ছুঁড়ে দিল ফিল্ম মিডিয়ামের স্তন শিখরে। এখানে বলা ভালো ছবিটির চিত্রনাট্যের খসড়া পরিকল্পনা ত্রুফোরই ছিল, গোদার তার সম্প্রসারণ করেছেন। আর রেনে যদিও কাইয়ে সংঘের সদস্য নন—সংশোধিত করে দিলেন আমাদের সময়সংক্রান্ত পর্বভেদ, মানব সভ্যতার মর্মান্তিক বিপর্যয়কে আলোকিত করে দিলেন কালচেতনার গম্ভীর ও প্রতিমুখী নিয়ন্ত্রণে।

ত্রুফোর বিরুদ্ধে আমার মুখ্য অভিযোগ যে তাঁর ছবিতে কোন বিকৃতি বা অতিরঞ্জন নেই। প্রায় সর্বত্রই তা বাস্তবের পরিচ্ছন্ন সমানুপাতিক। শিল্পের বাস্তবতা যে প্রথম পর্যায়ের নয়, বরং দ্বিঘাত বা ত্রিঘাত বা আরও উচ্চ পর্যায় অথবা অর্ডারের তা ত্রুফো বুঝতে চান না। 'ফোর হানড্রেড ব্লোজ'এ চরিত্র-চিত্রনের অনুপুঙ্খ নিষ্ঠা এবং গীতিকবিতার অসামান্য স্পর্শ দর্শককে বিব্রত বা চিন্তিত করে না, ঝাঁকুনি দেয় না। পরিবর্তে গঠনে হয়ে ওঠে পেলব আত্মজীবনী ; এঁকে দেয় মায়াঞ্জন। হায় ! ত্রুফো কি ভুলে যাবেন কাইয়ে দু সিনেমায় তাঁর ক্রুদ্ধ, কালাপাহাড়ী অতীত ?

ট্র্যাজেডি হচ্ছে ত্রুফো বিশ্বস্ত থাকবেন না তাঁর প্রতিভার প্রতি। হয়ত শৈশবের অনিকেত অভিজ্ঞতাই তাঁকে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের বদলে বন্দরে আশ্রয় নিতে উপদেশ দেয়। আসলে ত্রুফো নিজেও দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে সংকটের সমীকরণটির সমাধান চাইছিলেন। তাই দ্বিতীয় ছবিতে বিশ্রাম চাইলেন হালকা মার্কিনী বি-মুভির কাছে। "শুট্ দ্য পিয়ানিষ্ট" নির্মাণে ত্রুফোর ফরাসীকরণের স্বাধীনতা আমার ভালো লাগে। কিন্তু সহজেই অনুমেয় ইয়াঙ্কি থ্রিলারের সহিংস মেজাজ ত্রুফোর নম্র রোমাণ্টিকতার সঙ্গে খাপ খায় না। এই কারণেই গোদার যেমন "দি কনটেম্পট্"-এ আন্তোনিওনি'র বিষয়কে হিচকক রীতিতে উপস্থিত করে গোদারীয়

আঙ্গিক বোঝাতে পারেন, ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো তেমন আলাদা ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে পারেন না। হিচককের প্রতি বিপুল প্রীতি থাকা সত্ত্বেও আমাদের নজর এড়ায় না যে পরেও ত্রুফো থ্রিলারের দরজায় কড়া নাড়েন মূলত আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকে। The worst thing when you are the complete author of a film is that you are more troubled by doubts.—কি দুর্ভাগ্য, আমাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না যে বাক্যটি একজন মহৎ চলচ্চিত্রস্রষ্টার মুখনিসৃত যাকে আমরা ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো নামে জানি। অনুরূপ চিন্তার ভগ্নাংশও তো আন্তোনিওনি, বার্গমান বা গোদারের পক্ষে অকল্পনীয়!

তবু 'ফোর হানড্রেড ব্লোজ'-এ একটি বিস্তৃত মানবিক/সামাজিক প্রেক্ষাপট ছিল ডিকেন্স যার পথিকৃৎ। তৃতীয় ছবিতে ত্রুফো নিজের জগতের পরিধি আরও ছোট করে নিলেন। সময় এখানে অলীক; পিকাসো চিত্রমালার পরম্পরা তাতে কোন রুগ্নতা আরোপ করে না। 'জুল ও জিম'-এ ছুটির একটি অবারিত নিমন্ত্রণ আছে। এখানে প্রকৃতিতে রেখা নেই; রাউল কুতারের ক্যামেরা জীবনের উপরিতল থেকে আলোর চিত্রকল্প উদ্ধার করে আনে। কিন্তু যে আঁধার আলোর অধিক ত্রুফো তাঁর খোঁজ পান না। ফলে 'জুল ও জিম' আমাদের কাছে প্রেমের গতিময় কাব্য —অতিরিক্ত কিছু হয়ে ওঠে না। হয়ে ওঠে না বলেই বোধ হয় এই ছবির জন্য ত্রুফো সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পান। জিম যখন বলে—It is a noble thing to want to rediscover the laws of humanity; but how convenient it must be to conform to existing rules—আমার মনে হয় পরাজিত ত্রুফো আত্মপক্ষের বিবৃতি দিচ্ছেন।

এখানে তত সাহিত্যিক উল্লেখ থাকবে জাঁ-লুকের এগারটা ছবি মিলিয়ে যত হয় —'ফারেন হাইট ৪৫১'র জন্য রচিত জার্নালে ত্রুফো লিখেছেন। ঠিক আগের বছরে নির্মিত গোদারের 'আলফাভিলের' সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় ত্রুফো সামাজিক প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক ইঙ্গিত সম্পূর্ণভাবে বর্জন করায় তার অগ্নিকাণ্ড ও ফায়ারইঞ্জিনসমূহও মনোরম হয়ে দেখা দেয়। 'ফারেন হাইট ৪৫১' এত সরলভাবে সুন্দর যে তা বিজ্ঞান-ভিত্তিক ছবির দূরপ্রসারী মহিমা পায় না। আসলে এভাবে আলোচনায় লাভ নেই। অন্যত্র ফেলিনির 'এইট্ এণ্ড হাফ' সমাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতেও স্পষ্ট যে 'ডে ফর নাইট'-এর পরিচালক বাস্তবের পুনর্নির্মাণের বদলে বাস্তবের স্বাভাবিক উপস্থিতিরই পক্ষপাতী।

এই ছবিতে জনৈক মুখ্য চরিত্র অত্যন্ত জরুরী একটি প্রশ্ন রাখে—Are films

more important than life? যেহেতু রক্তে ও মর্মে শিল্পী, জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই ক্রুফো নিজেই নিজেকে প্রশ্নটি করে চলেছিলেন। আরও বলার কথা প্রশ্নটির একটি ভ্রমাত্মক জবাব তিনি পেয়েও গিয়েছিলেন। ফলে আজীবন বাতিল হয়ে যাওয়া সেই নন্দনতাত্ত্বিক স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবন করলেন, অভিধানে যাকে বলে কলাকৈবল্যবাদ। শিল্পীকে প্রবীণ হতে হবে অভিজ্ঞতায়। ক্রুফো তা পারেন নি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে cinephil approach তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে থেকেছে। আশ্চর্য এই যে ক্রুফো খেয়াল করলেন না যে সৌন্দর্য আজ মণীষার কর্কটরোগাক্রান্ত; রজনীগন্ধা নারীর শরীরের আমন্ত্রণকে তুচ্ছ করে দেয় বোদলেয়ারীয় শহীদ স্তনের মহিমা। অথচ ক্রুফোর থেকে আর কে বেশী নিশ্চিত ভাবে জ্ঞাত ছিলেন যে কাইয়ে আন্দোলনের প্রবলতম অনুসিদ্ধান্তটি হল যে সত্য সেই অর্থে বক্তব্যের প্রকাশে চলচ্চিত্র একটি আঙ্গিকমাত্র; চলচ্চিত্রের আঙ্গিক এমন কিছু জরুরী নয় অথবা বিপরীত ভাবে বলা যায় সম্প্রসারিত চলচ্চিত্রই একমাত্র সত্য। উলঙ্গ হতে প্রকৃতই সাহস লাগে। নিরাবরণ রক্ত পরীক্ষার ইসারায় সাড়া না দিয়ে ক্রুফো যে নান্দনিক নিরাপত্তার আবহ গড়ে তুলেছিলেন তা খুব পলকা নয় অবশ্যই কিন্তু প্রয়াণের আগেই জেনে গিয়েছিলেন কাইয়ে দলের মুখ্য সেনাপত্যে তিনি আর বৃত নন। সেই সিংহাসনটি জাঁ-লুক গোদারের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।

আমি কি তবে জীবনানন্দের সেই অমোঘ পঙতিটির আশ্রয় নেব—একটি বিপ্লবী তার সোনারুপো ভালোবেসেছিলো? না। সেরকম সিদ্ধান্ত হবে অন্যায়, ভ্রান্ত এবং হৃদয়হীন। ছবিঘরে তাঁর পুনরাবির্ভাব ঘটলে আমি শান্ত আগ্রহে আবার দর্শনপ্রার্থী হব। কেননা আধুনিক চলচ্চিত্রের জটিলতা ও শ্বাসকষ্টের মধ্যে ক্রুফোই অন্যতম যার মধ্যে নির্মল মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায়। কুড়ি শতকের শিল্পের ইতিহাসে চলচ্চিত্রকার ক্রুফোর অন্যতম সতীর্থ বোধহয় চিত্রকর আঁরি মাতিস। উভয়েই সময়ের অসংলগ্ন আরোপ। উভয়েই ইতিহাসের বাইরে দাঁড়াতে চেয়েছেন। স্বেচ্ছা নির্বাচিত সংকীর্ণতাই, আমার ধারণা, দুজনের প্রাণশক্তি। মাতিসের শয়নরতা নারী, ক্রুফোর আকাশ ও প্রান্তর শতাব্দীর অন্তহীন আগুন ও রক্তের ভেতরে আমাদের চোখের আনন্দ হয়ে বেঁচে থাকে। মনে পড়ে 'ফোর হানড্রেড ব্লোজ': নষ্ট সিন্ধুতীরে জীবনের শেফালিকাপুঞ্জ ঝরে যেতে থাকলে মনে হয় ফ্রাঁসোয়া ক্রুফো অবশেষে চুম্বন করেছেন স্তব্ধতার পেরিনিয়মে। এ প্রস্থান অবিস্মরণীয়। বিদায়! ফ্রাঁসোয়া ক্রুফো।

মায়াভ্রমণ : অরসন ওয়েলস্

He is an active loafer, a wise madman, a solitude surrounded by humanity.
—জঁা ককতো।

যা ভি-সিকা পারেন, আমি তা পারি না। সম্প্রতি আমি 'শু শাইন' দেখলাম আর ক্যামেরা অদৃশ্য হয়ে গেল, পর্দা লুপ্ত হয়ে গেল, এ-তো অবিকল জীবন—ষাট সালের বসন্তদিনে 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড' পত্রিকাকে যিনি এই মন্তব্য উপহার দেন তিনি, একই সঙ্গে, প্রশস্তিবাচনের অন্তরালে তুলনারহিতভাবে রচনা করেন নিজের অভিজ্ঞানপত্র। জীবনের ঐতিহ্যানুগত প্রতিরূপ নয়, সুতরাং, অরসন ওয়েলস চলচ্ছবিকে জীবনের বিকল্প হিসেবে ভেবে এসেছেন। সন্দেহ নেই গ্রিফিথ ও আইজেনষ্টাইন আমাদের ইতিমধ্যে সাহায্য করেন প্রতিমা ও নন্দনতত্ত্বের স্তর থেকে স্তরে অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে। কিন্তু ১৯৪১ সাল, মে মাস—ইতিহাস তখন আগুন ও রক্তের সমাহার, চরাচর তখন রৌদ্রমুখর, অরসন ওয়েলস আমাদের জানালেন সিনেমা-সর্বস্বতার স্বরূপ। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলব সিটিজেন কেন অর্থাৎ চার্লস ফস্টার কেন ও তার আত্মা ওয়েলসই চলচ্ছবির ইতিহাসে প্রথম ড্যাণ্ডি যে দর্পনের জগতে বিরাজ করে। আজ পঁয়তাল্লিশ বছর বাদে উক্ত কলাকৈবল্যবাদ এমনই স্বাভাবিক বলে প্রতিভাত হচ্ছে যে জঁা রেনোয়া অরসন ওয়েলস প্রসঙ্গে যখন পর্দার নাগরিক অভিধাটি প্রয়োগ করেন আমরা তার মর্মার্থ না বুঝেও সায় দিতে প্ররোচিত হই। অথচ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করার সময় এসেছে কেন নব বাস্তবতা পাংশু হয়ে যেতে থাকলে কাইয়ে দল তাদের নবীন বিগ্রহ খুঁজে পায় আমাদের আলোচ্য শিল্পীর মধ্যে ; কেন কিশোর ত্রুফো স্বপ্নের মধ্যে (ডে ফর নাইট) লুঠ করে চলেন সিটিজেন কেন-এর পোস্টার ; কেন গোদার বিনীত প্রণাম রাখেন যে—And yet, may we be accursed if we forget for one second that he alone with Griffith, one in silent days, one sound, managed to start up that marvellous little electric train in which Lumiere did not believe. All of us will always owe him everything. আমাদের অতএব বিবেচ্য বিষয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অরসন ওয়েলসের অবস্থান ও অবদান নির্ণয়। আজ যখন সিটিজেন কেন (১৯৪১)—অরসন ওয়েলসের প্রথম ও সবচেয়ে খ্যাত ছবি—একটি অবিস্মরণীয় ধ্রুপদের সম্মান পাচ্ছে তখন পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ছবিটি জন্মলগ্ন থেকেই অভিনন্দিত। তথ্য অবশ্য এই বিশ্বাসের

বিরুদ্ধাচরণ করবে। আমরা বলব শিল্পকর্ম হিসেবে সিটিজেন কেন প্রথমাবধি যেমন স্বীকৃত তেমন অধিকতরভাবে সংশয় ও বিতর্কের জনয়িতা। মাত্র পঁচিশ বছরের এক যুবক প্রায় নিখুঁত এই চলচ্চিত্রের পিতা। অপার বিস্ময়, সীমাহীন মুগ্ধতা, ঈর্ষা ও উচ্ছ্বাসের রেশ কেটে গেলে কিন্তু গভীরতর পুনরীক্ষণে ছবিটির গঠনরীতি অত্যন্ত দুর্ভেদ্য মনে হয়; অন্তত এতটাই জটিল যে জর্জ লুইস বোরহেসের মত শিল্পীরও মনে হয় কেন্দ্ররহিত গোলকধাঁধাঁ। আর সিটিজেন কেন-এর প্রথম ফ্রান্স সফরের ফলে অস্বভাবী নিষ্ঠুরতার সঙ্গে জাঁ-পল সার্ত্রের ধারণা জন্মে ছিন্নমূল ও প্রাতিষ্ঠানিক মার্কিন শিল্পীর উদারনীতিবাদী উৎকোচ। তবে কি সিটিজেন কেন শুধুই আঁদ্রে বাজাঁর ডিপ ফোকাস তত্ত্বের একটি আশ্চর্য উপমা? আমরা কি এটুকু বলেই আখ্যায়িকা সমাপ্ত করব যে সিটিজেন কেনের স্রষ্টা পরিকল্পনাকার হিসেবে গদ্যশিল্পী, আলোকচিত্রী হিসেবে কবি ও সম্পাদক হিসেবে সঙ্গীতকার?

পাঠক সমীপে আমার সামান্য নিবেদন এই যে মধ্য-উনিশ শতকীয় উপযোগবাদের বিরুদ্ধে বোদলেয়ারের কাব্যের যে ভূমিকা, তারই ভগ্নাংশ অরসন ওয়েলস ও তাঁর কৃতকর্মসমূহ মার্কিনী প্রয়োগবাদের বিরুদ্ধে। বোদলেয়ারের তরুণ নায়ক যেমন, বহুবাঞ্ছিতা প্রণয়িনীকে প্রথম বার বিবসনা দেখে সরোষে প্রতিবাদ করে, ওয়েলসও তেমনই তাঁর দীপ্ত যৌবনে বন্দনা করেছেন প্রসাধনের, অলংকারের, কৃত্রিমের। সিটিজেন কেন এর বিখ্যাত ভঙ্গী-সর্বস্বতাকে এই জন্যেই আমি ফিল্মে ড্যাণ্ডিজমের সূচনা বলতে প্রলুব্ধ হই। দ্রৌপদীর শাড়ির মত যে অন্তহীন রহস্য এখানে হাত-ছানি দেয় তা বাস্তবিক রীতির রহস্য; চার্লস ফস্টার কেনের গোপনীয়তা এমন একটি সমাজের ফসল যেখানে শিল্পী স্বয়ং আপন নাগরিকতা বিষয়ে সন্দিহান হয়ে ওঠেন।

ছবির প্রারম্ভেই দেখতে পাই সংবাদ সাম্রাজ্যের অধিপতি চার্লস ফস্টার কেনের মৃত্যু। এক বিরাট দম্ভের অবসান; এক মহীরুহের পতন; এক-গগনচুম্বী অহঙ্কারের ক্ষয়। অতঃপর শুরু হয় আশরপদনখে মার্কিন কুবেরদেব ফস্টার কেনের জীবনালেখ্য। আপাত সরল এই উপপাদ্যের উপস্থাপনায় ওয়েলস দুটি বৈপরীত্যের বীজ রেখে যান। প্রথমত কেনের প্রাসাদ জানাডুর প্রবেশপথে "প্রবেশ নিষেধ" সঙ্কেত ও দ্বিতীয়ত কিম্বদন্তীতে পরিণত কেনের অন্তিম উচ্চারণ Rosebud। সামাজিক যোগাযোগের আকাঙ্খায় নায়ক কেন সংশ্লিষ্ট ছবিতে অন্তত দুবার নাগরিকতা বিষয়ে উচ্চারণ রাখে; ব্যর্থ হয়; এবং হে পাঠক, পূর্বোক্ত গোপনীয়তা তার বিত্তময় পরিবেশে একজন আধুনিক মিডাসের পক্ষে

অবাস্তব হলেও জরুরী। আমাদের টুপি নামান থাকল ওয়েলসের সম্মানে। শিশুকালে জননীর স্তনচ্ছায়ে কি অদ্ভুত গন্ধ—Rosebud—গোলাপকুঁড়ি;—এতো অস্তিত্বের আঁদিতে প্রত্যাবর্তনের হাহাকার, অথচ আকুল নয় শমিত। কি আশ্চর্য! আর মাত্র আঠারো বছর বাদে কবি অ্যালেন গিনসবার্গ বার্তাশাসিত স্বদেশ ও স্ব-সমাজকে জানাবেন—The media are exactly the places where the deepest and most personal sensitivities and confession of reality are most prohibited, mocked, suppressed. সিটিজেন কেন কোন রহস্য কাহিনী বা রোমাঞ্চ গাথা নয়, কোন পৌরাণিক বীর অথবা ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের কাহিনী নয় বরং বলা ভালো একজন আদ্যন্ত ইয়াঙ্কি প্রতিনায়কের দিনলিপির ক্রমউন্মোচনশীল পশ্চাদগতি।

এবং ট্র্যাজেডিও নয়। ওয়েলস আধুনিকতার শর্ত মান্য করে প্রথমাবধিই তার অস্মিতাপরায়ণ কেন্দ্রীয় চরিত্রের নিয়তি নির্দিষ্ট করে দেন। উপরন্তু শিল্পী হিসেবে ওয়েলসের জানা ছিল যে বাস্তবতার প্রতিবিম্ব রচনা তাঁর কৃত্য নয় বরং শিল্প যা দাবি করে তা বাস্তবতার পুনর্গঠন। The danger in the cinema is that you see everything because it's a Camera, So what you have to do is to manage, to evoke, to incant, to raise up things which are not really there. সুতরাং কোন প্রস্তুতি ছাড়াই তিনি দর্শককে বুঝিয়ে দেন কেন মৃত; অতীতকালের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর সেই বিখ্যাত জাম্পকাটটি আমাদের কেনের জীবনসংক্রান্ত সংবাদচিত্রের মুখোমুখী করে। রোমান্টিক স্মৃতিমন্থনের বদলে চলচ্চিত্রে প্রবর্তিত হয় প্রবন্ধধর্মী ও ব্যক্তিগত বক্তব্য উপস্থাপনার নিয়ম। শুধু তাই নয়, প্রোজেকশনের শেষে যখন উক্ত নিউজরিল সম্পাদক রলস্টনকেও আবছা দেখা যায় তখন বুঝতে পারি ওয়েলস আসলে সেই নৈর্ব্যক্তিক দূরত্বের পূজারী যা ইতিপূর্বে মাদাম বোভারী উপন্যাসে গুস্তাভ ফ্লোবেয়ারের দ্বারা অর্জিত হয়েছিল। বর্ণমালানির্ভর ভাষার বদলে ছড়িয়ে পড়ে ফটোগ্রাফি ও সম্পাদনার তুলনাবিরল বিচ্ছুরণ।

অথচ দুর্ভাগ্য এই যে সিটিজেন কেন আমাদের শুধুই মুগ্ধ করে কিন্তু চেতনার গভীরে, রক্তস্রোতে কোনো বিষণ্ণতার জন্ম দেয় না। কেননা এই ছবিতে কোন বিস্ময় নেই। ওয়েলস নিজে বিশ্বাস করে ফেলেছেন নাগরিকের সঙ্গে সমাজের বিচ্ছেদ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে তবু উদ্ধার করতে পারেননি মৃত্যুর সার্থকতা ও অন্তঃসার। এই ছবির আঙ্গিক ঐশ্বর্যে আমরা বারেবারেই মেনে নিয়েছি চলচ্চিত্র ভাষায় অরসন ওয়েলসের অনায়াস প্রভুত্ব কিন্তু অধিকতর ভাবে উপলব্ধি

করেছি সমগ্র বিরহ যাতে পূর্ণ হয় সেই প্রজ্ঞান স্রষ্টার আয়ত্তে নেই। যে সমাজ তার কবচকুণ্ডল হারিয়ে ফেলেছে সেখানে শিল্পীকে অন্তত চৈতন্যের দ্বারা আক্রান্ত, ন্যুব্জ বা দলিত হতে হবে। অরসন ওয়েলস তো শুধুই সাক্ষী। ফলে তার যাবতীয় আয়োজন হয়ে দাঁড়ায় একটি দর্পণস্থ মায়াভ্রমণ যেখানে প্রকরণের আশ্চর্য বিন্যাস, কিন্তু হায়! মণীষার প্রাতিক্রিয়া নেই।

গোদার, সংশ্লিষ্ট পরিচালকের গুণগ্রাহীদের একজন, অনেকদিন পরে লেখেন—Doubtless the trial proves that it isn't easy for a wonder kid to grow old gracefully জীবনের প্রবীণতা শিল্পে প্রতিফলিত করতে হলে যে ভাবপ্রতিভা ও প্রজ্ঞা বহির্মুখী চেতনারাশির উপরে কাজ করে মহৎ চলচ্চিত্রের জন্ম দেবে—তা সিটিজেন কেন-এর থেকে অধিক মাত্রায় ওয়েলসের পরবর্তী জীবনে খুব লক্ষ্য করা যায়নি। আমরা লক্ষ্য করব ওয়েলসের ছবির মূল সমস্যা নৈতিকতার ও উপস্থিত পরিপ্রেক্ষিতে নায়কের আপাত বিযুক্তির। সর্বত্রই ওয়েলসের নায়ক একটি কপট মুখচ্ছবি পরিগ্রহ করে, মুখোশের অন্তরালে থাকে পাপ ও কুশ্রীতা। গোপনীয়তার এই সন্নিবেশ ওয়েলসের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক একটি প্রথা। কিন্তু এইখানে তাঁর আত্মসমালোচনা তাঁকে নবসূর্যনীলিমাক্রান্তির থেকে মুখ ঢেকে রেখেছে—ভেবে দেখলে এও এক আশাপ্রতীতির প্রস্থানলোক। সংকট শুরু হয় যখন ওয়েলস দাবি করেন মানুষকে নতজানু হতে হবে, তার অন্তর্গত মহত্ব প্রকাশের জন্যই, উচ্চতর পর্যায়ের নিয়ন্ত্রকের প্রতি যা হয়তো ঈশ্বর বা আইন বা কলাবিদ্যা। অধিবিদ্যার সংস্পর্শ তাঁকে ফাউস্টের প্রতি দ্বেষ পরায়ণ করে তোলে; তিনি শেক্সপীয়রের সাংগীতিক বিস্তৃতি সম্ভব করেন অপেরা বা ব্যালেতে; গ্রহণযোগ্য এবং সংগ্রামী কাফকার সন্ধানে নিযুক্ত থাকেন ট্রায়ালে। অর্থাৎ পূর্বসূরীদের সংশোধন করেন কিন্তু বিকল্প হয়ে ওঠেন না; ব্যাখ্যা করেন; আবিষ্কার করেন না। শেক্সপীয়ার প্রসঙ্গে তো বটেই, কাফকা বিহার কালেও তাঁর প্রবণতা আনুভূমিক, উল্লম্ব নয়। আমাদের আয়ু ও স্বাস্থ্যকে অনিশ্চিত জেনে যে সমস্ত পার্থিব সম্মোহনে সাড়া দেই তার মধ্যে সিটিজেন কেন অন্যতম। এবং এক অবিরাম ড্যাণ্ডিজম, তৃপ্তিহীন আত্ম-অবলোকনে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায় কিন্তু যে আধার আলোর অধিক তার দেখা মেলে না, কোনরকম চিত্তশুদ্ধি ঘটে না কেননা অরসন ওয়েলস বক্তব্যগত ভাবে সীমাতিক্রমকারী নন, রক্ত পরীক্ষার বদলে প্রতিবেদন নির্মাণে তাঁর আগ্রহ, বিধিবদ্ধ অক্ষরেখায় তাঁর স্থানাঙ্ক নির্ণয়। তিনি রূপের কবি; অরূপের নন।

সিন্ধুতীরে কে ভ্রমণমৃত্যু চেয়েছিল

ক.

প্রায় দু'শো বছর ইংরেজী জুতো মাথায় রাখা ছিল বলেই হয়তো আমাদের অনেকের ধারণা আছে—সাদা চামড়ার লোক মানেই যুক্তিবাদী ও শিক্ষিত। ধারণাটি, হেসে জানানোর, আদৌ সত্যি নয়। সাহেবরাও বোকা হয়। আমরা তাহলে চলচ্চিত্রসংক্রান্ত একটি উদাহরণ দিয়েই শুরু করি।

বইয়ের নাম ফ্রেনচ্ সিনেমা সিনস ১৯৪৬ (দ্বিতীয় খণ্ড)। লেখকের নাম রয় আর্মেন্স। এই পুস্তকের একানব্বই পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ভদ্রলোক লিখেছেন : It would be wrong, however, to draw analogies with Brecht in this connection. Whereas the dramatist uses distance (verfremdung) for dialectic purpose to drive home the lesson illustrated in the action, for Godard these elements are no more than a way of putting his incoherent notions into some sort of order and do not imply a true detachment from his material. আর্মেন্স সাহেব এর পরে কোনো বিশ্লেষণে যাননি। অথচ বিষয়টি এ জাতীয় সুইপিং মন্তব্যে মিটে যাওয়ার নয়। আমরা যারা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাগরপারের খবর রাখা সামান্য জরুরী মনে করি তাদের সরাসরি দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় : (১) আর্মেন্স সাহেবের মতামত কি পুরোপুরি সত্য ? (২) যদি সত্যও হয়, গোদার ব্রেশ্টের তুলনা ভুল হবে কেন ? আমাদের, অতএব, ব্রেশ্ট্ রীতি—গোদার রীতির মধ্যে অল্প প্রবেশ করতে হবে। আর তার পরেই আমরা দেখতে পাব আর্মেন্সের ভ্রম বুর্জোয়া শিল্প সমালোচনার চিরাচরিত ভ্রম। ইতিহাসকে তিনি নীতির বদলে তথ্যের ভিত্তিতে সাজিয়েছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ফরাসী চলচ্চিত্রস্রষ্টা জঁা লুক গোদার বিষয়ে যে-কোনো আলোচনাই অসমাপ্ত থেকে যায় যদি তাঁর পূর্বসূরী ব্যের্টোল্ট ব্রেশ্টের এপিক কার্যক্রমকে উপেক্ষা করা হয়।

আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু শুধুই বিদেশী সমালোচকের ভুল দেখানো নয়। তাহলে বলা যেত, সমালোচকটি যা-ই ভাবুন না কেন, স্বয়ং গোদার সেই ১৯৫০

সাল থেকেই ব্রেশ্‌টের প্রেমে আচ্ছন্ন। উপরন্তু যোগ করতে চাই যে ব্রেশ্‌ট প্রচারিত দূরত্বের রীতি, অন্তত প্রথম জীবনে গোদারের আংশিক অসফলতারও অন্যতম কারণ।

কিছু সামাজিক কার্যকারণ ধাত্রীর কাজ করেছিল এপিক রীতির জন্মকালে। প্রথমত শিল্পের প্রবাহ যে কুড়ি শতকে এসে "নাটক", "ট্র্যাজেডি" বা "কমেডি" জাতীয় উপত্যকাগুলিকে মান্য করছে না, এমন ধরণের বোধে পৌছতে হয়েছিল ব্রেশ্‌টকে। মর্মে সঞ্চারিত দার্শনিকতার প্রহরা তাঁকে বুঝিয়েছিল যে সমাজে, এমন কি বিজ্ঞানের সত্যের মধ্যেও, পরম তত্ত্ব (absolute) বিনষ্ট সেখানে অ্যারিসটোটল অচল।

আমরা সকলেই জানি ১৭৯৭ সালে গ্যেটে ও শিলারের যৌথ উদ্যোগে রচিত "মহাকাব্য ও নাট্যকাব্য প্রসঙ্গের" বিকল্প পথই হচ্ছে এপিক থিয়েটার গঠনের প্রাথমিক প্রেরণা। পুরোনো থিয়েটারে বিষয়, অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আলো ও গান যেভাবে বাস্তবতা সৃজনের জন্য ব্যবহৃত হতো, আমাদের নাট্যকার তাকে পুরোপুরি বুর্জোয়া ড্রাগ ট্র্যাফিক মনে করলেন। কেন? না, তিনি জানতেন সত্য মানেই আপেক্ষিক; শ্রেণীগত। এঙ্গেলসের প্রকৃত শিষ্য বার্টোল্ট ব্রেশ্‌ট যেহেতু জানেন সভ্যতা এখনো প্রাক্-ইতিহাসের স্তরে, সুতরাং ঐতিহাসিক অনুপুঙ্খ সম্পর্কে মাথা ঘামান না, তিন পয়সার পালায় লণ্ডন শহরের ভৌগোলিক পরিবেশ বিস্মৃত হন বরং সত্যকে কৃত্রিমতায় চিত্রিত দেখেন ও সচেতনভাবে নির্মাণ করে যান সমালোচনামূলক একটি প্রতিবেদন।

প্রতিবেদন, অর্থাৎ পক্ষপাতযুক্ত প্রস্তাব। নাট্যকার ব্রেশ্‌ট, কাহিনী নয়, বক্তব্যেই জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ এই শতকীয় আধুনিকতার মৌল অবয়বটিকে নাটকে রূপ দেন। কিন্তু একথা মনে রাখতেই হবে, ব্রেশ্‌ট ইউলিসিস রচয়িতা নন, একজন মার্কসবাদী হিসেবে সামাজিক দায়িত্বে অনেক বেশী আস্থাশীল। আর সে কারণেই তিনি প্রাচীন সেই গ্রীক নন্দনতাত্ত্বিকটিকে রাজস্ব দিতে নারাজ হন ও বাতিল করেন ক্যাথার্সিস। কেননা ক্যাথার্সিসের মৌল চরিত্রই হচ্ছে ভয় বা অনুকম্পা যা দর্শককে ইনভলভ করে; চরিত্রসমূহ ও ঘটনাস্থলের সঙ্গে একাত্ম করে এবং শেষপর্যন্ত প্রশ্নহীন দর্শক আবেগ ও নিষ্ক্রিয়তার কাছে আত্মসমর্পণ করে সেহেতু ব্রেশ্‌টীয় ব্যাখ্যায় তাঁর চেতনা বিনষ্ট হয়। পদার্থবিদ্যায় আপেক্ষিকতার প্রথম পুরুষ গ্যালিলিও যেমন গতিশীল বস্তুতে ঘর্ষণের ক্রিয়া জ্ঞাত হয়ে অ্যারিসটোটলকে অস্বীকার করেন, ব্রেশ্‌ট তেমনভাবেই

স্বপ্নের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করে প্রচলিত পোয়েটিকস বিসর্জন দিলেন। তবু আসল কথা দর্শককে তিনি অধিকতর দায়িত্বের অংশীদার করতে চান। ফলে তাঁকে ভাবতে হয় বিযুক্তিকরণের প্রসঙ্গ—যা আজকে ভি-এফেক্ট হিসেবে বিখ্যাত। আর্মেন্সরা যা বলছেন শুধুই তা নয়, নিছক পাঠশালা নয়। ব্রেশ্‌ট নিজেই এপিক আঙ্গিক প্রসঙ্গে দাবি করেছেন : Yet in the epic theatre moral arguments only took second place. Its aim was less to moralize than to observe. আমরা লক্ষ্য করছি কিছু বোঝানোর চাইতে ব্রেশ্‌ট দর্শকের যুক্তি ও সংবেদনার ওপর বেশী নির্ভরশীল। বস্তুত না হলে তাঁর দ্রোহ অপ্রয়োজনীয় ছিল; সঙ্গত ছিল কথামালা প্রণয়ন। এই জন্যেই তিনি বিষয়ে বাস্তবতার তথাকথিত অবয়ব হত্যা করেন যাতে দর্শক কৃত্রিম প্রকল্পটির সমালোচক হয়ে ওঠেন স্বেচ্ছায়, নাট্যচরিত্র, সংগীত, মঞ্চরীতি সর্বত্রই এমন আয়োজন করেন যা লঘু চিত্তবিনোদনের বদলে চিন্তাসূত্রগুলিকে উত্তেজিত করে। আর্মেন্সরা জানেন না স্তানিশ্লাভ্‌স্কি-ব্রেশ্‌ট বিতর্ক অনেক দিক থেকে এই পর্যবেক্ষণ-এর তাৎপর্যকে কেন্দ্র করেই, যদিও এই ব্রেশ্‌টীয় পর্যবেক্ষণ-সামাজিক দ্বন্দ্ববিন্যাস, কমিটেড।

অপরদিকে গোদারের চলচ্চিত্রজীবনে তদন্ত চালালেই বোঝা যায় শিল্প তাঁর কাছে সমালোচনার সম্প্রসারণ মাত্র। গল্প বলার সমস্ত সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দিয়ে সিনেমাকে তিনি বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ভাবতে চান। যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা জানাবেন, অতএব ল্যো পেতি সোলদা; গণিকাবৃত্তি বিষয়ে গবেষণা করবেন সুতরাং ভিভ্‌র সা ভি; আপোষকারী বামপন্থার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ আছে, পরিণামে লা শিনোয়া। তাঁর শিল্পীজীবনের সূচনা ফিল্ম-সমালোচক হিসেবে। কাইয়ে দু সিনেমার লেখক হওয়ার আগেই গোদার—সেটা ১৯৫০ সাল—বন্ধু এরিক রোমার ও জাক রিভেতের সহযোগিতায় চলচ্চিত্র সংক্রান্ত একটি মাসিক পত্রিকা লা গাজেত দু সিনেমা প্রকাশ করেন। মাত্র পাঁচটি সংখ্যা বেরোনোর পরেই কাগজটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি এই পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যাতেই গোদার লিখেছেন তাঁর জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ—"রাজনৈতিক সিনেমার দিকে"। আর সেখানে সোভিয়েত মহারথীদের পাশে সযত্নে ব্রেশ্‌টকৃত "কুহলে ওয়াম্পের" চিত্রনাট্যের কথা মনে রেখেছেন।

চলচ্চিত্রকার গোদারের কাছে বাস্তবতা প্রচলিত অর্থের নয়। তিনি

বলেন—Realism, any way, is never exactly the same as reality and in the cinema it is of necessity faked. সুতরাং দু'জন শিল্পীর কাছেই বাস্তবতা ফটোগ্রাফিক অর্থে অনুপস্থিত। এবং গোদার দ্বিতীয় ছবি ল্যো পেতি সোলদা থেকেই সিনেমাটিক বাস্তবতা ধ্বংস করার কাজে স্ব-নিযুক্ত। একটি যুদ্ধচিত্র দেখতে গিয়ে দর্শক যদি সিনেমার ইলিউশনে মুগ্ধ হয়? গোদার তাই বারেবারে ক্র্যাক সৃষ্টি করে বোঝাবেন—সে সিনেমাই দেখছে। এই বক্তব্য রাখার ও বক্তব্য শোনানোর ব্যাপারে তিনি এতদূর মনোযোগী যে সিনেমার ভিস্যুয়াল গুরুত্বও কমিয়ে দিতে চান শাব্দিক প্রাধান্যে: Broadly speaking, the cinema is returning to greater authenticity in dialogue and sound track. প্রায়শই সাক্ষাৎকারে গোদার জানান নাটক তাকে সাহায্য করে। ভিভ্‌র সা ভি-র প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেই বিষয়টি আলোকিত হবে। আমরা নায়িকার মৃত্যুর কথা তুলছি না, কিন্তু এই ছবি বারোটি অংশে বিভক্ত কেন—কাইয়ে দু সিনেমার প্রশ্ন। গোদার উত্তর দিয়েছেন: Why twelve. I don't know; but in tableaux to emphasize the theatrical, Brechtain side অর্থাৎ গোদার কনটিনুইটির অবসান ঘটাতে চান। বারোটি অংশে ভাগ করে ফিল্মটিকে মোটামুটি গতিশীল চিন্তার আকার দিতে চান। ক্যামেরা অনেকটাই নিরাসক্ত পর্যবেক্ষকের ভূমিকা নেয় ও বিশেষভাবে কথোপকথনকালে চরিত্রগুলিকে পেছন থেকে ধরে। পাঠক, লক্ষ্য করুন গোদার কিন্তু চাইছেন দর্শকের দূরত্ব, so that one is not distracted by their faces.

সংশ্লিষ্ট শিল্পরূপের সম্প্রসারণেচ্ছা থেকে ব্রেশ্‌ট যেমন মাদার কারেজ নাটকে, কিছু চলচ্চিত্রায়িত প্রক্ষেপ ব্যবহার করেন, অনুরূপভাবে গোদার কংক্রীট হওয়ার বাসনায় হাত পাতেন থিয়েটারের কাছে। এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয় দ্বিতীয় ছবি ল্যো পেতি সোলদা থেকে। সিনেমাটিকে অনুধাবন করলেই দেখা যায় পরিচালক যা চাইছেন তা হল দর্শকের সংযুক্তির বদলে কিছু নৈর্ব্যক্তিক মননের উদ্বোধন। ফিল্মের প্রথম পঙক্তিই উদাহরণের জন্য যথেষ্ট: The time for action is past, that of reflection is beginning. আর ব্রেশ্‌ট যেমন চেয়েছিলেন এপিকের দর্শক প্রশ্নশীল হোক, গোদারও দর্শককে জিজ্ঞাসু দেখতে চান: It is important for Subor to ask himself these questions, it is no less important for the spectator to ask

them, and it is important to me that he should. If one thinks after seeing the film, he showed this but not the solution, one should be grateful to the film, not angry with it.
গোদার যখন রক্তকিংশুকে জ্বলে যাওয়া রাত্রিদিনের মধ্যে দুটি সংলগ্ন হৃদয়কে বর্ণনা করার পর মুহূর্তে ষ্টুডিও সেটিং দেখান, আমরা বুঝতে পারি তিনি আসলে তথাকথিত সত্যের মুখোশ খুলে কৃত্রিমতার রহস্যে প্রবেশ করেছেন। আধুনিক শিল্পচেতনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকেই বুঝতে পারেন চূর্ণীকৃত ধারাবাহিকতা, আলো ও সংগীতে আপেক্ষিক অমনোযোগ, সমালোচনা প্রণয়নের আগ্রহ ইত্যাদি প্রসঙ্গে গোদার কাছে ঋণী।
তবু এখান থেকে সংকটেরও শুরু। সেকথা পরে বলা যাবে।

খ.

কারমেন, অয়ি মাংসের কুসুম, আর্ত রাত্রি তুমি। তুমি মৃত্যুর আরেক নাম : কারুকার্যময় বহ্নি, হা-হা চুল্লী, ঋতু, আরণ্যক বিভা। অতএব আবার কুশ্রীতার আলেখ্য দর্শন। আবারও জঁা-লুক গোদার বন্দনা করলেন সেই মর-সুন্দরীর যার নিবিড় কেশদাম তবে এক আতঙ্কের সূচনা যা আমাদের পক্ষে আদৌ প্রীতিকর নয়, মাত্রই সহনীয়। ডুইনো এলেজির এই বহুনন্দিত চরণটি তো উপলক্ষ্য মাত্র, রাইনের মারিয়া রিলকে কারমেনের রক্তে ছায়া ফেলে যান ছবির সূচনাতেই। ওলন্দাজী নিসর্গচিত্রের মত সন্ধ্যা নামে ; তার সোনার কবরীখসা অস্তরশ্মি ম্লান হয়ে ঝরে পড়ে রতিশৈলে আর থেকে যায় নিশীথ সিন্ধুর উদ্বেলিত রজতোপচার। সাংবাদিক, মন্ত্রীসভা, বেশ্যা, প্রণয়িণীর ভীড়ে ছড়িয়ে পড়ে ভালবাসা—ক্ষারগন্ধ পুঞ্জ পুঞ্জ কোষ্ঠ কারাগার।
কিন্তু, হঁ্যা, এই পর্যন্তই। যদিও পুরস্কার সম্বন্ধে আমার আস্থা তেমন বিশ্বাস্য নয় তবু আমার সন্দেহ নেই ভেনিস চলচ্চিত্রোৎসব (১৯৮৩) সংশ্লিষ্ট ছবিটির মাধ্যমে যতটা সমগ্র জঁা-লুক গোদারকে মাল্যদান করেছে ততটা কারমেন নাম্নী যুবতীর প্রতিকৃতি নিরীক্ষণে মুগ্ধ হওয়ার অবকাশ পায়নি। নখদন্তময়ী ওই স্ত্রীলোক, তার তিমিরলিপ্ত অকুস্থল, তার তীব্র ওষ্ঠে যে প্রাচীর যা ভালবাসার দ্বারা অতিক্রমণীয় নয়—সে তো ইতিপূর্বেই আমাদের পরিচিতা। আমাদের নিয়মতান্ত্রিক গীতবিতান বহুবার তছনছ করে দিয়েছে খবরের কাগজের

ডেটলাইন। আমাদের জ্ঞান, নারী, অভিজ্ঞতা, হেমন্তের হলুদ ফসল ইতস্তত যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে চলে গেলে নির্দোষ চায়ের ক্যান্টিনসমূহ আরও অনেক-বার মথিত হয়েছে মার্কস-কোকাকোলার সন্তানদের মস্করা ও কোলাহলে। গোদারের প্রতি আকৈশোর আত্যন্তিক অনুরক্তি পোষণ করা সত্ত্বেও এবার আমাকে পরিতাপের সঙ্গে মেনে নিতে হবে যে প্রেনম কারমেন তাঁর নাশকতা-মূলক কার্যকলাপের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি। প্যারিসের এমন অত্যাশ্চর্য পাপ ও পতন তাতে মুদ্রিত নেই যে ইতিহাস তাকে সময়নিরপেক্ষভাবে সনাক্ত করবে। কারমেন বিষয়ক প্রতিবেদন অপ্রকাশিত থাকলেও আমরা জানতাম, জানিয়েছিলেন স্বয়ং বোদলেয়ার, যে শৌচাগারের দেওয়ালে লটকে আছে মানুষের আত্মা। আমাদের প্রাপ্তি তবে কতটুকু? কল্লোলের অন্তহীন স্থাপত্য, মগ্নমৈনাকের স্বরলিপি, বঙ্কিম, মসৃণ, ক্ষীণ, সতত স্পন্দিত রূপসী—শুধু এই? ম্যাস্কুলাঁ ফেমিনাঁর এই প্রাসঙ্গিক উত্তরখণ্ড রচনায় গোদার ষাট দশকের ক্যাম্পাস বিদ্রোহের চোখ দিয়ে আশির দশকের ভিডিও সভ্যতাকে অবলোকন করেছেন। সত্যই বিটল ভ্রাতৃত্ব এবং/অথবা জিনস আশির প্রজন্মের অবদান নয় কিন্তু আরও বড় সত্য যে তিনি, গোদার, এই মন্তব্যকালে যতখানি সমালোচক ততখানি আত্ম-সমালোচক নন। তিনি অন্তর্ভুক্ত নন, আমন্ত্রিত। আর তাই শেষপর্যন্ত গোদারের এই অপ্রত্যাশিত পশ্চাদ্‌ভ্রমণ, বলা ভালো আত্মকরুণা, প্রতিক্রিয়াশীলতাই। দার্শনিকও হিম হয়, প্রণয়ের সম্রাজ্ঞীরা হবে না মলিন? পরিসমাপ্তিতে যদি এই আশাভঙ্গ উৎকীর্ণ থেকেও থাকে তথাপি, হে পাঠক, ক্ষণতরেও ভুলে যাবেন না প্রথম নাম কারমেন নির্বিকল্পভাবে জঁা-লুক গোদারেরই প্রণীত। সুতরাং আমাদের পক্ষে যা আসল প্রাপ্তি তা শ্রীমতী মারুশকা ডেট-মারের অপরূপ স্তনশ্রী নয় বরং আধুনিকতার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রকল্প যা এই ছবির মর্মে প্রবেশ করতে পারেনি কিন্তু চর্মে উলকি এঁকে দিয়েছে অবিরত।

প্রেনম কারমেনের সূচনাতেই যখন পরিচালক নামকরণের আগের স্তরটিকে পরীক্ষণীয় ভাবেন (What is there before the name ?) তখনই অনুমান করা যায় তাঁর প্রকৃত অন্বিষ্ট নামস্পৃষ্ট বিশ্বের সংকীর্ণতা মুক্ত বস্তুর শুদ্ধ স্বরূপ—এই ছবির নানা পর্বে যার উপস্থিতি সেই জর্মান কবি রিলকে নির্দেশিত Die Dinge। আমার পক্ষে সবচেয়ে জরুরী হয়ে ওঠে প্রেনম কারমেন বিষয়ে একটি সাক্ষাৎকারে গোদারের দাবি—And for once I wanted to see myself from the front and not from the back.

সামনে থেকে দেখার এই আকৃতি, এই প্রথম প্রচ্ছদ আসলে চাক্ষুস বাস্তবতার সম্প্রসারণ : দৃশ্যের অন্তরালবর্তী শূন্যতার অবয়ব রচনা। নশ্বরতা কি যে মায়াময় ; মৃত্যুর পশ্চাদ্ধাবনরত গোদারের পদ্ধতি হয়ে ওঠে সংশ্লেষণ ও সমন্বয়ের।

অতএব সুরকার বিজের অপেরার দক্ষিণ সমুদ্রের বদলে অন্য সমুদ্র অথবা নীটসের প্রতি কৃতজ্ঞতাসহ উক্ত শিল্পীর "বাদামী" স্বরলিপির বদলে বিটোফেনের প্রতিষ্ঠা মূল কথা নয়, কারমেন প্রণয়নে গোদারের প্রকৃত পূর্বসূরীত্ব প্রাপ্য ভানগখের। উদাহরণ হিসেবে আমরা নজরে আনব শস্যক্ষেত্রের উপরে উৎক্ষিপ্ত বায়সসমূহকে (Crows over the wheatfield) যারা রেখার মৌনসংহতি ছিঁড়ে ফেলে সংগীতের সমীপবর্তী হতে চায়। একেই, এই মিশ্রস্বরকে আমি আমার নানা লেখায় আধুনিকতার সম্প্রসারণধর্মীতা হিসেবে বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছি। এখানে একটি শিল্পমাধ্যম তার সীমাতিক্রম করে বিশিষ্টের বদলে সামান্য হতে চায়। বেহালার স্বরবিস্তারে সমুদ্রতরঙ্গের বিন্যাস ও রতিসুষমা যুগপৎ একটি শ্রুতিগ্রাহ্য বাস্তবতার আকার পরিগ্রহ করে। সংগীতের এই মূর্ত, শরীরী উপস্থিতির জন্যই কারমেনের একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। আর যা অবশিষ্ট থাকে কারেন্সি বিনিময়ের সেই আমিষগন্ধ, উইকএণ্ড জাতীয় ছবিতে তা প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল আগেই। পুনরাবৃত্তিতে আমাদের কৌতূহল থাকবে কেন ?

গোদারের প্রতি আমাদের আগ্রহের মূল কারণ ছিল আধুনিকতার যা সারাৎসার বক্তব্য রাখার সেই রীতিটিকে তিনি বৈপ্লবিকভাবে চলচ্চিত্রে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বক্তব্য রাখার বিষয়ে তিনি এতদূর সংকল্পবদ্ধ যে ভিস্যুয়াল ভিত্তিক চলচ্চিত্রীয় নন্দনতত্ত্বের গুরুত্ব কমিয়ে দিতে চান শাব্দিক প্রাধান্যে : Broadly speaking, the cinema is returning to greater authenticity in dialogue and sound track.

কাইয়ে দু সিনেমাকে তাঁর মধ্যযৌবনে প্রদত্ত এই মন্তব্যের অনুস্মৃতি রয়েছে এই ছবির সর্বাঙ্গে। প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে অসামান্য সেইসব উল্লম্ব মন্তাজ শব্দ যেখানে ছবির সঙ্গে ধারাবাহিক বিন্যাসে না থেকে সহবিন্যাসে আছে। তবু আমাদের স্বীকার করতেই হবে তাঁর শব্দ-সংক্রান্ত অভিযান প্রেনম কারমেনে আরও নতুন মাত্রা পেয়ে জলজ্বল করছে। একজন ভাস্কর যেমন রদ্যাঁ যে মনোভাব নিয়ে সমতলীয় শূন্যতায় বক্রতা খুঁজে ফেরেন, সংগীতজ্ঞরা যে অভিবল

স্পেস বা শ্রাব্য আয়তনের জন্য আকুল, গোদারের কাটিং বিশেষত শব্দের মিশ্রণ ও সম্পাদনা তেমনভাবেই রক্তপাত, গ্রীবাভঙ্গ, জলরাশি—মৃত্যুর অধিক শূন্যতাকে আরোহী ও অবরোহী স্বরের বক্রিমায় চক্ষুদান করতে চেয়েছে। এই আকাঙ্ক্ষা এই চেতনা দ্রষ্টার চেতনা যা কারিগরের নয় যা বিশৃঙ্খলা ও কিমিতিকে, মৃত্যু ও শূন্যতাকে, পাপ ও প্রজ্ঞানকে নিবেদন করে অসীমের সমীপে।

যেহেতু সমুদ্র দেখেনি কেউ সময়ের নৃত্যরত গোড়ালি দেখেছে, প্রেনম কারমেন যদি অসফল হয়েও থাকে তথাপি সেই ব্যর্থতা আধুনিকতার একটি অনুসিদ্ধান্ত। সময়কে আক্রমণ করতে চেয়ে জঁা-লুক গোদার সময়েয় হাতেই আপাতত পরাস্ত হয়েছেন। আর তাই তাঁর এই পরাভব স্মৃতি-বিস্মৃতির অধিক সম্ভ্রমে আমাদের পক্ষে বিচার্য থেকে যাবে।

বাস্টার কীটন : সন্ধ্যার মেঘমালা

ভগ্নহৃদয় ও স্খলিতচরণ, নিঃশেষিতপ্রায়, ললাটে ক্লান্তির বলীরেখা—বাস্টার কীটন তখন মত্ততার দিনলিপি। কি ছিল বিধাতার মনে, সামান্য শিল্পীরা যাতে অল্প সুদে গৃহ নীড় নির্দেশ সকলি পেতে পারে এরকম প্রস্তাবও বিবেচনাধীন ছিল না। তবু পানপাত্র সরিয়ে রাখলেন বাস্টার কীটন। আমরা ১৯৫৬ সালের কথা আলোচনায় আনছি। আর দশ বছর বাদে পৃথিবীর করতালি ও মৃত্তিকা কীটনের পক্ষে অতীত হয়ে যাবে। "গন উইথ দা উইণ্ড"-এর তুলনায় "দ্য জেনারেল" কে কেন অধিকতর প্রামাণ্য দেখায়—এই প্রশ্নের উত্তরে বিনীত কীটন একদা জানিয়েছিলেন—well, they went to a novel for their story, we went to history—কথাটির মধ্যে যে দার্থতা, ১৯৬৫-র ভেনিস চলচ্চিত্রোৎসবের বিপুল উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে তা প্রাণ পায়। আজ বিশেষজ্ঞের সাহায্য না নিয়েও আমাদের পক্ষে বলা সহজ হয়ে গেছে যে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে হলিউড যাদের কৌতুকচ্ছটায় প্রসন্ন হয়ে ওঠে তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয় নাম জোসেফ ফ্রান্সিস কীটন। প্রথমজন অবশ্যই তুলনারহিত চ্যাপলিন।

আজকের সাধারণ দর্শকের পক্ষে অনুমান করাও কঠিন চলচ্চিত্রের সেই নির্বাক কৈশোরে কি পরাক্রান্ত স্থাপত্যের জনয়িতা ছিলেন বাস্টার কীটন। কেননা আমরা আজ চলচ্ছবিকে আত্মার অভিব্যক্তি ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। কেননা আঁদ্রে বাজাঁর শিল্পতত্ত্বের মূল ভিত্তি—Choosing the personal factor in artistic creation as a standard of reference—আমাদের কাছে একটি তর্কাতীত স্বতঃসিদ্ধ মাত্র। অথচ মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও এসব কথা কল্পনাকেও ছুঁতে পারত না। আমি কি শ্রীযুক্ত জেমস মনাকোর সাহায্য নেব? It was most often considered a social rather than the personal expression. The great Hollywood films of the thirties and forties were made in Studio factories, after all. আমরা জানি আদিযুগের মার্কিন চলচ্চিত্রগুলি তাদের স্রষ্টাদের থেকেও অনেক বেশি পরিচিত উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের নামে—যথা ওয়ার্নার ব্রাদার্স, প্যারামাউণ্ট,

এম জি এম।

সংশ্লিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে বাস্টার কীটন ছিলেন একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তি; এই ব্যক্তিসত্তা তাঁকে অর্জন করতে হয় অনেক শ্রম ও প্রেমে। শুধু তাই নয় কীটনের মৌলিকতা বোধহয় স্মরণীয়তর হয়ে প্রকাশিত হয় আঙ্গিক চেতনার আধারে। একটু সাহস করে আমি কি তুলনায় আনব চ্যাপলিনের 'গোল্ডরাশ' ও কীটনের 'আওয়ার হসপিটালিটি'—একই সময়ে নির্মিত ছুটি ছবির? গোল্ডরাশের গঠন অনেক পলকা, প্রায় সেকেলে। দ্বিতীয় ছবিটি সেক্ষেত্রে চূড়ান্ত সপ্রতিভ, জ্যাবদ্ধ। তবুও যে কীটন শেষ পর্যন্ত কীটনই—চ্যাপলিনের মত অবিস্মরণীয় নন—তার কারণ তাঁর অস্থি ও মর্মে ছিল না সেই উপলব্ধি যাকে কবি জীবনানন্দ দাশ বলেন ইতিহাসচেতনা। উদাহরণ—দ্য জেনারেল। নিখুঁত ছন্দজ্ঞানই মহৎ কাব্যের একমাত্র অভিজ্ঞান নয়। ফলে চার্লি চ্যাপলিন হয়ে দাঁড়ান সভ্যতার রোদনশীল বিচারক এবং বাস্টার কীটন একজন মজার মানুষ বা একজন মেধাবী বিদূষক মাত্র।

আসলে তাঁর জীবনই কীটনের প্রধান হাতিয়ার ও প্রতিবন্ধক; সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্য যুগপৎভাবে দায়ী। হাতিয়ার এ কারণে যে জন্মসূত্রে পিতামাতার সাহচর্যেই তিনি আয়ত্ত করেন অভিনয় ও মঞ্চক্রিয়ার মুল সূত্রগুলি। তাঁর জীবনে অভিনয় ও উপস্থাপনা হয়ে যায় শ্বাসবায়ুর মত স্বাভাবিক। উপরন্তু, একজন শিল্পীর পক্ষে বিশ শতকীয় মার্কিনী সমাজব্যবস্থায় যা অচিন্ত্যনীয় সৌভাগ্য, তাঁকে স্কুল-কলেজের চৌকাঠ পেরোতে হয়নি। তাঁর শিক্ষা ছিল আক্ষরিক অর্থেই বিধিমুক্ত; জীবনের পাঠশালা থেকে আহৃত। অন্যদিকে প্রতিবন্ধক যে শিল্পী জীবনে এই অনায়াস প্রবেশ তাঁকে রক্ত পরীক্ষায় প্ররোচিত করেনি। ফলে ব্যক্তিগত জীবনে অসফল দাম্পত্য কিংবা মেট্রো গোলডুইন মেয়ারের সর্বাধ্যক্ষের প্রত্যাখ্যান তাঁকে সহজেই চূর্ণ করে দেয়। আর—১৯১৭ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রসারিত তাঁর কর্মজীবনে—ডজনখানেক পূর্ণ দৈর্ঘের ছবি ও খান তিরিশেক শর্ট উত্থানপতনহীন হয়ে পড়ে। তাঁর অতিখ্যাত 'দ্য জেনারেল' ও অল্পখ্যাত 'দ্য বোট' একই রকম মসৃণ। এবং দ্বিতীয় ফিচার ছবিটি কোনক্রমেই অন্তিমটির চাইতে কম প্রসাধিত নয়। প্রমাণিত হচ্ছে কীটন ঝুঁকি নিতে পারেন নি; নিজেকে বারেবারে অতিক্রম করা ছিল তাঁর সাধ্যাতীত। অর্থাৎ পাঠক, আমি বোঝাতে চাইছি শ্রীযুক্ত বাস্টার কীটন ছিলেন একজন স্বভাব শিল্পী এবং এও চ্যাপলিনের দৃষ্টান্ত সূত্রে আমার

প্রতিপাদ্য যে মহৎ শিল্প স্বভাবের দাসত্ব করে না। কিন্তু, ভয় হচ্ছে, আমরা বোধহয় প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি।

অভিনয় ছিল তার রক্তে আক্ষরিক অর্থে। কমেডিয়ান কীটন ক্রোমোজোম সূত্রেই পেয়েছিলেন হাসির হাতছানি। পিতা-মাতা যখন একটি ওষুধের প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনী প্রচার অভিযানে রঙ্গ নাটিকার পরিবেশনে ভ্রাম্যমান, তখন তাঁর জন্ম হল—চৌঠা অক্টোবর ১৯৮৫—উক্ত দলটির জন্য নির্দিষ্ট একটি অতিথিশালায়। মাত্র ছ' মাস বয়সে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে অলৌকিক অব্যাহতি পাওয়ায় বিখ্যাত জাদুকর শ্রীযুক্ত হ্যারি হুডিনি অধুনা সর্বত্র প্রচারিত তাঁর 'বাস্টার'—এই ডাক নামটি বেছে দিলেন। আজ এই Vaudeville বা ভ্রাম্যমান রঙ্গনাটিকা শেষ উনিশ শতকে ইয়াঙ্কি সমাজের প্রমোদ উপকরণের একটি স্থূল স্মৃতি মাত্র। একটি যুগের প্রয়োজনেই তা লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু তা বাস্তবিকই বাস্টারকে সুযোগ দিয়েছিল অভিনেতার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় অ্যাক্রোব্যাটিক্স ও তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন কৌশল শেখার। জনকের সৌজন্যে মাত্র তিন বছর বয়সে কীটন স্টেজে নামেন। তাঁর অভিনয় তখনই এত প্রতিভাদীপ্ত ছিল যে মাত্র চার বছর বাদেই গুজব রটে যে কীটন মোটেই শিশু নন; চতুর বামন মাত্র। কৌতুক নাটিকার অপ্রতিরোধ্য চরিত্র হিসেবেই বড় হয়ে উঠছিলেন তিনি। ইতিমধ্যে এক রাত্রে বাবা-মার দাম্পত্য বিচ্ছেদ চূড়ান্ত হল। কীটনের সামনে তখন উজ্জ্বল ভবিষ্যত; মাত্র একুশ বছর বয়সেই সপ্তাহে তিনশো ডলারের চুক্তিপত্র অপেক্ষা করছিল। কিন্তু আলোচ্য যুবকের নাম যেহেতু বাস্টার কীটন এবং বাস্টার কীটন একজন অ-সাধারণ যুবক তিনি বেছে নিলেন হপ্তায় তুচ্ছ চল্লিশ ডলার। হ্যাঁ, এই সামান্য অর্থ ই ছিল চলচ্চিত্রাভিনয়ের জগতে কীটনের প্রবেশ দক্ষিণা।

শ্রীযুক্ত বস্কো আরবাকলের সঙ্গে সহযোগিতার প্রারম্ভিক দু বছরে (১৯১৭-১৯) যদিও অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণিত হয়েছিল কীটনের অভিনয় ও পরিচালনার প্রতিভা কিন্তু যাকে বলে মাস্টার পিস তাকে কীটন প্রথম স্পর্শ করলেন 'ওয়ান উইক' নামে দু' রিলের ছবিটিতে (১৯২০)। এ সময় তাঁর দাম—সপ্তাহে হাজার ডলার তৎসহ প্রতিটি ছবির শতকরা পঁচিশ ভাগ লভ্যাংশ। এরপরে শুধুই সাফল্য। কীটনকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। কৌতুক রচনা করো ও অতি হাস্যকর হয়ে উঠো না (get a lough and don't be too rediculous): এই ছিলো তাঁর গায়ত্রী মন্ত্র, একমাত্র গাণ্ডীব ও শ্রাবণ

নিশীথের অশনি সঙ্কেত। এই বীজমন্ত্রের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগেই সৃষ্টি হয়েছে অসামান্য 'আওয়ার হসপিটালিটি' কিম্বা অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'জেনারেল' অথবা লঘুছন্দ 'কলেজ'।

আমাদের আপাতত সুযোগ নেই বাস্টার কীটন প্রণীত চিত্রাবলী বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রণয়নের। তবু 'জেনারেল' সম্পর্কে দু' একটি কথা না বলা আমার অন্যায় হবে। অন্ততঃ এই একটি ছবি আজও সাক্ষ্য দিয়ে যায় সংশ্লিষ্ট মাধ্যমটিকে কীটন কি স্বচ্ছন্দে শাসন করতেন। মার্কিনী গৃহযুদ্ধকালীন একটি ট্রেন লুণ্ঠনের রুদ্ধশ্বাস অ্যাডভেঞ্চারময় দক্ষিণী প্রতিরোধ এই ছবির কাহিনী। তথ্যের শুষ্ক ত্বককে যা লাবণ্যময় করে তোলে তা একটি অভিমানকম্পিত প্রণয়াঞ্জলী। এই ছবির প্রতিটি স্তরে পরিচালকের উদ্ভাবনশীল প্রতিভার পরিচয় থরে থরে সাজানো রয়েছে—বাস্তবতার নির্মাণে, সুমিত অভিনয়ে, সুচারু সম্পাদনায়। শেষ পর্যন্ত রণ-রক্ত-কোলাহল মুছে যায়; আমরা ভাগ্য বিড়ম্বিত, একাকী ট্রেন চালকটির প্রেমে পড়ে যাই। এই ম্লান দিগন্ত রেখাটুকুই সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিমাটির চক্ষুদান করে। অন্য অনেক ছবিতেই কীটনের অভিনয় চাতুর্য বা চমকপ্রদ গঠন কৌশল রয়ে গেছে কিন্তু ইতিহাস রহিত 'জেনারেল' যে স্মরণীয়তম হয়ে বেঁচে আছে তার কারণ মানবিক অশ্রু ও আকাঙ্খার সজীব উপস্থিতি।

দুর্ভাগ্য, কীটনের মূল লক্ষ্য ছিল চলচ্চিত্রের শরীর, আত্মা নয়। অর্থাৎ আমি বলব চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্বের উন্নয়নে কীটনের সাধনা ততটা নিয়োজিত হয়নি যতটা ধাবিত হয়েছে তার কাঠামোগত সংস্কার ও পরিমার্জনায়। কীটনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তিনি প্রতিটি ফিল্মেই অভিনব। এ কথা শুধু জেনারেলের অনন্য লোকোমোটিভটিতে, আওয়ার হসপিটালিটির নদীদৃশ্যে, কলেজের উদ্ধারপর্বেই নয়, সত্য হয়ে রয়েছে অন্যান্য গৌণ ছবিগুলিতেও। কীটনের স্বাতন্ত্র্য তবে সবচেয়ে প্রখর হয়ে দেখা দিয়েছে বোধহয় সম্পাদনায়। অথেনটিসিটির প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ তাকে প্ররোচিত করে লং টেকের প্রতি। মনে রাখতে হবে সে যুগে গ্রিফিথের ধরনে র্যাপিড কাটিং ছিল নিয়ম। পেনিলোপ হাউসস্টন অত্যন্ত সঠিকভাবেই তাই সম্পাদনার কীটন রীতির মধ্যে খুঁজে পান সেই Technique which happens to be most in line with modern, or atleast 1960's aesthetics. আর তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে বোধহয় একটি কথাই বলা ভালো যে চ্যাপলিনকে বাদ দিলে তিনিই নির্বাক

যুগের একমাত্র অভিনেতা যার কোন অভিব্যক্তিই আমাদের গবেষণা দাবী করে না ; তা সতত স্বচ্ছ। সামান্য একটি ভ্রু-বিলাস বা উৎকণ্ঠিত পদচারণা থেকেও বোঝা যায় বাস্টার কীটন ভাব প্রকাশের ভঙ্গী সমূহকেও আপন কররেখার মতই জানেন।

এই জানারও অধিক একটি জ্ঞান তাঁর ছিল। তা দীনতা—অন্তিম গুণ ও অন্তহীন নক্ষত্রের আলো। হাস্যরসের কয়েকটি অনিঃশেষ ঝর্ণাধারার উৎস উন্মোচন করার পরও, অন্তর্গত বিনয়বোধ থেকেই, তিনি ভবিষ্যতের কাছে আশা করেন নি অনুমোদন, মানপত্র ও পারিশ্রমিক। কিন্তু প্রাথমিক দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে সময় তাকে দান করেছে নিজের শিলমোহর। বাস্টার কীটন সেই যুগের ঐতিহাসিক ভাষ্যকার যা মূক কিন্তু সচল, নির্বাক কিন্তু কর্মিষ্ঠ, নীরব কিন্তু স্বপ্নমদির।

গুগাবাবা ছাড়া, বাস্তবিক এদেশে, আর কোন ছবিকে শিশু-চলচ্চিত্র ভাবতে আমার ইচ্ছে করে না। আর তাই শিশুদের জন্যে চলচ্ছবি—বিষয়টি আমাকে বেশ বিব্রত করে; প্রায় অনধিকার-চর্চা মনে হয়। এমন তো নই যে পেশাদার সমালোচক: আত্মরক্ষা করতে পারব "জগৎ পারাবারের তীরে ছেলেরা করে খেলা'—রবীন্দ্র-উদ্ধৃতির নিরাপদ অন্তরীক্ষ থেকে। সমস্যাটি শিশুমনের এবং সেজন্যই আমার কাছে অন্ততঃ জটিল। আমার মত মানুষ স্নায়ুতন্ত্রের পরিকল্পিত চিত্রলেখ দেখতেই অভ্যস্ত; স্বপ্নের পরাযৌক্তিক মাত্রাযোজনা তার কাছে তত সুগম ও স্বাভাবিক বোধ হয় না।

I am not good at singing lullabies though I have tried that too - এই স্বীকারোক্তি যিনি রাখেন, যদিচ অন্য প্রসঙ্গে, তিনি ঈশ্বরপ্রতিম শ্রীযুক্ত ফিয়দর দস্তয়েভস্কি। তবু আমাদের মানতেই হবে তাঁর দীনতা অন্তিম গুণের স্মারক হতে পারে কিন্তু ব্যর্থতারও প্রমাণ. প্রাসঙ্গিকভাবে মনে হতে পারে ঋত্বিক প্রণীত বাড়ি থেকে পালিয়ে'র কথা। হে পাঠক, সবিস্ময়ে লক্ষ্য করুন একজন প্রকৃত প্রতিভা পর্যন্ত দেশবিভাগ ও অন্যান্য সামাজিক যুক্তির অবতারণা করে শিশুকে কি পরিমাণ নিরুৎসাহী করে তোলেন। অনুরূপ আরেকটি নির্মাণ বোধ হয় 'হীরক রাজার দেশে'। এরা, এই চলচ্চিত্রদ্বয় সৌরকলঙ্ক ও অসফল। কিন্তু কেন?

আসলে শিশুদের জগৎ দূরবীনের উল্টোদিকের জগৎ: যুক্তিহীনতার পৃথিবী। ঋত্বিক-সত্যজিৎ সেখানে প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। একথা ঠিক যে কোন শিল্পের জরায়ুই বিস্ময়-নিষিক্ত। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কের মননের সঙ্গে শিশুর মননের প্রধান না হলেও অন্যতম পার্থক্য এই যে, শিশু প্রবীণদের মত বিস্ময়কে প্রশ্নবিদ্ধ করে না, বরং শ্রদ্ধা করে। ভাগ্য-প্রবঞ্চিত বানর ও পেঁচা রাজকুমারদের সে ভালোবাসে। কিন্তু অবাক হয়ে নয়, স্বাভাবিকতা হিসেবে। আর সে-জন্যই রাজা যখন কুচক্রী পাঁচ রাণী ও পাঁচ রাজপুত্রের ঘর কাঁটা দিয়ে, মাটি দিয়ে বুজিয়ে দেন তখনও সে শিহরিত হয় না। প্রয়াত বুদ্ধদেব বসু অত্যন্ত সঠিক ভাবেই বলেছিলেন—'এ চোখ দেখতে ভয় পায় না, দেখতে পেয়েও আকুল হয়

না, এতে কাছে ডাকা নেই, দূরে রাখাও না—একই সঙ্গে নির্লিপ্ত ও ঘনিষ্ঠ, ' একে বলতে পারি প্রাণপদার্থের পবিত্রতাবোধ।' আসলে শিশু এমন একটি বিশ্বের বাসিন্দা সেখানে তিন আর তিনে যোগ করলে ছয় নাও হতে পারে—এই না হওয়াটাও ভুল নয় রেলমন্ত্রকের বিধিসমূহের প্রতি উদাসীন থেকে রেলগাড়ীর রঙ হলুদ হয়ে যায় ; দিগন্তরেখার অনতিদূরবর্তী একটি বৃক্ষে ফুটে ওঠে সাত ভাই চম্পা ও পারুল বোন ; শিশুর উল্লাসে ইউক্লিডের প্রবেশ নিষেধ ঃ প্রাপ্তবয়স্কের মূল বিপন্নতা সেখানেই।

আমি, অতএব, যা বলতে চাইছি তা হল শিশুদের জন্য যে কোন শিল্পপ্রয়াসই ক্ষমতার সমস্যা এবং অধিকতর ভাবে অ্যাটিচুডের সমস্যা। রবীন্দ্রনাথের অলোক সামান্য প্রতিভা শৈশবকে বিষয় করে প্রায় সর্বত্রই সীমাতিক্রম করে, ডাকঘর তো একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। অন্যদিকে রূপকথার রাজকুমার হান্স আণ্ডেরসেন বয়স্কদের চরাচরে ভ্রমণের ফলে নিন্দিত হন সমকালীন দার্শনিক কিয়েৰ্কেগার্দের দ্বারা। অবশ্য পাঠক যেন ভুল না বোঝেন, আমার উদ্দেশ্য নয় রবীন্দ্রনাথের আপেক্ষিক সাফল্য ও আণ্ডেরসেনের ম্লান পতনের মধ্যে একটি তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিত রচনা।

অন্যদিক দিয়েও আমার কথাটি স্পষ্ট হতে পারে। সত্যজিৎ রায়-কৃত পিকু কিছুদিন আগে রক্ষণশীল দর্শকদের দ্বারা অভিযুক্ত হয় এই যুক্তিতে যে নর-নারীর জৈবিক সম্পর্কের পরিধি শিশুর উপলব্ধির বিষয় নয়। এই সমালোচনার উত্তরে সহসা মনে পড়ে যায় বুড়ো আংলার, অবন ঠাকুরের আঁকা, সেই অর্থময় দৃশ্যটি, সেখানে খোঁড়া হাঁসের সঙ্গে সুন্দরী খালিহাঁসটির দেখা হবার পর তারা দুজনে জলে গিয়ে সাঁতার আরম্ভ করে। শিশুসাহিত্যে নিষিদ্ধ একটি এলাকা কবিতার একটু ছোঁয়া পেয়ে কেমন ঝলমল করে উঠল। সরলতার এই শব্দশিল্পের জনয়িতা স্বয়ং প্রজ্ঞান।

অনেকে বলতে পারেন, আজকের শিশু অনেক বদলে গিয়েছে। সে ভিডিও ক্রীড়ায় অভ্যস্ত ; ইন্দ্রজাল কমিক্স তার পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। কমপক্ষে সে বেতার ও দূরদর্শনের আবেদনে সাড়া দেয়। অর্থাৎ তার ভূগোল বেড়েছে। শিশুদের জন্যে নিবেদিত শিল্পের চরিত্রও সুতরাং পালটাবে। রূপকথার আলো-আঁধারিতে বন্দিনী রাজকন্যার তুলনায় অরণ্যদেবের স্বল্পবসনা সহচরী, প্রকৃতি ও জীবজগতের উদার বিস্তারের বদলে রোমহর্ষক গোয়েন্দা উপাখ্যান শৈশবকে কি পরিমাণে বিষের পাত্র হাতে তুলে নিতে প্ররোচিত করে সে বিতর্ক আপাতত তুলে রাখলেও বলা

যায়, শিশুমনের এই বিস্তৃতি যতটা আনুভূমিক ততটা উল্লম্ব নয়। কল্পনা ও ইচ্ছাপূরণের প্রতিভা শিশুর মজ্জাগত রয়ে গেছে। থেকেও যাবে শেষ পর্যন্ত।
এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যত কথা বলেছি, তায় বেশির ভাগটাই চলচ্চিত্রের বদলে সাহিত্য নিয়ে। তার কারণ অনভিপ্রেত হলেও দেখতে পাই আমাদের চলচ্চিত্রে এখনও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা স্কুমার রায় আসেননি। সত্যজিৎ রায়ের বিরল উদাহরণ বাদ দিলে অধিকাংশ সময়ে শিশু-চলচ্চিত্রের ছলে রূপোলী পর্দায় যা দেখা যায় তা একরকমের দুষ্ট ব্রণ। তাতে শিশু অপমানিত বোধ করে; বয়স্করাও সম্মানিত হয় না। দেড়শো খোকার কাণ্ড বা পদী পিসির বর্মী বাক্স জাতীয় ছবিতে যা ছড়িয়ে থাকে তা ছেলেমানুষকে খুশী করতে গিয়ে ছেলেমানুষী ভুল নয়ত বাচ্চাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টায় উৎকট অশোভন মুখভঙ্গী। আর যা থাকে না, তা রান্নার নুন—কল্পনা প্রতিভা। আমরা যারা সাধারণ মানুষ শুধুই ভোক্তা, স্রষ্টা নই, শিশু-সাহিত্যের সুবর্ণযুগ যাদের পরিচিত তারা শিশু চলচ্চিত্রের পর্দায়ও দেখতে চাই একটি অবাক হওয়া মুগ্ধতার আকাশ যেখানে মূক পশু, নীলিমা, তরুলতা ও তরুণ মানব-সন্তান নিজেকে বিরহহীনভাবে খুঁজে পায়ঃ পণ্ডিতেরা যাকে বলবেন organic linkage, যা শৈশবের গঙ্গোত্রীকে পৌঁছে দেয় পরিচ্ছন্ন পরিণতির মোহনায়। সুবচনীর সেই খোঁড়া হাঁসটি কবে চলচ্চিত্রের আঙিনায় এসে বসবে?

শেষ বুদ্ধিজীবী

বলা যায় অমিয়ভূষণ মজুমদার প্রাথমিক ভাবে অপ্রতিরক্ষিত। আত্মসমর্পণের কোন নিশ্চিত নির্দেশ খোঁজা বৃথা দ্রুতপঠনে। অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে তাঁকে পড়ে যেতে হয়। সচরাচর আলোচিত নন যেহেতু বিস্ময়েয় কোন প্রকট আবর্তকে পরিহার করতে ভালবাসেন। কোন প্রখর সামাজিক সমস্যা নয় (পলদহের মতো গল্পও আমার এ বিশ্বাসে আঘাত করেনি), কোন নির্দিষ্ট বিষয়ও কি ? অমিয়ভূষণে মগ্ন কণ্ঠস্বরের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। পাঠকের প্রতি কোন দায়িত্ব আরোপ করেন নি, তাঁকে আবিষ্কার করে নিতে হয়। অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিশক্তি ও কল্পনা প্রতিভা— আমি যাকে একজন গল্পকারের অপরিহার্য অস্ত্র ভাবি—স্বীকার করি তার মধ্যেই নিরাপত্তা পেয়ে অমিয়ভূষণ মজুমদার স্বয়ং এক মননের নির্মাণ ; শরীর ও চরিত্রে একান্ত ভাবেই গল্পকার , নিরঞ্জন গল্পমনস্কই শুধু।

আবরণ উন্মোচন কোন না কোন অর্থে প্রত্যেক লেখকেরই স্বভাব। অমিয়ভূষণ ব্যতিক্রম নন। তাঁর দৃষ্টি দর্শকের অন্যমনস্কতায় নিহিত নয় , পরীক্ষকের মতো তীক্ষ্ণ, প্রধান প্রয়াস মনস্তত্বে আমি দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করছি। অতল অন্ধকার থেকে ছায়া উদ্ভিদের দেহ পরিস্ফুট হয়। দৃষ্ট হোল অবয়ব তবু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয় যেন, কোথাও অজানিত বিক্রিয়া ঘটে গেছে। এমন একজন গল্পকার ঃ তাঁর চরিত্র সৃজনে কোন অসাধারণ ভাবাবেগ সংক্রামিত না হলেই নয়। শিক্ষিত নাগরিকতা, উচ্চবিত্ত সংকট বা নিয়ত গ্রামীন ভুলারহীন এমন কি প্রায় রাবিন্দ্রীক ময়ী সর্বত্র ঋজু এক স্বাতন্ত্র্যের প্রবাহ। আর নিরূপম সেই ম্যাগদালেন ! যদিও কোন ক্রম পারম্পর্যে নয়, মনে করা যেতে পারে পঞ্চকন্যা গল্পগুচ্ছকে যেখানে লেখক কোন প্রযুক্তিবিদের চাতুর্যে একাধিক দৃশ্য পর্যায়ের অবতারণায় স্ব-স্থ উপন্যাসের মতো কোন পূর্ণ চিত্রের পরিবর্তে। মুগ্ধ না হয়ে পারি নি একটি গল্পের অবয়ব গঠনে তাঁর অসামান্য প্রযত্নে ; গল্পে কোন অবসর নেই ; আমার মনে হয় নি একটিও অন্যভাবে নির্মাণের সুযোগ ছিল। সেখানেই বোধ হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ সার্থকতা অন্ততঃ কাহিনী যখন মৌল অবলম্বন। বাক্য বিন্যাস ও পরিবেশ উপস্থাপনায় অমিয়ভূষণ বাহুল্য বর্জিতের একটি তরঙ্গ ঃ স্পষ্ট অথচ সাংকেতিক। অনেকে দাবী করেছেন, প্রতিটি ছোটগল্পই একটি সুস্পষ্ট সমাপ্তী ধ্বনিত করে। তা-হোলে “পদ্মিনী”কে কি বলব ? এ গল্পের কোন শেষ থাকতে পারে ? অথবা এমন এক গল্প যা সহসা স্তব্ধ হয়ে পড়ে “হঠাৎ একটা লোক চলে গেল” ঘোষণায়।

আর এইসব মিলিয়েই—হয়তো অতিক্রমও করে—অমিয়ভূষণের গল্প আমার আলোচ্য।

যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে পড়েন সাদা মাকড়সার মতো গল্পে। অন্তর্গত কোন মাকড়সার জালে ধরা পড়ে গেছে সবাই—দুলাল, জনেরা, ব্যালেণ্টাইন, এমন কি ম্যাগদালেন। দুলালের ক্ষেত্রে যা ছিল বিশেষ আদর্শ, জনেদের ক্ষেত্রে নারী। ম্যাগদালেন নিজে উর্ণনাভ হয়েও তো পরিত্রাণ পায় নি। এই নির্বাসনে সোনার পাহাড়ের ঋতুমতী কন্যার মতো স্মিত স্বদেশ কাঙ্খিত ছিল—নিজের চিরকালের জন্য হারানো জন্মভূমি। যে জীবন স্বর্গের তার থেকে বিদায় তবে কেন? উত্তর নেই। শুধু জেনে যেতে হয়। বিপর্যস্ত সেই নারীটি তিনরাজ্যের সীমানা পায় নি, অমিয়ভূষণ পেয়েছেন শিল্পের অনন্ত নীরবতা, ত্রিকাল যেখানে লীলাময়। জীবনে সার্থকতার প্রশ্নে বিমূঢ় পঞ্চকন্যার প্রতিটি নায়িকা। একমাত্র দুলারহীনই সম্ভবতঃ অন্যকে সার্থক করতে চেয়েছিল; সেও পারেনি। সে সাগ্নিকা গল্পটি আমার প্রিয় না হলেও সাধারণী ময়ীর আশ্চর্য স্নিগ্ধতায় যে দ্বন্দ্বের বীজ বপন করে গেলো ক্ষমা তার সুমিত প্রকাশ কি ভোলবার? ক্ষমা এবং সঙ্গিনীর মধ্যবর্তিনী এই নারী সুখের সন্ধানে অনির্দেশ্য অভাব বোধে জড়িয়ে রইবে আজীবন। কোন এক শোভনা রায় বাঁচার দ্বিতীয় অর্থ চেয়েছিল মধুছন্দার উন্মাদ আকণ্ঠ পিপাসায়। হায়! তারও তো নিষ্করুণ আত্মপ্রতারণা শেষ পর্যন্ত। দুলারহীনদের উপকথায় প্রতিদ্বন্দ্বী সংযোগ দুই চরিত্রের। ভুখন এবং দুলারহীন। সাদা মাকড়সার মতো এ গল্পেরও পরিবেশ রহস্যের অন্তরালে। কি বিষণ্ণভাবে তারা খুঁজে পেল সম্পূরক অন্বেষার স্থিতি। ময়ীর মতো অনেকটাই সহজ সপ্রাণ ছিল গায়ত্রী। একদিন একরাতের অবরুদ্ধ দোলাচল: অশান্তি সব-ই শেষ হবে। তবু আলোড়ন; তা কি থেমে যেতে পারে?

যে গোপনতায় বাইরের বালি কাঁকর ঢুকে একটি মুক্তো তৈরী করে সেখানে পৃথিবীর দৃষ্টি যায় না। মনের গভীরে যেন অবগাহনের শীতল অন্ধকার আছে—চরিত্রকার অমিয়ভূষণ মজুমদারে। তাঁর চরিত্র সচেতন, বুদ্ধিদীপ্ত, শাহরিক না হয়েও গ্রাম্যতামুক্ত। যাকে বলব প্রতিদিনের অমিয়বাবু তেমন কোন চরিত্রের জনক নন। ছিল হয়তো; লেখকের নিখিলে মুক্তি পায়। প্রতিটি স্তরে লেখকের সাহচর্য অনুভূত হয়, সুনীতিতে, দীপিতায়, বিনোদলালেও। অথচ বোঝাই যায় না লেখক কখন অন্তর্হিত হয়ে গেছেন, অনন্ততিমিরে তারা একা। দীপিতার ঘরে রাত্রি পড়বার সময়ও মনে রাখতে হবে নারীমনস্তত্ত্বের বেদনাবর্ণিল বাণিজ্য অমিয়ভূষণের আয়ত্ত।

অমিয়ভূষণ ব্যক্তিত্বে মিতবাক। দীপিতায় তা যেন গাণিতিক স্থৈর্যে অঙ্গীকৃত। সে লরেন্স পড়ে, ভার্জিনিয়া উলফেও আসক্তি। মার্জিত এবং আধুনিক। এ সবই নিশ্চয় আত্ম-অবদমন, বিপ্রতীপ অভিনয়। কীটসভক্ত ইন্দুর রুক্ষ অসঙ্গতি মনে পড়ে কেন: সহস্র অবলুপ্তির থেকেও নৃশংস উচ্চারণে মথিত সেই কৃন্তক নারীত্ব বর্ষা রজনীর অনিঃশেষ অন্ধকারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পদ্মিনী বা সুনীতি তো আত্মহননই করেছে যে জীবন প্রাপনীয় মানুষের সাথে তার কদাচিৎ দেখা এই জেনে।

প্রশ্নহীন ভাবেই উল্লেখ করছি নিজস্বতার; অমিয়ভূষণ মজুমদার কাহিনীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ মেধাবী। বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য—অথবা যে আত্মীয়তা শুধু বারুদের ঘ্রাণে—ম্যাগদালেন চা-বাগানের মায়াবী পৃথিবী, মধু-ছন্দার গৃহস্থালী—এই পরিবেশ অমিয়বাবুই রচনা করতে পারেন। গায়ত্রীর প্রত্যাবর্তনের সেই ছায়াজাগরণময় কবিতা, নিরুল্লেখ্য মহাত্মা সীতানাথ একাডেমীর রুদ্ধদ্বার নির্মোচনের নিবিষ্টতা, তাঁকে প্রায় ঈর্ষণীয় করে তুলেছে। গল্প উপস্থাপনায় চূড়ান্ত দক্ষতা প্রমাণ করেছেন "সুনীতি" ও "পদ্মিনী"—পর পর দুটি গল্পে। গল্প দুটির প্রস্তুতি যেন পরিকল্পনাহীন প্রথম দর্শনে, সূচনা ফ্ল্যাশব্যাকে অথচ সঙ্গতির স্বরাভাস আবিষ্ট করে প্রতি মুহূর্তে। বাক্য গঠন থেকেও এই মনোযোগ অপসৃত হয়নি। অন্যায় হবে না মধুছন্দার কয়েক দিনের সূচনায়—"আফিস থেকে এলো সে, খুট খুট করে অবিরত শব্দায়মান হাল্কা বুট তাকে বহন করে আনছে—ভীতা হরিণীর পা ঠুকবার মতো শব্দ"—আশ্চর্য হোলে কারণ অমিয়বাবু কথোপকথনে বিশিষ্ট হলেও অপ্রকৃতিস্থতায় অনেকাংশেই অনীহ। তবে তার বাক্য কবিতাকে স্পর্শ করে, বর্ণনা উপমাকে, এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। "রাত্রির প্রভাব, আদিম সূর্যোদয়ের চাইতেও প্রাচীন তমিস্রার রক্তে সঞ্চারিত স্মৃতি" প্রায় কবিতাই এবং "বল নিয়ে লুফতে লুফতে যদি হঠাৎ সেটা কুয়োয় পড়ে যায়, তা' হলে সেই কুয়োর চারিদিকে ঘুরে ঘুরে কুয়োর অন্ধকার মনে নিয়ে যেমন ফিরে যায় খেলুড়েরা"—ইপ্সিত বিষাদের সঞ্চারে একলক্ষ্য।

গল্পে জীবনের পরিধিকে সংহত, পুঞ্জিভূত ও একমুখীন করে প্রমীলার বিয়ের মতো একটি বহু ব্যবহৃত উপকরণকেও অনাস্বাদিত পণ্যে পরিণত করতে পারেন যিনি, তাঁকে পরিক্রমনান্তে পরিশেষে মনে হয় প্রশান্ত নিরীক্ষা[illegible]র সাধনা[illegible] তাঁর শিল্পের উৎস।

ইতিহাস বাস্তবতা ও দু'একটি জিজ্ঞাসা

তিনি, শ্রীযুক্ত পল ভালেরি, আমাদের পক্ষে মান্য একজন ফরাসী কবি একদা মন্তব্য করেন—ছায়াছবি শুধু বাস্তবের ওপরের আস্তরণটাকেই আঁচড়াতে পারে। উক্তিটি আপাতভাবে সরল তাচ্ছিল্য হলেও মধ্যে স্পষ্টতঃই কিছু চোরাস্রোত আছে যা চলচ্চিত্র নামের শিল্প মাধ্যমটির স্থায়িত্ব বিষয়ে আর্ত হয়ে ওঠে। এবং আমি বলতে চাই সত্যজিৎ রায়ের শিল্পচেতনা সম্পর্কিত যে কোন আলোচনায় এই প্রসঙ্গটির মীমাংসা কঠোর গুরুত্ব দাবি করে। কিন্তু এভাবে আমি শুরু করতে চাই না।

ফেব্রুয়ারি—১৮৫৬। আমাদের যাবতীয় অপমান ও নিগ্রহ গোরা পল্টন হয়ে লক্ষ্ণৌ শহরের দিকে হেঁটে যায়। একটি কিশোর, আমাদের শীতার্ত দিগন্ত রেখার নীচে, আমাদের বৃক্ষ প্রান্তর ও প্রাচীরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে বিস্ময়ের মতো। এরপরে সিনেমা হলের বাইরে শুধুই মিডিপরিহিতা তন্বীর কলহাস্য, শতরঞ্জ কে খিলাড়ীকে আর আমি কোথাও খুঁজে পাই না, না রক্তে না স্মৃতিতে। পুনরীক্ষনে আমার মনে হয় শতরঞ্জ কে খিলাড়ী এমন এক চিত্রমালা রং যেখানে ঘন, ভূমি মসৃণ ও ব্রাশ তিমিরপ্রয়াসী।

বেশ কিছুদিন ধরেই সত্যজিৎ রায় আমাকে নত ও স্তব্ধ করেন না। এবারও কলকাতা আমার কাছে নির্জন মনে হল না। সুতরাং আমি কি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বলব প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তর যুগে এই প্রথম সত্যজিৎ রায়ের আর একটি শিল্পের সান্নিধ্যে এলাম বিস্তৃত পরিশ্রমের চিহ্ন যার সর্বাঙ্গে লিপ্ত? অথবা এই বলেই দায় সারব যে শতরঞ্জ কে খিলাড়ী পুনর্বার এমন একটি চলচ্ছবি যার প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের ফিল্ম নির্মাণ সম্পর্কে শিক্ষিত করে? এ সমস্তই সত্য আক্ষরিক অর্থে। তবু শেষ সত্য নয়। আমাদের পিগমি সভ্যতার মাঝখানে সত্যজিৎ রায় একটু বড়ো মাপের মানুষ। পথের পাঁচালির পঁচিশ বছর পরে তাঁর অসামান্যভাবে দৃষ্টিনন্দন ক্যামেরা চালনা কিংবা, মিতমাত্রার সঙ্গীত প্রয়োগ এবং রঙের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলা অন্য অর্থে আত্ম-অবমাননারই নামান্তর।

আরও আমার অবাক লাগে যে আমার শিক্ষিত সহজীবীরা প্রায় প্রত্যেকেই রাজনীতি ও ইতিহাস সংক্রান্ত নানা কূটতর্কে ব্যস্ত। অথচ শ্রীসত্যজিৎ রায়

শেষবিচারে একজন চলচ্চিত্র স্রষ্টা। আর দাবাড়ু একটি সিনেমা। আলোচ্য ছবিটি কি আলোকচিত্রিত তৎকালীন ইতিহাস? মনে হয় না স্বয়ং স্রষ্টার তা অভিপ্রেত। ইতিহাস সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট ভাষণ চাই?—অধ্যাপক রমেশ মজুমদার বা পানিক্করের কাছে যাব, এমনকি অন্য অন্য মৌলিক গবেষকের কাছে, সত্যজিৎ রায়ের সমীপবর্তী না হয়ে। একজন প্রতিভাযুক্ত পুরুষের কাছে আমরা যদি তাঁর শ্রেষ্ঠ দান চাই, কোন দ্বিতীয় স্তরের দান নয়, তা হলে তা পেতে পারি সেই রাজ্যের পরিধির ভিতরেই শুধু যেখানে তার প্রতিভার প্রণালী ও বিকাশ তর্কাতীত। ট্র্যাজেডিটা এখানেই যে আমরা সমাজ ও ইতিহাস বিষয়ে আমাদের অত্যুগ্র আগ্রহের সমাধান পেতে চাইছি কোন শিল্পীর মধ্যে ঐতিহাসিক হওয়ার প্রবণতা যার রুচিতে নেই। তা হলে, আমি নিজের প্রতি খুব মূঢ় প্রশ্ন রাখি—এ ছবি সৃজনের মূল উদ্দেশ্য কি?

যা দেখলাম, বৃটিশ সিংহের কুৎসিত দন্তপ্রদর্শনী তাকেই পণ্ডিতেরা অ্যানেকসেসন অফ আউধ বলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক বাতিল ১৮৩৭ সালে লর্ড অকল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পন্ন নবাবের চুক্তির সোনার পাথরবাটি সুলভ অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাটি এতই নির্লজ্জ নীতিহীনতার নিদর্শন যে পররাজ্যলোলুপ গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি পর্যন্ত নিজেই পরিস্থিতিকে 'এমব্যারাসিং' বলে মেনে নিচ্ছেন (কার্যবিবরণী, ৫ই জানুয়ারী, ১৮৫৬)। উপরন্তু স্যার জর্জ কুপারের কাছে লেখা তার চিঠিতে স্বীকার করছেন যে অযোধ্যা অধিকার আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা সমর্থিত নয় (১৫ই ডিসেম্বর ১৮৫৫)। অতএব রেসিডেণ্ট সাহাব জেমস উট্রামের অস্বস্তি কতটা বিবেক দংশনে আর কতটা আইনগত জটিলতার প্রশ্নে, সেটা বিবেচ্য বিশেষতঃ তার স্মৃতিতে থেকে থাকবে ১৮৩০ সাল নাগাদ পররাষ্ট্রসচিব লর্ড পামারস্টোনের সঙ্গে সম্রাট চতুর্থ উইলিয়ামের এতদ্বিষয়ক মনান্তর।

সত্যজিৎবাবুর বর্ণনায় আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি থাকত না যদি না আর এক বছরের মধ্যেই আর্যাবর্ত নামক বারুদের স্তূপে অগ্নি সংযোজিত হত আর আগুনের সেই বিস্তারকে, কার্ল মার্কসের নাম করলে শুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিকরা বিরক্ত হবেন কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছি জেমস উট্রামও স্বাধীনতা যুদ্ধ বলতে প্রলুব্ধ হতেন এবং আর কেউ নন পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালে জবরদস্ত টোরি দলপতি ডিজরেইলি তার ২৭শে জুলাই ১৮৫৭-র হাউস অফ কমন্স বক্তৃতায় তথাকথিত সিপয় মিউটিনির মধ্যে খুঁজে পেতেন জাতীয় বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ।

পাঠক ভুল বুঝবেন না শতরঞ্জ কে খিলাড়ীতে ঐতিহাসিক তথ্য বিভ্রম আছে এরকম মন্তব্য করার মতে অশিক্ষিত ঔদ্ধত্য আমার নেই। ১৮৫৭-র ঘটনা সিপাহী বিদ্রোহ না স্বাধীনতা যুদ্ধ তা নিয়েও আপাতত আমার আলোড়ন নেই। আমার শুধু বক্তব্য যে আমরা কোথাও বুঝতে পারলাম না অন্তত বৃহৎ একটি ঘটনা ঘটল যা কিম্বদন্তীতে পরিণত ভারতীয় সহিষ্ণুতাকে বিচলিত করে এমনকি জনজীবনেও ছাপ ফেলেছিল।

পেলাম একটি নিটোল, স্বাদু ও বন্ধুরতাহীন গল্প, এক সুরেলা অবক্ষয়—মুরগীর লড়াই আর ঘুড়ি ওড়ানো তো কাজের কথা নয়—যেখানে জনসাধারণ নেই। একদিকে মন্থর, নিষ্ক্রিয়, নপুংসক সামন্ততান্ত্রিক ক্ষয়িষ্ণুতা অন্যদিকে বিদেশী রেসিডেণ্ট অফিসারের কিছু কিছু পর্যবেক্ষণ, এক নিরুত্তেজ জগৎ যেখানে অপদার্থ নবাবের নীলরক্ত মুহূর্তের জন্য চলকে উঠে গজলের আহ্বানে হারিয়ে যায় আর ক্ষণিকের জন্য অবনত হয় উট্রামের চোখ। বরং আমি এই অস্থাবির শৈত্যের মধ্যে প্রাণের আভাষ পাই মিরজা সাজ্জাদ আলির নবপরিণীতা বধূ যখন কর্কশ চিৎকারে পরিচারিকাকে ডাকে। তার ছন্দহীন কণ্ঠস্বরে লক্ষ্ণৌ ঘরানার কাঠামো লজ্জিত হতে পারে কিন্তু এই নিথর পরিবেশে সে, একমাত্র সে-ই, জীবনের প্রতি অনুগত। বুঝিয়ে দিয়েছে ব্যর্থ নিশীথের যন্ত্রণা।

নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ কোনক্রমেই শহীদ নন, এই পটভূমিতে প্রকাশিত দ্বন্দ্বে স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব দাবী করাও কষ্টকর, আমি শ্রদ্ধা করি এই সিনেমার অথেনটিসিটি। কিন্তু একজন মহৎ শিল্পীর সঙ্গে তো একজন সাধারণ ইতিহাস প্রণেতার তফাৎ থাকে। আর সেজন্যই মার্কস শেক্সপীয়রের পক্ষে অতি গৌণ নাটক মেরি ওয়াইভস অফ উইণ্ডসরের একটি অঙ্কে খুঁজে পান এমন প্রজ্ঞান যা সমগ্র ষোড়শ শতকের ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক রচনায় ছিল না। পক্ষাবলম্বনের প্রশ্ন উহ্য রইল, এ ছবি তথ্যচিত্রও নয় যখন, সেক্ষেত্রে পরিচালক পাত্র-পাত্রীদের মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্রোপচারে অধিকতর নিবিষ্ট হতে পারতেন, ইতিহাসবেত্তাদের চোখ যেখানে পৌঁছয় না, তাহলে আমরা ঘটনা থেকে সত্যে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ খুঁজে পেতাম। তথ্য বস্তুগতভাবে অস্তিত্ববান মাত্র, সত্য তার মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী এক গোপন সুড়ঙ্গপথ যা আপেক্ষিকভাবে বিশেষ লক্ষ্যে মুক্তি পায়। সে সব কিছুই হয়নি। দাবাড়ু প্রথম স্তরের বাস্তবতায় থমকে আছে। আমরা কি তবে মাও-সে-তুঙের বিশিষ্ট বাগবিধির প্রতি প্রণতি জানিয়ে সবিনয়ে সিদ্ধান্ত নেব শতরঞ্জ কে খিলাড়ী বস্তুত ঘটনার তরঙ্গ

দাবার চাল পাল্টে যায়। সামন্তপ্রভুদের চরিত্র আমাদের জানা। সত্যজিৎবাবু নিরাবেগ দূরত্ব বজায় রেখেছেন। জন কীটস হয়ত একেই বলেছেন নেগেটিভ কেপেবিলিটি। আমাদের শিল্পবোধ ফরাসী আঁগাজে শব্দটিকে সন্দেহের চোখে দেখে। আমি বলব তবু ইতিহাসে এমন বিরল কিছু পরিবেশ আসে যা উত্তর পুরুষের সংযোগ ও তাপ চায়। তখন সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত বিযুক্তি ও অবজেকটিভিটি শিল্পের প্রতিমার চক্ষুদান করতে পারে না। ১৮৫৬ একজন ভারতীয়ের পক্ষে সেই সময়। হায়! আমার আকাঙ্ক্ষা, এই পরিকল্পিত নিরাসক্তি কতখানি রায় দান করতে পারে জাতীয় জীবনের দীপহীন সন্ধিক্ষণে ? খুবই নড়বড়ে তুলনা হবে যদি বলি দ্বিতীয় পর্বের হাইনের মতো একদা লিরিক্যাল সত্যজিৎ রায়ের অধরোষ্ঠ জন-অরণ্য থেকেই অর্জন করেছে অপ্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ও তিক্ততা। শতরঞ্জ কে খিলাড়ীর আশিরপদমূলে একটি ঠাট্টার আবরণ যা প্রকট ও ঈষৎ সম্ভ্রমহীন অ্যানিমেশন পর্বে। বুঝতে পারি, ক্ষমা করার অবসর তাঁর নেই। কিন্তু এই নিছক ঠাট্টার অন্তরালে যদি রক্ত চলাচলে একটি বিষণ্ণ গান জন্ম নিত, নীহারিকা থেকে যেভাবে ধীরে ধীরে সঙ্গতিময় ও দীর্ঘজীবী নক্ষত্রের সূচনা হয়। আক্ষেপ জরুরী নয় তবু হাইনের কথা উঠল বলেই মনে পড়ছে এঙ্গেলস কোন সময় মার্কসকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন—ইতিহাসই শ্রেষ্ঠতম কবি সে হাইনকেও ঠাট্টা করতে জানে। হ্যাঁ, আমাদেরও ভয় হচ্ছে, ইতিহাসই শ্রেষ্ঠতম কবি, সে একদা নীরব উত্তরাপথে নবাব ওয়াজেদ আলি শাহকে বিদ্রূপ করেছিল, আজ প্রায় একশো কুড়ি বছর পরে দাবা খেলার ছকটির ওপরেও একটি তিক্ত কৌতুকচ্ছটা ছড়িয়ে যাবে না তো ?

আসলে এ রকম বিচ্ছিন্ন বিচারের তেমন অর্থ নেই। শতরঞ্জ কে খিলাড়ীর সংকটের জনয়িতা সত্যজিৎ রায়ের আজীবন লালিত মানসিকতা। গোঁকুর ভ্রাতৃদ্বয় সকাশে তেওফিল গোতিয়ে যেমন, তাঁর ছবিও দর্শকদের সরাসরি জানিয়ে দেয় যে তিনি এমন একজন শিল্পী যার কাছে একমাত্র দৃষ্টিগ্রাহ্য বিশ্বই অবয়বী। আমরা মেনে নিতে বাধ্য যে নিজস্ব সেই প্রদেশে বিহারকালে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীহীন জ্বলে ওঠেন স্ব-মহিম সম্রাটের প্রায় আর সঙ্গে সঙ্গে আবার লক্ষ্য করি এখান থেকে তাঁর সীমাবদ্ধতারও সূত্রপাত। শিল্প দর্শন নয় ঠিকই কিন্তু কোন না কোন প্রাতিস্বিক দার্শনিক মনোভঙ্গীর দ্বারা পুনর্গঠিতও। অপরদিকে সত্যজিৎ কিছুতেই স্বীকার করবেন না শিল্পীর বাস্তবতা কৃত্রিম

অভিক্ষেপণসদৃশ গাণিতিক পরিভাষায় যাকে বলা যায় সেকেণ্ড অর্ডার ইকুয়েশন। শুধুই ভিত্তোরিও ডি সিকা, রবার্তো রসেলিনি কিংবা সত্যজিৎবাবুর ক্ষেত্রে নয়, আমার মনে হয়, পরম বাস্তবতার কূটাভাসময় অন্বেষা নিওরিয়ালিজমের অস্থি মজ্জায় নিহিত। মনুষ্যত্বে বিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও যেহেতু তা দর্শনশূন্য সুতরাং শিল্পসত্যে ক্রমশ কৃশকায় হয়ে পড়ে; বাস্তবের উপরিতলটুকুই আলোকিত হয় প্ররোচিত করে না কোনভাবে।

সেজন্যই শতরঞ্জকে খিলাড়ী সত্যজিৎ রায়ের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক এক চমৎকার কাহিনী বিন্যাস; আঙ্গিকে এমনই মর্মান্তিকভাবে নিখুঁত যেন মনে হয় স্বয়ং গুস্তাভ ফ্লোবেয়ার, যুগপৎ কলম ও বোধি বর্জিত, কামেরার আবেদনে প্রাণ পেয়েছেন।

স্নানপুণ্য ও রাজদর্শন

আমি এক সামান্য চলচ্চিত্রপ্রেমিক—দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে—তেমনভাবেই দেখতে গিয়েছিলাম গ্রেগরি কোজিনেৎসেভকৃত কিং লিয়ার এবং রাজদর্শনের পুণ্যে আমি ধন্য, আমি চরিতার্থ। অত্যন্ত বিনীতভাবে মেনে নেব কিং লিয়ার কোন চলচ্চিত্রায়িত নাটক নয়, একান্তভাবেই চলচ্চিত্র। এক্ষেত্রে রাজা লিয়ারের প্রতিমা নির্মাণে আক্ষরিক অর্থে অবশ্যই উইলিয়াম শেকস্‌পীয়ার কোজিনেৎসেভের উত্তমর্ণ কিন্তু চক্ষুদানের কৃতিত্ব তবু দ্বিতীয়জনের। নির্দ্বিধায় আমি বলব হ্যামলেটের (১৯৬৪) তুলনায় লিয়ার (১৯৭০) এই রুশ শিল্পস্রষ্টাকে অনেক প্রবীণ ও পরিণত করেছে। যদিও ব্যক্তিগত বিচারে আমি এখনও হ্যামলেটের পক্ষপাতী, ডেনমার্কের যুবরাজের ভূমিকায় স্মকটুনোভস্কি আমাকে অনেক বেশী অভিভূত করেন লিয়াররূপী ইয়ুরি জারভেতের চাইতে, তবু তা ট্রাজেডির গভীরতার জন্যই, চলচ্চিত্র ভাষার অবদান সেখানে লিয়ারের মত তীব্র ও সক্রিয় নয়।

অর্থাৎ গ্রেগরি কোজিনেৎসেভ বেনিয়মের পথিক। তাঁর লিয়ার মাত্রই এক বৃদ্ধ রাজা নন যিনি কন্যাদের হৃদয়হীন স্বার্থপরতায় স্তম্ভিত, কাতর ও ক্রুদ্ধ। (পাঠক ভুল বুঝবেন না, শেকসপীয়ার নিশ্চয়ই বহু স্তরসমন্বিত কিন্তু আমি সাধারণ ধারণা ও কোজিনেৎসেভের প্রভেদ প্রসঙ্গে চিন্তিত)। কর্ডেলিয়া যখন পিতার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলে—আই লাভ ইয়োর ম্যাজেস্টি অ্যাকর্ডিং টু মাই বণ্ড, নর মোর, নর লেস……। তখনই কোজিনেৎসেভ ট্রাজেডির সূচনা ঘটান না। আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি ইয়ুরি জারভেতের চেহারায় কোন সম্রাটোচিত সম্ভ্রম নেই, অধিকাংশ সময়েই তাঁকে দেখা গেল দুর্গের বাইরে। প্রজারা এখানে শীর্ণকায়, বঞ্চিত ও রুগ্ন। আর প্রকৃতি ধূসর ও রুক্ষ। একেই হয়ত মার্কসবাদীরা বলেন প্রোলেতারীয়করণ, রাজনৈতিক পরিভাষা এড়িয়ে অন্যভাবে দেখলে মনে হয় পরিচালক, এমন কি বুর্জোয়া নন্দনতাত্ত্বিক অর্থেও, আধুনিকতার স্থানাংক সঠিকভাবে নির্ণয় করেছেন।

তাঁর বিখ্যাত রচনা সিসিফাসের কিংবদন্তীতে আলব্যিয়ার কামু্য দাবী করেছেন যে ধ্রুপদী মনোভাব প্রধানত অধিবিদ্যা নিয়েই ভাবিত, অন্যদিকে আধুনিকতার

মূল সমস্যা নৈতিকতা আর আমরা এখন দেখব শেকসপীরীয় ট্রাজেডিসমূহের মধ্যে যে কিং লিয়ারকে অনেকেই সর্বাধিক ভাবে মেটাফিজিক্যাল বলেন, কোজিনেৎসেভ তাকে অধিকতর অর্থবহভাবে দ্বান্দ্বিকতার বিপরীতের প্রেক্ষাপটেই স্থাপন করেছেন। অপর এক রুশী চিন্তানায়ক বেলিনস্কির সাহায্য নিয়ে আমরা বুঝতে পারি এই চলচ্চিত্রে লিয়ারের বিকাশ মোটামুটি এই রকম: প্রথমে মর‍্যাল ইনফ্যান্সি. যখন লিয়ার রাজত্ব ভোগ করতে চলেছেন: তিনি ক্ষমতা গর্বে গর্বিত ও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। তারপরে আসে ডিসইনটিগ্রেসন, সব মোহ চূর্ণ হয়। উন্মাদ রাজা পৃথিবীর পাঠশালায় পাঠ নিতে সুরু করেন। অবশেষে কনশাস হারমনি, কর্ডেলিয়ার সঙ্গে পুনর্মিলনের পর লিয়ার ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে প্রজ্ঞানে পৌঁছে যান।

আমাদের আর তিনটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া জরুরী। প্রথমত, গ্রেগরী কোজিনেৎসেভের আনুগত্য মার্কসবাদের প্রতি, দ্বিতীয়ত, তিনি ছবি আঁকার জগৎ থেকে চলচ্চিত্রে এসেছেন। তৃতীয়ত, তাঁর শিল্প চেতনা গভীরভাবে রুশ সংস্কৃতির অতীতকে অনুধাবন করে।

এজন্যেই লিয়ারে প্রকৃতি সর্বক্ষেত্রেই পরিবর্তমানতার প্রতীক। কোজিনেৎসেভ বিশ্বাস করেন ব্যাখ্যা করার চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বদলে দেওয়া। আত্মজ্ঞানী লিয়ার নীরব হয়ে যান না, উপলব্ধি করেন—দ্যাট থিংস মাইট চেঞ্জ অর সিজ। অতএব বিদ্রোহ করেন! অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে শহীদ হিসেবে উত্তর পুরুষের কাছে সাক্ষ্য রেখে যান।

স্বয়ং কোজিনেৎসেভ কিংলিয়ার সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রণয়নকালে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির একটি উপদেশ স্মরণে এনেছেন—রক্তাক্ত পদচিহ্ন ছাড়া আর কোনো মসৃণ ভূমি থাকবে না। রাজা লিয়ারের পটভূমি প্রকৃতই অসম ও বন্ধুর। একমাত্র প্রথম দিকে রাজসভার বর্ণনায় তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই একটি স্থিতিশীল অচলায়তনের ইলিউশন উপস্থিত করেছেন, আমরা লক্ষ্য করি অভিনেতাদের বিন্যাস, তারপর থেকে সব কিছুই দ্বান্দ্বিক পরিবর্তন চিন্তার ফলশ্রুতি। কিন্তু আমরা পরিচালকের উন্মেষকালীন শিল্পীজীবনের কথা স্মরণে এনেছি নেচার শটসগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে। ঝড়, আকাশ ও সমুদ্র তাঁকে বারংবার শব্দহীন শূন্যতায় আশ্রয় দিয়েছে। অথচ, ঝড়ের প্রশ্ন স্বতন্ত্র, আকাশ ও সমুদ্রের দূরপ্রসারী সংযম তো কোজিনেৎসেভের আয়ত্তে থাকার কথা নয়, তিনি যৌবনে 'স্টিল লাইফ' অংকনে বিশেষ দক্ষ ছিলেন না। বিশেষত ঝড়ের আগে নগ্ন,

নিরাবরণ আকাশ ও কর্ডেলিয়ার ফাঁসির পর সমুদ্র : না পাঠক, আমার ক্ষমতা নেই সেই অনুভবকে ভাষায় চিত্রিত করার।

এবার উল্লেখ করা যেতে পারে আর্কিটাইপীয় রীতির কথা যা একান্তভাবেই স্রষ্টাকে জাতীয় সংস্কৃতির শরীরে যুক্ত করে। আমাদের পরিধি ছোট তবু বলা যায় ঝড়টি এখানে প্রতীকী ও যুগ যুগ ধরে ইউরোপীয় সংস্কারে প্রোথিত। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা পশ্চিমী নই যে বুঝতে পারব লবণের রূপকথা কিং লিয়ারের অন্তরালে থেকে কিভাবে চেতনার অজস্র জট খুলে দেয়।

যেমন আমরা অসুখী যে আমরা রুশ জানি না। বরিস পাস্তেরনাকের অনুবাদের তাৎপর্য তাই কানের ভেতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করল না। শোনা যায় এই অনুবাদটি নাকি নেরভালের গ্যেটে অনুবাদের মতই অবিশ্বাস্য সফলতার স্বাদ পেয়েছে।

আর সঙ্গীত পরিচালনা? শ্রবণ রয়েছি মেলি চিত্ত গভীরে। কেননা তার দায়িত্বে রয়েছেন স্বয়ং শস্তাকোভিচ : পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অন্যতম শেষ ধ্রুপদী মহিমা। ঝড়ের আগে সেই বাঁশির প্রয়োগ কি আমরা ভুলতে পারব কোনদিন? একটি কথা, অপ্রাসঙ্গিক যদিও, বলা হয়নি। হ্যামলেটের বিখ্যাত স্বগতোক্তিসমূহ স্মকটুনোভস্কির মুখনিসৃত নয়। এখানে কিন্তু ইয়ুরি জারভেত যথেষ্ট সবাক।

রাজা লিয়ার যখন কলকাতা বেড়াতে এলেন, কলকাতা তখন উন্মাদ গড্ডলিকা প্রবাহের যাত্রী; তিনি প্রাপ্য সম্বর্ধনা পেলেন না। লিয়ার বাণিজ্যিক অর্থে সফল হল না। কি আর করা যাবে? মহান শেক্সপীয়ার তো বলেই গিয়েছেন: দি ওয়েট অফ দিস স্যাড টাইম উই মাস্ট ওবে।

'অযান্ত্রিক'-এর রাজনীতি

শিল্পী ঋত্বিক এমন ক্ষীণ শরীরী নন যে সময়ের ক্ষয়রোগ তাঁকে পরাভূত করবে অচিরে। পরন্তু, সবিনয়ে বলা যায়, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ইতিহাস অদূর ভবিষ্যতে সত্যভাষী, সত্যভাষী ও পরিণত হলে প্রাচ্যে ঋত্বিককুমার ঘটক ও প্রতীচ্যে ইংগমার বার্গমান এই দুই মহান চলচ্চিত্রস্রষ্টার মর্ম উপলব্ধি করে তাদের কুড়ি শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের আত্মার দার্শনিক অবস্থান হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে। "উইন্টার লাইট" এবং "কোমল গান্ধার" দেখবার পর একথা বলতে আর সাধারণ বুদ্ধির অতিরিক্ত কিছু দরকার হয় না আজ যে এই সেই দুঃসাহসিক পরীক্ষার বিস্তার পর্ব যার উৎস ভূতলবাসীর আত্মকথা। বাস্তবিক বার্গমান ও ঋত্বিক দুজনেই দর্শনের সমুদ্রে অভিযাত্রী, এবং যেহেতু নাবিকের নৌকা লাগে, এদের দুজনেই ব্যবহার করেছেন চলচ্চিত্র নামক শিল্প মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে অবশ্য শিল্প ও দর্শনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সিদ্ধির কথা চলে আসে। পৃথিবীতে এমন লোকও আছে, তাদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়, যারা উপন্যাসের আঙ্গিক সম্ভাবনার বিচারে দস্তয়েভস্কির কারামাজভ পরিবারের তুলনায় ফ্লোবেয়ারের শ্রীমতী বোভারিকে বেশি মূল্য দেন। চলচ্চিত্রের নন্দন-তত্ত্বে এখনো পর্যন্ত এই ফ্লোবেয়ারপন্থীদেরই নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা। সুতরাং ঋত্বিকের প্রকৃত অভিষেক-পর্ব শুরু হতে আরও অনেক দেরি আছে।

এবার অযান্ত্রিক সম্বন্ধে ছোট দু'একটি কথা আমি বলব। অযান্ত্রিকই ঋত্বিক সাম্রাজ্যের প্রথম তোরণ। আমাদের নজর এড়ায় না যে ওঁরাও নৃত্যের অংশটি শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষের সর্বজনপঠিত গল্পটিতে নেই। সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে যায় ঋত্বিকবাবুর অভিপ্রায়, ছবি সাজিয়ে গল্প বলার লোক তিনি নন। নব-বাস্তবতা রচনা তাঁর ঈপ্সিত নয় বরং তিনি অতিরিক্ত, উদ্দেশ্যমূলক, যাকে বলা যায় দ্বিতীয় স্তরের সত্য আরোপ করেন। যন্ত্র ভারতীয় জীবন-নাট্যের সঙ্গে বেজে ওঠে। এই রহস্যটুকু অনুধাবন না করতে পেরে এখনও রক্ষণশীল রুচি ওঁরাও নাচের অংশটুকুকে অযথা দীর্ঘায়িত মনে করে। যা কিছু স্বাভাবিক—তার প্রীতিই নববাস্তবতা; যেমন বাইসাইকেল চোর। আমি, সুতরাং জানাব বহুনন্দিত সেই ফরাসী চলচ্চিত্র-সমালোচক, শ্রীযুক্ত জর্জ সাদুল, ঋত্বিকের প্রতি

তাঁর সপ্রেম আগ্রহ সত্ত্বেও ভুল করেছেন; অযান্ত্রিক কখনোই নিও-রিয়্যালিস্ট ছবি নয়—না বক্তব্যে না আঙ্গিকে। অযান্ত্রিকের কাহিনীটিই অস্বাভাবিক বা বড়ো জোর বলা যেতে পারে অস্বাভাবিকতার একটি স্বাভাবিক অনুবাদ। এই ছবির ক্যামেরা ছিন্নছন্দ হয়তো নয় কিন্তু উল্লম্ফনময়। দুরূহ কোণসমূহের প্রতি আসক্তিপ্রবণ, বন্ধুর। যদি আমাদের পড়া থাকে জঁা-লুক গোদার কৃত "মন্তাজ মাই ফাইন কেয়ার" জাতীয় প্রবন্ধ, তবে আমাদের স্নায়ু চকিত বিস্ময়ে খুঁজে পায় অযান্ত্রিকের সম্পাদনার অত্যাধুনিকতা (Is there greater praise than that the Public rightly confuses editing with cutting); লংশট ও ক্লোজআপের মধ্যপদলোপী সমাসের জ্যাবদ্ধ আবেগ; আর এই সবকে মিলিয়ে ও ছাড়িয়ে তাঁর বক্তব্য আমাদের দৃষ্টি স্থূলতাকে উঁচু মঠের মতো যেন একটা মৌন সূক্ষ্মশীর্ণ কল্পনার আভায় আলোকিত করে দেয়। আমি তেমন বিস্তৃত কিছু বলছি না, শ্রদ্ধেয় পাঠক রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা নাটকটিকে তুলনা-মূলক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে পারেন। যন্ত্ররাজ বিভূতির সঙ্গে বিমলের প্রভেদ, যুবরাজ অভিজিত-এর প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ ও সামান্য মোটর চালকটির প্রতি ঋত্বিক ঘটকে প্রেম সেই দুস্তর পার্থক্য থেকে জন্ম নেয় যা মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের, অধিবিদ্যার সঙ্গে দ্বান্দ্বিকতার। আমরা নিঃসন্দেহে বলব—পথের পাঁচালী, অবশ্য মান্য, আগেই আমাদের প্রকৃত মহৎ সৃষ্টির স্বাদ দিয়েছিল—অযান্ত্রিকের মুক্তির মধ্য দিয়ে ভারতীয় চলচ্ছবি আধুনিক যুগে প্রবেশ করল। জীবনানন্দ উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য প্রবন্ধটিতে লিখেছিলেন—"কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার; কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।" এই উপপাদ্যের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত অযান্ত্রিক ও সব থেকে বলার কথা উক্ত শিল্পের জনয়িতা শুধু ছন্দ মেলানো গীতিকার নন, যেমন সচরাচর অনুমিত হয়ে থাকে, জন্মক্ষণেই মহাকবি।

ইতিমধ্যে আরও একটি আকর্ষণীয় তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারত। রুশ বিপ্লবের অনতিকাল পরে, ১৯২২ সালে, বলশেভিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি মায়াকোভস্কি Benz nc-22 নামে একটি চিত্রনাট্য রচনা করেন। নায়ক ছিল একটি মোটর গাড়ি। ছবিটি ঘোষণা করে—"একমাত্র অক্টোবর, যা মানুষকে মুক্তি এনে দিয়েছে যন্ত্রকেও মুক্তি এনে দেবে।" সোভিয়েত ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও অযান্ত্রিকের নির্মাণকালে ও তার পরে ঋত্বিক সম্ভবত উক্ত সংবাদ বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। অন্তত তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; না তাঁর নিজের লেখা

থেকে, না তাঁর সমালোচকদের কথা থেকে।

কিন্তু সব থেকে বলার কথা "নাগরিক" নির্মাণের আগেই কমিউনিস্ট পার্টির তরুণ কর্মী ঋত্বিক ঘটক জানতেন শিল্প শুধু নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চার করে না অথবা সে এমন কোন সমুদ্রতীরস্থ তন্বী নয় যে আলগা হাওয়ায় ভেসে বেড়াবে তার কেশপাশ। বরং ইতিহাসের অন্তহীন আগুনের ভেতরে প্রবেশ করে মানবিক শ্রম ও স্বপ্ন বারে বারে শিল্পের চক্ষুদান করেছে। অমুত্তর পঞ্চবিংশতি ঋত্বিক যে নাগরিক রচনা করেন তা এই জ্ঞান থেকে যে জনতার হাজার হাজার বর্গমাইলে চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া আজকের যুগের যে কোন শিল্পীরই প্রাথমিক কৃত্য।

সত্য এই যে নাগরিক রূপ কৌশলে ভঙ্গুর ছিল। কিন্তু সাউণ্ড ট্র্যাকে মৃত্যুর ধাতব আওয়াজ ও প্রতিমা বিসর্জনের দৃশ্যটি অন্তত প্রমাণ করে অনতিদূর ভবিষ্যতেই আমাদের চলচ্ছবি ঋত্বিক নামক বিস্ফোরক প্রতিভার সান্নিধ্যে ফুল্লস্বকুমারী হয়ে উঠবে। নাগরিকের প্রধান কৃতিত্ব যে ছবিটি বেকারীর মত উগ্র একটি সামাজিক সমস্যাকে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে। তার চড়া সুরের জন্য রণদিভে যুগের অতিবামচ্যুতি দায়ী কিনা সে বিতর্কে প্রবেশ না করেও বলা যায় নাগরিকই আমাদের দেশের প্রথম রাজনৈতিক ছবি।

নাগরিক বাণিজ্যিক অর্থে মুক্তি পায় নি; হয়ত এই আঘাত প্রয়োজন ছিল। পরবর্তী পাঁচ বছরে ঋত্বিক প্রবীণ হয়েছিলেন—শিক্ষায়, উপলব্ধিতে, মর্মে। অযান্ত্রিক মুক্তি পায় ১৯৫৭য়। আমরা তখন পথের পাঁচালী দেখে ফেলেছি, আমরা বুঝলাম তফাৎটা কোথায়। সত্যজিতের উদ্দেশ্য যেখানে গীতিকবিতার শিখর, ঋত্বিকের কর্মপন্থা সেখানে চেতনার দার্শনিক সম্প্রসারণ।

অযান্ত্রিকই একমাত্র ছবি সংশ্লিষ্ট পরিচালকের যা সর্বজনপ্রশংসিত; ঋত্বিক-কৃত একমাত্র সৃষ্টিকর্ম যার উৎকর্ষ বিষয়ে মার্কসবাদী থেকে শান্তিনিকেতনপন্থী সকলেই একমত। আশ্চর্যের বিষয় প্রায় যাবতীয় উচ্ছ্বাসই ধাবিত রয়েছে ছবিটির আঙ্গিক নৈপুণ্য ও সর্বাঙ্গসুন্দর কারুকৃতির প্রতি; ছবির বক্তব্যের দিকটি তুলনায় অবহেলিত থেকে গেছে।

অযান্ত্রিকের সমস্যাটি তাহলে কি ছিল? একটি গাড়িকে একটি মানুষ ভালবাসছে —ঋত্বিক কি বোঝাতে চাইছিলেন আমাদের? অযান্ত্রিক কথাটি কি বোঝাতে চায়—জর্জ সাদুলেরও একই প্রশ্ন। পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষতায় বৃত জার্জি ত্যোপলিজের মতে যন্ত্রশিল্প ও কারুশিল্পীর সংঘাত, যার অনিবার্য ফল বিচ্ছিন্নতা। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের মতে এক ধরনের অ্যানথ্রোমরফিজম

অর্থাৎ নরত্বারোপ। শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্যের মতে মেশিন-পৌত্তলিকতা এবং শ্রীঋত্বিক ঘটকের মতে যন্ত্রের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক।

প্রতিটি মহৎ শিল্পই বহুমাত্রিক; অযান্ত্রিকও তাই। সুতরাং সত্যজিৎবাবুর মতামতের সঙ্গে আপত্তি থাকার প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু ত্যেপলিজ সাহেব পোলিশ চশমায় ভারতবর্ষকে দেখলে যে ভুল হয় তাই করেছেন। অযান্ত্রিকে কোথাও বিচ্ছিন্নতার সমস্যা নেই। বিমলের ভালোবাসা যা আর্কিটাইপাল প্রতিক্রিয়া তা ওঁরাও জীবন প্রবাহের সঙ্গে মিলে যায় বরং—বিমল তো প্রকৃতই আদিবাসী। শ্রীঘটক পরন্তু অযান্ত্রিকে বিরোধের তুলনায় মিলনের পক্ষপাতী।

সংকীর্ণতা মনে হতে পারে তবু আমার মনে হয় ছবিটি একভাবে দেখলে অক্টোবর বিপ্লবের প্রতি একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি। পূর্বকথিত রুশ চিত্রনাট্যটি সম্বন্ধে ঋত্বিক অনবহিত ছিলেন হয়ত কিন্তু মার্কবাদের প্রতি গভীর আনুগত্য তাঁকে মনে করিয়ে দেয় শিল্পী হিসেবে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে আগত সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার মুখ চেয়ে শ্রমজীবী জনসাধারণের জন্য একটি মাতৃভাষা আবিষ্কার। মায়ারহোল্ডের বায়োমেকানিকস, নানা কাব্যপ্রচেষ্টা ইত্যাদি ঘটনা থেকে জানি যে অক্টোবর বিপ্লবের আগে ও পরে সোভিয়েত যুগঃ শ্রমিকশ্রেণী ও শিল্পায়ন শিল্পীদের উৎসাহিত করেছিল যন্ত্র সভ্যতার নতুন চিত্রকল্প উদ্ধারে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের ভাষায় যিনি আইজেনস্টাইনের তন্নিষ্ঠ একলব্য ছাত্র, তাঁর পক্ষে অযান্ত্রিক নির্মাণের সময় পশ্চাদভূমি হিসেবে এসব তথ্য অজ্ঞাত থাকার কথা নয়।

ছিলও না। কেননা তিনি প্রথম থেকেই জানতেন—"আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে আমরা যদি আবার অনুপ্রবেশ না করি তাহলে কোন জাতীয় শিল্পই গড়ে উঠতে পারবে না।" অপরদিকে কিন্তু শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে মেশিন ও অমানবিকতা সমার্থবাহী। "বোধহয়" ঋত্বিক বলে চলেছেন, "পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকরা আমাদের দেশে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করেছিল বলেই আমাদের এই সার্বিক, অবৈজ্ঞানিক উদাসীনতা। পশ্চিমী জীবনের শূন্যতাবোধও অনেকখানিই আমাদের মনোজগতে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।" তাই আসন্ন ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে মার্কসবাদী ঋত্বিক যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের আত্মিক যোগসূত্রের বিষয়টিতে আলোকপাত করলেন। চাইলেন যন্ত্রপ্রেমিক বিমল টেণ্ডার মাইণ্ডেড অযান্ত্রিক হয়ে উঠুক মানুষের মনে আর্কিটাইপীয় স্পর্শ পেয়ে; আর উদ্দেশ্যটি দেশীয় প্রচ্ছদপট পায় ওঁরাও নৃত্যের মাধ্যমে যা ভারতবর্ষের সমগ্র জীবনচক্রটিকে প্রকাশ করে বিমল চরিত্রের সাবলাইম একসট্রিম হিসেবে। এরই

মধ্য দিয়ে অব্যাহত ভাবে বয়ে চলে জীবনপ্রবাহ। বিমল চরিত্রের অ্যাবসার্ড একসটেনশন বুলাকি পাগলা নতুন গামলা পেয়ে পুরোনোটি ভুলে যায়। একটি শিশুর হাতে গাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখে বিমল উপলব্ধির হাসিতে স্নিগ্ধ হয়। জীবন এগিয়ে চলে।

ঠিক এই শেষ দৃশ্যটির জন্যই আমি অযান্ত্রিক প্রসঙ্গে যন্ত্র-পৌত্তলিকতার অনুষঙ্গ খুঁজে পাই না। তাছাড়া পরিভাষাগতভাবে মার্কসীয় অভিধানের পণ্য-পৌত্তলিকতার বড় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকে শব্দটি; সেই সূত্রে আরও বড় ভ্রমের সম্ভাবনা ভারতীয় আর্থসামাজিক পটভূমিতে। আসলে যন্ত্র শুধু দানব নয় প্রেমিকাও হতে পারে—ঋত্বিক ওইটাই দেখাতে চেয়েছিলেন। তবে বড় শিল্পে যেমন হয়, অনেক স্তর ছুঁয়ে অর্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

আশা করি পাঠক এবার বুঝতে পেরেছেন কেন আমি অযান্ত্রিকের সঙ্গে মুক্ত-ধারার তুলনা করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ যেখানে কৃষিজীবী সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিনিধি, ঋত্বিক সেখানে আধুনিক মনোভাবের শরিক। অবশ্য, ইংরেজীতে যেভাবে বলে, অযান্ত্রিকের রাজনীতি পিরামিডের একটি বাহু। অন্য বাহুগুলি অন্যত্র আলোচনা করা যেতে পারে। আর এই বাহুটি অর্থাৎ ছবিটির রাজনৈতিক পটভূমি সফল। লেনিনীয় সূত্র অনুযায়ী, অযান্ত্রিকের সৃষ্টি এক বিরল কৃতিত্ব। অযান্ত্রিক প্রকৃতই বক্তব্যগত দিক থেকে আন্তর্জাতিক, আঙ্গিকগতভাবে জাতীয়।

মুক্ত পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষায় মায়াকোভসকি 'বিপ্লব'—এই শব্দটির আগে 'আমার' এই সর্বনামটি বসাতেন তীব্র আবেগে। তাঁর বিপ্লবকে তাঁর দেশ সম্মান জানিয়েছিল ১৯১৭-র সেই দুনিয়া কাঁপানো অক্টোবর মাসে। বাঙালী চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক প্রায় একই কামনায় স্পন্দিত হয়ে বলতেন—'আমার জনসাধারণ'। আমরা কি এই নিবন্ধের শেষে আশা করব তাঁর জনসাধারণ অনতিদূর ভবিষ্যতে তাদের উৎসব উদ্বোধন করার কালে অযান্ত্রিকের দৃশ্য থেকে দৃশ্যে ভ্রমণের সময় উপলব্ধি করতে পারবে শ্রমের নিজস্ব ভাষা প্রেমিকার ওষ্ঠের মতই মাদকতাময়?

—————